ডাক্তারের দুনিয়া

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য

মিত্রালয়
॥ ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥

ছয় টাকা

: লেখকের অন্যান্য বই :

দুই নৌকা

যুক্তধারা

অনির্বাণ শিখা

পদব্রজা

সহজ মানুষ

মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
নিউ সরস্বতী প্রেস, ১৭, ভীম ঘোষ লেন, কলি-৬ হইতে এস. এন. পাল কর্তৃক মুদ্রিত।

ডাক্তারের দুনিয়া

এই বিচিত্র দুনিয়া যিনি আমায় দেখালেন
সেই মা-কেই
বইখানি উৎসর্গ করলাম

এক

কিসের থেকে কি হয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ বলতে পারে? ভবিষ্যৎকে তো চোখে দেখা যায় না; সেদিকের চোখে থাকে ঠুলি বাঁধা, না-জানার পথেই অন্ধের মতো চলতে হয়, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

আগে কখনো কেউ কল্পনাই করে নি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে ডাক্তার হতে হবে। আমার ধাতটাই ছিল নরম-নরম ভীতু ধরণের, ডাক্তার হবার উপযোগী মোটেই নয়। আর আমাদের বংশে কেউ কখনো ডাক্তার ছিল না।

এমন কি এই বাংলাদেশেই আমার জন্ম হয় নি। জন্মেছিলাম বিহারে—শোন নদীর ধারে। বাবা সেখানে সরকারী অফিসার ছিলেন; মা থাকতেন তাঁর সঙ্গে। সেখানে এই দুজন মাত্রই বাঙালী, আর সবাই বিহারী। তাই জন্মাবধি হিন্দী বুলি-ই শুনেছি আর হিন্দী বলতেই শিখেছি, বাংলা ভাষা কিছুই বুঝতাম না। বাবা ও মাকে যদিও 'বাবা' ও 'মা' বলেই ডাকতাম কিন্তু দাদামশাইকে বলতাম 'দাদাবাবু'; দিদিমাকে বলতাম 'মায়িজী'। মা ছিলেন দাদামশাই-এর একমাত্র সন্তান, কাজেই তাঁদের কাছে যাওয়া-আসা নিত্যই ছিল।

কিন্তু অতঃপর আর কিছু বলার আগের থেকেই জানিয়ে রাখি, নিজের আত্মস্মৃতি বা আত্মকাহিনী লিখতে বসেছি, এ কথা যেন কেউ না-ভাবেন। আমার জীবন এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয় যে, অবসরের সময়টুকু নষ্ট করে পাঁচজনকে তাই পড়তে হবে। ব্যক্তিগত ইতিহাস আমার খুবই তুচ্ছ, সেগুলোকে ছাপার অক্ষরে বের করবার জন্য এ লেখা নয়। কিন্তু বোধ হয় সকলেরই জীবনে, আর বিশেষত ডাক্তারের জীবনে তার নিজের ব্যক্তিগত কথা ছাড়াও অনেক রকমের গল্প এসে জমা হয়। সেগুলির মধ্যে অনেক রহস্যও থাকে আর অনেক নূতনত্বও থাকে। তার কথাই বলতে চাই।

ডাক্তারকে অনেক রকমের গল্পই শুনতে হয়, অনেক ঘটনাই প্রত্যক্ষ করতে হয়। সেই সকল জিনিস শোনবার মতো, উপভোগ করবার মতো। মানুষ যতক্ষণ নিশ্চিন্ত আরামে তার গতানুগতিক জীবন যাপন করে যাচ্ছে, ততক্ষণ তার মধ্যে কোনো গল্প নেই, আর ডাক্তারের সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেখানে তাকে কিছু ঠোক্কর খেতে হয়, বিপদ ও ব্যাধির কবলে পড়তে হয়, সেখানে তাকে অনেক সময় ডাক্তারের কাছেই

ছুটতে হয়। আর তখনই কিছু গল্পও সেখানে প্রায়ই জমে ওঠে। কারণ বিপদগুলো তো মানুষের একরকম হয় না। জীবনের সুদীর্ঘ মেয়াদটিকে অতিক্রম করতে মানুষকে কতই প্রহেলিকার বেড়াজালে পড়তে হয়, কতই কাঁটাবন পার হতে হয়। তার সম্বন্ধে ডাক্তার যেমন জানতে পারে অন্য কেউ ততখানি নয়। সেইগুলিই এক-একটা গল্প। আমি সেই সব কথাই এখানে বলতে চাইছি। অবশ্য সব গল্পই যে সুসম্পূর্ণ তা নয়, অনেক সময় ডাক্তারের নজরে যতটুকু পড়ে তা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু তবুও তা উপভোগ্য। মানুষের অল্পস্থায়ী জীবন-নাট্যের সব গল্প নাই-বা ফুরোলো। আমি যে-গল্পের যতটুকু জানি ততটুকুই বলবো।

কিন্তু আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম এই কথা যে, দুনিয়াতে এত রকমের রাস্তা থাকতে কোন কারণে, কেমনভাবে আমি ডাক্তারি ব্যবসার রাস্তাতেই ঢুকে পড়লাম।

খুব বাল্যকালেই চলে আসি বাবার কাছ থেকে দাদাবাবুর কাছে, বিহারের শোন নদীর তীর থেকে একেবারে বাংলার দামোদরের ধারে, বর্ধমানের ইদিলপুর নামক গ্রামে। দাদাবাবু দেখলেন যে আমি সেই সুদূর দেহাতে থেকে একটি মূর্খ বনে যাচ্ছি, কেবল ভুট্টাক্ষেতে ঢুকে ভুট্টা খেয়ে বেড়াচ্ছি, আর সিপাহীযুদ্ধের বীর কুঁয়র সিং-এর কহানি গান গাইতে শিখছি। কিন্তু ওতে তো আখেরের কোনো উপায় হবে না; বাঙালীর ছেলেকে বাঙালী হতে হবে, দস্তুরমতো লেখাপড়া শিখে 'মানুষ' হতে হবে। কাজেই মায়ের কোল ছেড়ে বাংলাদেশে মায়িজীর কাছে এসে মানুষ হতে থাকলাম। তখন মাত্র আট বছর বয়স, তখনই একটু একটু করে বাংলা বলতে শিখি। এক স্কুলে আমাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। স্কুলটি ওখান থেকে অনেক দূরে, সেখানে যাতায়াতের জন্য টাট্টু ঘোড়ার এক টমটমের বন্দোবস্ত হলো। বাড়িতে পড়াবার জন্য নিযুক্ত হলেন আমার এক দূর-সম্পর্কের মামা। আমাকে বিদ্বান হতে হবে—তার আয়োজনের কোনো ত্রুটি হলো না।

কিন্তু আমি ডাক্তার হবো এ-কথা তখন কারও কল্পনাতেই ছিল না। বিশেষ করে আমার মায়িজী ডাক্তার জাতটাকে মোটে পছন্দই করতেন না। তিনি বলতেন, ওরা চামার হয়। ডাক্তারদের প্রতি তাঁর এমন নারাজ হয়ে ওঠার বিলক্ষণ কিছু কারণও ঘটেছিল।

পাড়ায় থাকতেন কুঞ্জ ডাক্তার। বোধ হয় তেমন কিছু পাস করা নয়, সেকালের কম্পাউণ্ডার থেকে হেতুড়ে ডাক্তার। তিনি জানতেন কেবল

ফিভার মিকশ্চার, কুইনিনের বড়ি, আর কার্বলিক অ্যাসিড। আর, ছুরি চালাতেও খুব ওস্তাদ ছিলেন, বড়ো বড়ো ঘা-ফোড়া অম্লানবদনে চিরে দিতে পারতেন। আমার কিছু অসুখ-বিসুখ হলে তাঁকেই কল্ দেওয়া হতো।

একবার সর্বাঙ্গে আমার ছোটো ছোটো ঘা-ফোড়া হতে লাগল। দাদাবাবু কুঞ্জ ডাক্তারকে তলব করলেন। তিনি এসেই বললেন—"যেগুলো ফাটে নি সেগুলোকে একটু একটু উস্কে দিতে হবে।"

মায়িজী বললেন—"না না, ছুরি-টুরি চলবে না, ওষুধ দিয়ে সারাও।"

কুঞ্জ ডাক্তার বললেন—"তারও উপায় আছে—কার্বলিক অ্যাসিড। একবার করে ঘায়ের মুখে লাগিয়ে দিলেই সবগুলো চুঁয়ে শুকিয়ে যাবে।"

তিনি তখনই একশিশি কার্বলিক অ্যাসিড পাঠিয়ে দিলেন।

মায়িজী সন্ধ্যার সময় সেই র' কার্বলিক অ্যাসিড লাগিয়ে দিলেন আমার প্রত্যেকটি ঘায়ের মুখে। তারপরে সে কী অসহ্য জ্বলুনি! আমি সারারাত কাটা ছাগলের মতো ছটফট করে বেড়ালাম। আমিও যত কাঁদি, মায়িজীও তত কাঁদেন আর বলেন—"হায় হায়, এ কি করলাম!"

পরের দিন সকালেই এলেন কুঞ্জ ডাক্তার। মায়িজী তেড়ে গিয়ে তাঁর মুখের উপরেই বললেন,—"তুমি একটা চামার!"

তিনি আমতা-আমতা করে বললেন—"আমি কি এমনি দিতে বলেছিলাম? ওতে একটু জল মিশিয়ে দিতে বলেছিলাম।"

মায়িজী আরো জোরে ধমক দিয়ে বললেন—"কিছুই তুমি বলো নি। তুমি ছেলেটাকে একেবারে দগ্ধে মারলে!"

কুঞ্জ ডাক্তার বেগতিক দেখে আর বাক্যব্যয় না করে মাথা চুলকে সরে পড়লেন।

তারপর আরো কিছুকাল পরের কথা। সেটিও আমার বেশ মনে আছে।

আমি দামোদরের বাঁধে বাঁধে ঘুরে বেড়াই। ওপার থেকে কত মালবোঝাই গরুর-গাড়ি, কত রাহীজন, মোট-মাথায় কত গ্রাম্য ব্যাপারী পার হয়ে এপারে আসে। দুপুরে বাঁধের ধারে এসে তারা গাছতলায় কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়, পুঁটলি খুলে মুড়ি-চিঁড়ে ভিজিয়ে ঐ সময়টিতে খেতে বসে। এই অপরূপ দৃশ্যই আমি প্রায় প্রত্যহ চেয়ে-চেয়ে দেখি। কেউ ছাতু খাচ্ছে, কেউ-বা মুড়ি-মুড়কি, কেউ-বা গুড় দিয়ে দুখানা রুটি।

একদিন দেখি, জটা মাথায় এক ছাইমাখা সাধু ওপার থেকে সেই বাঁধের ধারের গাছতলায় এসে বসলো। কিছু না-খেয়ে এমনিই সে বসে রইল।

চেহারাটি বেশ নধর, কিন্তু মুখখানা খুবই শুকনো, চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন ঝিমিয়ে-পড়া। চুপচাপ কিছুক্ষণ সেখানে বসে থেকে আবার সে উঠে দাঁড়ালো, শহরের দিকে চলতে শুরু করলো। কিন্তু চলতে যেন আর সে পারছে না, খুব শ্রান্তভাবে ধীরে ধীরে পা টেনে-টেনে চলছে। বেশ বোঝা গেল, খুবই সে ক্লিষ্ট।

তাকে দেখে আমার কেমন মায়া হলো। কাছে এগিয়ে গিয়ে হিন্দীতেই বললাম—"সাধুজী, তোমার কি খিদে পেয়েছে?"

একজন বাঙালী ছেলের মুখে পরিষ্কার হিন্দী বুলি শুনে সে চম্‌কে উঠল। তার পরে একটু ম্লান হেসে বললে—"হাঁ বেটা, তুমি ঠিক কথা বলেছ। সেই-জন্যেই শহরের দিকে চলেছি, সেখানে গেলেই খাবার মিলবে।"

আমি বললাম—"তুমি বুঝি আজও কিছু খাও নি, কালও খাও নি?"

"হাঁ বেটা, তিনদিন কিছু খাওয়া হয় নি। এইবার হবে!"

"তাহলে আমাদের বাড়িতে খাবে এসো না, এই কাছেই বাড়ি।"

সেই সাধুকে আমি বাড়ি নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসালাম, তারপর মায়িজীকে সব কথা বললাম। মায়িজী তখনই বেরিয়ে এসে সাধুকে দেখে তাকে যথারীতি আপ্যায়িত করলেন, ঘি ময়দা প্রভৃতি সিধা বের করে দিয়ে বারান্দার একপাশে তার রান্নার ব্যবস্থা করে দিলেন। সাধু তাই দিয়ে মোটা-মোটা রুটি প্রস্তুত করে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করল। আমিও তৃপ্তি-পূর্বক তাই দেখলাম। তার পেটভরা মুখের হাসি দেখে খুব আনন্দ হলো।

দাদাবাবুকে বলে-কয়ে তিনদিন পর্যন্ত সেই সাধুকে আমি সেখানে ধরে রাখলাম। চতুর্থ দিনে সাধু নিজেই বিদায় নিতে চাইলে,—তিনদিনের বেশী কোথাও বাস করা তাদের নিয়ম নয়।

মায়িজী সাধুকে কিছু প্রণামী দিলেন। বললেন—"এই ছেলে আপনাকে রাস্তা থেকে ধরে এনেছিল। ছেলেকে আশীর্বাদ করে যান।"

সাধু স্মিতহাস্যে আমার মাথায় হাত রেখে বললে—"আশীর্বাদ তো আলবৎ করব। কিন্তু মায়ী, এই ছেলেকে তোমরা ডাক্তারী-বিদ্যা শেখাও, তাতে ভালো হবে। তোমার ছেলে এখন থেকেই লোকের মুখ দেখে দেহের ভিতরকার দুখ্ বুঝতে পারে। ডাক্তার হলে আরো ভালো করে বুঝবে। অনেকের উপকার হবে।"

মায়িজী বললেন—"না বাবা, ও আশীর্বাদটি করবেন না, ডাক্তাররা ভারী চামার হয়। এমনিতেই বেঁচে-বর্তে থাক্ সেই আশীর্বাদ করুন।"

সাধু যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে আমার দিকে চাইল। তখন আমিও বললাম, ডাক্তার হতে চাই না। ওরা মানুষকে শুধু কষ্ট দেয়, আর তেতো ওষুধ খাওয়ায়। এতরকম কাজ থাকতে ডাক্তার হতে যাবো কেন।

সাধু এবার হেসে বললে—"তা কি তুমি বলতে পারো, বেটা! সবই রামজীর ইচ্ছা।"

এর পর আরো একটি ঘটনার কথা বলি। সে হলো এর কয়েক বছর পরের কথা।

আমি দাদাবাবুর কাছে এসে থাকবার পর থেকে মা প্রতি বছর একবার করে আমাকে দেখতে আসতেন, মাসখানেক থেকে আবার বাবার কাছে ফিরে যেতেন। সেই সময়টি আমার কী আনন্দেই যে কাটত!

একবার মা এসে রয়েছেন আমার কাছে। ইতিমধ্যে আমার একটি বোন হয়েছে, তার বছর চার-পাঁচ বয়স হয়েছে। মুখখানি তার ফুটফুটে সুন্দর, যেন গাছের সদ্যফোটা স্থলপদ্মটির মতো—দূর থেকে দেখলেই মনের মধ্যে চমক লাগে। চুলগুলো তার ঝাঁকড়া-করা, রাজবাড়ির গেটের উপরকার লতা-ঝাড়ের মতো এলোমেলো হয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—চোখমুখ তাতে ঢাকা পড়ে যায়, বারে বারে চুলগুলি সরিয়ে দিতে হয়। ভারী মিষ্টি সেই কচি মুখখানি, আর ভারী মিষ্টি-মিষ্টি তার কথা। কথা বলার তার বিরাম নেই, ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতগুলি বের করে কত কথাই সে বলছে, কত ছড়া কাটছে, দিবারাত্র যেন কথার খই ফুটছে! অবসর পেলেই তাকে নিয়ে আমি খেলায় মত্ত হয়ে থাকতাম, দু'বেলা তার হাত ধরে বেড়িয়ে আনতাম। গর্ব করে পাঁচজনকে ডেকে-ডেকে দেখাতাম।

সেই বোনটি একদিন বিকেলে কোথায় হারিয়ে গেল। আশেপাশে, এর বাড়ি ওর বাড়ি, বাঁধের ধারে, শরের বনে, দামোদরের চরে—কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। চারিদিকে লোক ছুটিয়ে দেওয়া হলো; কিন্তু ঐটুকু মেয়ে কতদূরেই বা যেতে পারে, কোথায় বা এমন লুকিয়ে থাকতে পারে?

তখন একজন বললে, পুকুরে জাল ফেলে দেখা হোক। আমাদের বাড়ির কাছে একটা পুকুর ছিল। খুব কাছে নয়, ঐটুকু মেয়ের পক্ষে বেশ খানিকটা দূরই বলতে হবে, একা-একা ততটা পর্যন্ত যেতে সে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু তবুও তো বলা যায় না, খেলতে খেলতে সকলের অগোচরে হয়তো ওদিকে গিয়ে পড়তে পারে। একবার জাল ফেলে দেখতে ক্ষতি কি আছে? জেলে

ডাকিয়ে তখনই জাল ফেলা হলো। দু'বার-তিনবার জাল ফেলতেই ঘাটের পাশ থেকে উঠে এলো তার মৃতদেহ।

তখনই ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে দেখেশুনে বললে, "বেঁচে যেতে পারে, চেষ্টা করে দেখা হোক।" তারপর সে অনেক রকমের প্রক্রিয়া করলে, তাকে নিয়ে অনেক টেপাটিপি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করলে। মুখ দিয়ে খানিকটা জলও বের করে ফেললে। ঘণ্টাখানেক ধরে সে অনেক কিছুই টানাহেঁচড়া করলে কিন্তু বাঁচাতে পারলে না। তার দেহ তেমনি নিস্পন্দ হয়ে রইল, চোখদুটি তেমনি বুজেই রইল।

এইসব দেখতে দেখতে আমার মন ডাক্তারের উপর এক দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। মায়িজী ঠিকই বলেছেন. এরা নিতান্তই চামার। ছেলেবেলাকার সেই স্মৃতিটি এখনও পর্যন্ত আমি ভুলি নি। সেই মৃতশিশুর কচি দেহটিকে নিয়ে যে নৃশংস প্রক্রিয়াগুলো সে করলে তাতে আমার মন খুবই অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল লোকটাকে আচ্ছা করে দু'ঘা কষিয়ে দিই। আমি বেশী সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নি, কিছু পরেই সেখান থেকে সরে পড়েছিলাম। গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, আমার মা পাগলের মতো বুক চাপড়াচ্ছেন। আমি সেখান থেকে পালিয়ে চলে গেলাম উঠানের ধারে বাতাবি-লেবু গাছটার তলায়। ঝাপসা চোখে কাঁদতে কাঁদতে তখন বলেছিলাম—"ভগবান, ওকে তুমি শাস্তি দিয়ো!"

॥ দুই ॥

তাই বলছিলাম, আমার ডাক্তার হবার কথাই নয়, কথা ছিল বিদ্বান হবার। বিদ্বান হই নি, তাই ডাক্তার হয়েছি। এই আসল কারণ।

স্কুলে ঢুকে প্রথম প্রথম কয়েক বছর বোধকরি পড়াশোনা বেশ মন দিয়েই করতাম, নইলে এত ছেলে থাকতে মাস্টারদের আমার উপর অতটা নজর পড়ল কেন। রাজার অবৈতনিক স্কুল, ছাত্রের সংখ্যা ছিল খুবই বেশী। তারা সকলেই বেশ চালাক চতুর, আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিরীহ। কিন্তু ক্লাসে প্রশ্নের জবাব শুনে তাঁরা আমাকে পিছনের বেঞ্চে বসতে দিতেন না, প্রথম বেঞ্চে টেনে এনে বসাতেন। কিছুকাল পরে

বাৎসরিক পরীক্ষায় উপরি-উপরি দু'টি বছরই আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম। তার জন্য ভালো ভালো বই প্রাইজ পেলাম।

তখন হেডমাস্টার বললেন, একে ডবল-প্রমোশন দেওয়া হোক। দাদা-বাবুর কাছে সেই প্রস্তাব গেল। তিনি তাতে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।

এই ডবল-প্রমোশনই তার পর থেকে আমার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তখন সে কথা বুঝি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম। একটা ক্লাস ডিঙিয়ে যাওয়াতে, যে-সব জিনিস পড়ানো হতো তার সঙ্গে তাল রেখে আমি চলতে পারতাম না। কোনোগতিকে টায়েটুয়ে পাস করতাম বটে, কিন্তু নিজেই বুঝতে পারতাম যে ফাঁকি দিয়ে প্রমোশন পাচ্ছি। ক্লাসে আমি আর ভালো ছেলে রইলাম না, থার্ড-ডিভিসনের দলে গিয়ে পড়লাম।

তখন মনে-মনে আমি এই কথাই ভাবতাম, ডবল-প্রমোশন হঠাৎ পেলাম কেমন করে? পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অত নম্বর তুললাম কেমন করে? এই ভাবতে গেলেই মনে পড়ে যেতো আমার মায়ের কথা। মাকে প্রায়ই আমি চিঠি দিতাম, তাতে বারে বারে কেবল এই কথাই লিখতাম—"তুমি অতি শীঘ্র এখানে চলে এসো, তোমার জন্যে আমার ভারি মন-কেমন করছে, আর আমি এখানে থাকতে পারছি না।" মা জবাবে লিখতেন—"তুমি সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে সেইজন্যেই তোমাকে ওখানে রেখেছি, কিন্তু সর্বক্ষণই আমি তোমার কথা ভাবি, সর্বক্ষণই আমি তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আছি, একটি-বারও তোমার কাছছাড়া হয়ে নেই। আমাকে মনে রেখে যা তুমি করবে তাতেই সবচেয়ে কৃতকার্য হবে—তাতেই বুঝতে পারবে যে আমি তোমার খুব কাছেই রয়েছি।"

আমি তখন ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, তবে মায়ের জোরেই আমি অতখানি উৎরে গেছি। তাহলে আমার মেহনত করে অত বেশী পড়াশোনা করবারও আর দরকার নেই। কাজ কি মিছে খাটাখাটুনিতে। তার চেয়ে আপন-মনে হেসে খেলে বেড়াই। ক্লাস পালিয়ে গোলাপবাগে, আর আঁজিরবনে, আর বাঁকার ধারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াই, মা যখন রয়েছেন তখন পরীক্ষায় পাস তো হয়েই যাবো। কী ভুলই করেছিলাম! তখন কি আর জানতাম যে নিজের তরফের চেষ্টা জিনিসটি না থাকলে কোনো মা-ই একতরফা কিছু সাহায্য করতে পারেন না। কিন্তু সে কথা কে তখন আমাকে শেখাবে? কে বুঝবে আমার ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব?

ঐ ডবল-প্রমোশন নেওয়াই আমার কাল হলো। শুধু সেই বাল্যকালের

কথাই বলছি না, জীবনে যতবারই ডবল-প্রমোশন নিতে গেছি, ততবারই এমনি ঠকেছি। এ হলো জীবনের এক বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা, তাই এটি এখানে জানিয়ে রাখলাম। সিঁড়ির ধাপগুলিকে ফাঁকি দিয়ে উপরে উঠে যাওয়া, আর চলাকে ফাঁকি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া—ওতে মেহনত বাঁচে বটে, কিন্তু কাজটা পাকা হয় না। সকল পথটাকে মাড়িয়ে যে-যাওয়া, তাই হলো পুরো রকমের আর পাকা রকমের যাওয়া। নইলে ধাপের সৃষ্টি হলো কেন?

যাক্, পড়াশোনায় আমার ঢিল পড়ে গেল, প্রত্যেক বারেই ঘষটে-ঘষটে পরীক্ষা পাস করতে থাকলাম। আমার চেয়ে ছোটোভাইরা এ বিষয়ে অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাতে লাগল, কিন্তু আমি যতই উঁচু ক্লাসে উঠতে লাগলাম, আমার দাদাবাবু ততই আমার সম্বন্ধে বেশী হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। পরীক্ষার ফলাফল দেখে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। বাড়িতে ভালো ভালো মাস্টার রেখেও কোনো উন্নতি হলো না।

অভিভাবকেরা চেষ্টা করলে কি হবে, নিজেরই আমার পড়ার দিকে মন ছিল না। প্রত্যেক ছেলেরই একটা-না-একটা দিক দিয়ে কিছু প্রবণতা থাকে, সেই দিক দিয়ে কিছু জানবার ও শেখবার ঝোঁক থাকে। আমারই এক ভাইকে দেখতাম, সে ছিল খুব মেক্যানিক ধরণের। নানারকম যন্ত্রপাতি ও লোহালক্কড় নিয়ে সর্বক্ষণই সে লেগে আছে, কিছু একটা তৈরি করছে। এ-ছাড়া তার অন্য কিছু খেলা নেই। আর এক ভাইকে দেখতাম, সর্বক্ষণই সে খাতা-পেন্সিল নিয়ে ঝুঁকে আঁক কষছে, তাতে কি যে রস পাচ্ছে তা সে-ই জানে। কিন্তু আমার ওসব দিকে কিছুমাত্র ঝোঁক নেই। আমি বই খুলে বসে থাকি সামনের ঝাউগাছটার দিকে চেয়ে, কাঁটা-কাঁটা ঝাউফলগুলি যার তলায় বিছিয়ে আছে, যার মাথার উপর একটা ঘুঘুপাখি বসে অনবরতই ডেকে চলেছে—ঘু ঘু ঘু। আমি তাই শুনছি তন্ময় হয়ে।

মাঝে মাঝে ভেবে দেখতাম বৈকি যে, বড়ো হয়ে আমি কী হতে চাই। দাদাবাবুর মতো ইঞ্জিনিয়ার? উঁহু, ও ভারি শক্ত কাজ, আমার দ্বারা হবে না। বেণীবাবুর মতো ক্যাশিয়ার? নাঃ, পাই-পয়সার হিসেব পর্যন্ত রাখতে হয়, সে ভারি ঝামেলা। লোকনাথবাবুর মতো প্রফেসর? তাতে অনেক বিদ্যে মগজে থাকার দরকার, আমার মুরদে তা হবার নয়। মামা মস্ত মস্ত কবিতা লিখতেন, তা পড়তেও বেশ লাগতো, অতএব মামার মতো কবি? হতে পারি, কিন্তু ওতে পেট ভরবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের বইগুলো যা

হাতের কাছে পেতাম লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলতাম, অতএব ওঁদের মতো সাহিত্যিক? অমন চমৎকার লিখতে হলে ভগবানদত্ত ক্ষমতা থাকা চাই, সে ক্ষমতা আমার কই? দাড়িওয়ালা গোস্বামীমশাই চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন, দাদাবাবুর একখানা খাসা অয়েলপেন্টিং করে দিয়েছিলেন। অমনি ছবি আঁকার বিদ্যে শিখলে কেমন হয়? কিছুদিন যা-তা আঁকতে চেষ্টা করেও দেখলাম। কিন্তু নাঃ, বসে-বসে ঐ নিয়ে একমনে লেগে থাকার ধৈর্য আমার নেই। তাহলে কি-ই বা আমি হতে চাই, কোন্ লাইনে যেতে চাই? ঐ-যে রাজবাড়ির ছেলেরা মস্ত মস্ত ঘোড়া ছুটিয়ে মনের আনন্দে টহল দিয়ে বেড়ায়, ঐরকম নির্ভাবনার জীবন কি সবচেয়ে ভালো নয়?

লেখাপড়ার দিকে মন নেই দেখে বাবা বললেন যে, দাদাবাবু-মায়িজীর আদরেই আমি অমন মূর্খ হয়ে যাচ্ছি। তাই আমাকে ওখান থেকে কোন্নগরে পাঠানো হলো আমার এক জ্যাঠার কাছে। জ্যাঠা ছিলেন সেখানকার অন্যতম প্রধান শিক্ষক, খুব কড়া মানুষ, তাঁর নজরে থাকলে হয়তো কিছু উন্নতি হতে পারে। একটা বছর সেখানে রেখেও দেখা গেল, কিন্তু তাতেও লেখাপড়ায় আমার অবস্থা যেমন ছিল তেমনিই রইল। অগত্যা ফিরে এলাম আবার সেই বর্ধমানে দাদাবাবুর কাছে।

তারপর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পরীক্ষা দিতে দিতে আমার গুরুতর রকমের চোখের অসুখ হওয়াতে আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। পরীক্ষার কাগজ ভালো করে লিখতে পারলাম না, আর ভালোরকম ভাবে তৈরিও ছিলাম না, সুতরাং ফেল করলাম। তার পরেই দাদাবাবু বর্ধমান থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন।

পড়াশোনা আমার ঘুচে গেল। একবছর অন্ধভাবে থেকে দাদাবাবুর অনেক চেষ্টায় অনেক অর্থব্যয়ে আমি চোখের রোগ থেকে সেরে উঠলাম। তখন দাদাবাবু বললেন—"লেখাপড়ায় আর কাজ নেই, ব্যবসার কাজে লাগো।"

চিনির ব্যবসাতে তিনি আমাকে এক পার্টনারের সঙ্গে ঢুকিয়ে দিলেন। তাতেও আমি ফেল করলাম। এমন কি মূলধন পর্যন্ত খোয়া গেল।

তখন আর কি করা যাবে! কিছু তো একটা করতেই হবে, এতবড়ো দামড়া ছেলেকে চুপচাপ ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না। আর আমারও মনে ধিক্কার আসছিল, ভাইরা সব বিদ্বান হচ্ছে, আমিই কেবল মূর্খ রইলাম। অগত্যা শেষকালে এই ডাক্তারী বিদ্যা শিখতেই আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের এক আত্মীয় সত্যবাবু, তিনি ছিলেন ডাক্তারী বিদ্যালয়ের

নামজাদা একজন প্রফেসর, তিনিই সুপারিশ করে আমাকে ঢুকিয়ে দিলেন। এইভাবে সকল দিকে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমার ডাক্তারী শাস্ত্র পড়ার শুরু।

তখন হঠাৎ এই নতুন বিদ্যা শেখবার দিকে আমারও নতুন করে ঝোঁক চাপলো। বিশেষ করে এখানে মাথা-ঘুলিয়ে-দেওয়া আঁক কষতে হয় না, সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হয় না—সেই হলো পরম নিষ্কৃতির কথা। আর, মরা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে নিজের চোখে দেখে কত-কিছুই শিখবো, নিজেই ছুরি ধরবো—এর মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা ও উন্মাদনা আছে। এ একটা বিদ্যার মতো বিদ্যা বৈকি।

ডাক্তারদের উপর সেই বিতৃষ্ণা তখন আমার একেবারেই ঘুচে গেছে। কলকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তারদের তখন আমি মনে করছি এক এক জন মহাপুরুষ। এ তো আর সেই পাড়াগেঁয়ে কুঞ্জ ডাক্তার নয়!

কিন্তু যতই আগ্রহ জন্মাক, ডাক্তারি শেখা সোজা জিনিস নয়। ভয়ঙ্কর চেহারার মোটা মোটা বইগুলো পড়তে হয়, দাঁতভাঙা শব্দের ল্যাটিন নামগুলো খাড়া মুখস্থ করতে হয়, অধিকাংশ নামের কোনো মানে না বুঝে রীতিমতো কণ্ঠস্থই করতে হয়। সে সকল নাম আবার অসংখ্য, অগুণতি। অ্যানাটমির তালিকাতেও যত বেশী নাম, ওষুধের তালিকাতেও তত বেশী নাম। বই খুলে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতেই পারি না। ক্লাসে বসে নামগুলো শুধু কানে শুনে যাই, আর বোদা মেরে হাঁ করে চেয়ে থাকি।

প্রথমেই হাড় পড়ানো শুরু। তার প্রত্যেকটি আঁকবাঁক আব খোঁচা-খুঁচির খটোমটো বিবরণ রপ্ত করতে হবে, ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলে সেগুলো তৎক্ষণাৎ বলতে হবে। না বলতে পারলেই অপমান। কিন্তু তবু আমি ভেবে দেখলাম এর মধ্যে কিছু মৌলিকতা রয়েছে। মানুষেরই তো কাঠামো, মানুষের জীবনের সঙ্গে প্রত্যেকটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মানুষকে জানতে হলে আগে এইগুলি সব জানাই চাই। এ শিক্ষার দুরূহতা সত্ত্বেও আমার ঔৎসুক্য শিথিল হলো না।

তাহলেও এই কয়েকটি বছরের ছাত্রাবস্থার জীবন খুব বেশী কষ্টকর বৈকি। অ্যানাটমির আর ভেষজতত্ত্বের নামগুলো না হয় বার বার আবৃত্তি করে মুখস্থ করে নেওয়া যায়, কিন্তু ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব বুঝতে পারা খুবই কঠিন, সহজে মাথায় ঢুকতে চায় না। তার উপরে রয়েছে কেমিষ্ট্রি, রয়েছে ফিজিক্স্। সবই নতুন রকমের কারবার, অথচ সবগুলোকেই আয়ত্ত করতে হবে। বিরাট সাধনা।

কিন্তু আমি তো একা নই, ক্লাসের সকলকেই এই দুরূহ সাধনা করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়লে আমি আমাদের জটাধর দাদার কাণ্ডকারখানা দেখতাম। তাঁর কাছ থেকেই যথেষ্ট উৎসাহ পেতাম।

জটাধর দাদার অনেক বয়স হয়েছে, তাঁর মাথার অনেক চুলই পেকে গেছে। রীতিমতো ছাপোষা মানুষ, পরিবারবর্গকে দেশের বাড়িতে রেখে তিনি এই বয়সে ডাক্তারি পড়তে এসেছেন। অদম্য তাঁর উৎসাহ। আগে ছিলেন একজন স্কুলমাস্টার। কিন্তু ডাক্তার হবার ঝোঁক ছিল অনেকদিন থেকে। অর্থের অভাবে সে বিষয়ে সুবিধা করতে পারছিলেন না। খুব কৃপণভাবে থেকে আর প্রাইভেট টুইশনি প্রভৃতি করে তিলে তিলে তিনি এতটাই অর্থসঞ্চয় করেছেন যাতে বিদেশে থেকে এই কয়েকটা বছরের পড়ার খরচ স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দিতে পারেন। আর দেশের খরচ চালানো সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছু সাহায্য পাচ্ছেন।

জটাধর দাদা মেসে থাকেন খুব গরিবের মতো। নীচেকার এক অন্ধকার ঘরে একটি সীট ভাড়া নিয়েছেন, দিনের বেলাতেও সেখানে লণ্ঠন জ্বালতে হয়। খাওয়া-দাওয়া অতি নিকৃষ্ট ধরণের, জলখাবার দুবেলা শুধু মুড়ি খান। পরণের কাপড় মাত্র দুখানি, আর জামাও দুখানি, নিজের হাতেই কেচে নেন, ধোপার খরচ কিছু নেই। পায়ে সর্বদাই থাকে একজোড়া চটিজুতা, সর্বাঙ্গে তার তালি-তাপ্পি মারা। দাড়ি কামানো হয় মাসে দুদিন, নিতান্ত বেড়ে উঠলে। পয়সার খরচ অগত্যা খুবই কম।

কিন্তু পড়ার সম্বন্ধে কী তাঁর অধ্যবসায়! নড়বড়ে তক্তপোষের বিছানার উপর মোটা মোটা বইগুলো তো দিবারাত্র খোলা পড়ে আছেই, অনবরতই তার পাতা উল্টোচ্ছেন আর দুলে দুলে মুখস্থ করছেন। রাস্তায় চলতে চলতেও তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই, বিড়বিড় করে সেই মুখস্থগুলো আওড়াচ্ছেন। ঘরে ওষুধের চার্ট করে টাঙিয়ে রেখেছেন, তার দিকে চেয়ে স্মৃতিশক্তিকে ঝালিয়ে নেন। যে সব জিনিসের তালিকা মুখস্থ থাকে না, তার অদ্ভুত সব ছড়া গেঁথে নিয়ে সেই ছড়াগুলোকে মুখস্থ করে ফেলেন, ছড়ার আদ্যক্ষর ধরে তালিকার নামগুলো স্মৃতির মধ্যে এসে যায়। সে সব ছড়া তাঁর নিজেরই বানানো।

জটাধর দাদাকে যদি জিজ্ঞাসা করো—ডোভার্স পাউডারে কি কি থাকে?

জটাধর দাদা অমনি ছড়া কাটবেন—"আফিম খেয়ে ইপিক্-চাচা পটাশ হলো চারপাইতে।"

তার মানে কি হলো? তিনি বলবেন—"ওর থেকেই বুঝে দেখ না, আফিম আছে এক ভাগ, ইপিকাক এক ভাগ, আর পটাস্ সালফেট আছে চার ভাগ, সেইজন্যেই চারপাইতে পটাস্ হলো আর কি।"

যদি জিজ্ঞাসা করো—হাঁটুর গাঁটের ভিতরকার জিনিসগুলো পর পর কিভাবে সাজানো আছে?

জটাধর দাদা অমনি বলে দেবেন—'ট্রেনের ইঞ্জিন অন্য এক্সট্রা শান্টিংএ এক্সট্রা ইঞ্জিনকে পাশাচ্ছে,—এর গোড়ার শব্দগুলো ধরে ধরে মনে করে দেখ, সামনের থেকে পিছন দিকে কোনটার পর কি আছে সব নির্ভুলভাবে বলে যেতে পারবে।"

কিন্তু এতরকম চেষ্টা সত্বেও সেই বছর তিনি পরীক্ষায় পাস করতে পারেন নি, দ্বিতীয় বছরেও তাঁকে সেই এক ক্লাসেই পড়তে হয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি দমে যান নি। তাঁর সঙ্গে আমি ভাব জমিয়ে ফেললাম। কেউ যদি তাঁর মুখের উপর ফেল করার সম্বন্ধে কিছু বলতো, তাতেও তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন না, চেঁচিয়ে বলে উঠতেন—"এইবার দেখি কে আমাকে ফেল করায়?" ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিল জিতেন বোস, সে ওঁকে ফেল করার কথা বলে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতো, একটু ঠাট্টা-বিদ্রূপও করতো, কিন্তু তিনি হাসিমুখে সকল কথাই উড়িয়ে দিতেন। দোষের মধ্যে তিনি একটু স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। কিন্তু অধ্যবসায়ের জোরে শেষ পর্যন্ত তিনি পাস-ও করেছিলেন, ডাক্তার-ও হয়েছিলেন। এখন শুনতে পাই দেশে তাঁর খুব পসার; মস্ত পাকা দালান ও ঘরবাড়ি বানিয়েছেন।

শুধু জটাধর দাদাই বা কেন, এমন এমন ছাত্রও দেখেছি যারা দশ-বারো বছর ধরে নাগাড়ে পরীক্ষা দিয়ে চলেছে, পাস করতে পারছে না, তবু কিছুতেই দমছে না। তারা জানে যে শেষ পর্যন্ত তারা পাশ হয়ে বেরোবেই, যতই কেন বিলম্ব হোক। তাদের যে পড়ার দিকে তেমন মনোযোগ নেই সে কথা নয়, সারা বছর ধরে পরিশ্রম তারা যথেষ্টই করে, পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের সময় সব কথাই বেশ গুছিয়ে বলতে পারে, বরং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে তাদের কাছ থেকেই অনেক রকমের স্লুকসন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু নিজেদের পরীক্ষার বেলাতেই অতিরিক্ত সাবধান হতে গিয়ে তারা অতিরিক্ত গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে। হয়তো বা একরকম প্রশ্নের অন্যরকম উত্তর লিখে দেয়, এক কথা বলতে আর-এক কথা বলে পরীক্ষককে চটিয়ে দেয়, সব-কিছু জেনেশুনেও বলবার এবং লেখবার বেলাতেই নানারকম ওলট-পালট ঘটে যায়।

পরীক্ষা তো একরকম নয়, প্রত্যেক বিষয়েই তিন তিন রকম। সামনা-সামনি মৌখিক পরীক্ষা, খাতায় লিখে জবাব দেবার পরীক্ষা, আবার হাতের কাজের নানাবিধ প্র্যাকৃটিকাল পরীক্ষা। তিন রকমের পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হওয়া চাই, একটাতে খুব ভালোভাবে পাস করলেও অন্যটাতে ফেল করা চলবে না। কাজেই অনুত্তীর্ণ হবার ফাঁক অনেক রয়েছে। আবার তেমনি উত্তীর্ণ হয়ে যাবার ফাঁকিও অনেক রয়েছে। এমন অনেক ছাত্রকেই দেখা গেছে যারা অধ্যবসায়ী পড়ুয়াদের মতো বই নিয়ে কচিৎ বসে, সারা বছর যারা আড্ডা মেরে ঘুরে বেড়ায়, ফুটবল ক্রিকেট ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি স্পোর্টস্ নিয়েই সময় কাটায়, পার্টি মীটিং করে, থিয়েটার করে, গানের মজলিশ করে, মেসে মেসে তাস-দাবার জটলা জমায়,—অথচ দেখা যায় যে পড়াশোনার দিকে এমন অবহেলা সত্বেও পরীক্ষার সময়ে তারা অনায়াসে কেমন করে গলে বেরিয়ে যায়। বোধ করি সাধারণ চাতুর্য এবং উপস্থিতবুদ্ধির জোরেই তারা এমন ভাবে কৃতকার্য হতে পারে। কারণ বেশী পড়লেই যে বেশী জ্ঞান জন্মাবে, অন্ততপক্ষে ডাক্তারী বিদ্যা শেখার বেলাতে ঠিক সেই কথা নয়। এতে বরং বুদ্ধিবৃত্তিটার সম্যক বিকাশ হওয়াই বেশী দরকার, যাকে বলে কমনসেন্স। পুঁথিগত তত্ত্বগুলির দিকে সমস্তটা ঝোঁক না দিয়ে চারদিক থেকে বুঝেসুঝে দেখতে হয় যে, কোন অবস্থাতে সবচেয়ে কোনটা সম্ভাব্য হতে পারে ; বইতে যাই থাকুক, কিন্তু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বেলাতে সহজ বুদ্ধিতে কোন কথাটা বলে। যারা খুব বেশী পড়ে তাদের মগজগুলো তাতেই খুব বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে ; সেখানে সহজ বুদ্ধিকে তারা সমুচিতভাবে খাটাতে পারে না। যারা বেশী পড়ে নি তাদের আপন সহজবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করতে হয়, এবং তাতেই তারা অনেক সময় জিতে যায়। আর তা ছাড়া এই বিদ্যাতে পড়ে শেখার চেয়ে চোখে-দেখে শেখার দাম অনেক বেশী। যারা বই নিয়েই সব সময় কাটায় না, তারা চোখ চেয়ে সব-কিছু দেখতে পারে। আর পরীক্ষকরাও তাই জানতে চান যে এরা চোখ চেয়ে দেখেছে কিনা, বুদ্ধি সহকারে শিখেছে কিনা। অবশ্য বইগুলো নিশ্চয়ই পড়তে হবে, মনেও রাখতে হবে, কিন্তু সাধারণ লেখাপড়ার মতো কেবল মুখস্থ বিদ্যায় এখানে চলবে না।

পরীক্ষার হলে কেমন ব্যাপার হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। অ্যানাটমি পরীক্ষার দিনে কোনো মৃতদেহ থেকে ছোটো একটি অংশ বিচ্ছিন্ন করে কেটে নেওয়া হয়েছে। তার ভিতরকার ধমনী এবং শিরা এবং নার্ভগুলি ডিসেক্ট করে খুলে রাখা হয়েছে। কিন্তু ঐ ডিসেক্ট-করা স্থানটুকু ছাড়া তার

চারিপাশের সমস্ত অংশই কাপড় দিয়ে ঢাকা, দেখে বুঝবার উপায় নেই যে সেই কেটে-আনা অংশটুকু উরুদেশের অংশ অথবা বাহুদেশের অংশ। কেবল ঐ ডিসেক্ট-করা স্থানটির শিরা-উপশিরার সংস্থান ও গতিবিধি দেখে তা বুঝে নিতে হবে। বাহুর এবং উরুদেশের শিরা-উপশিরার মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে, কিন্তু বিস্তর পার্থক্যও আছে। এখন পরীক্ষার্থী যদি বাহুকে উরু বলে ভুল করে আর বাহুর শিরার বদলে উরুর শিরাগুলির নাম করে যেতে থাকে, তাহলে হাজার পড়াশোনা করা থাকলেও সে ফেল হয়ে গেল। শিরাগুলির বিশিষ্টরকম সংস্থান ও গতিবিধি দেখে তার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল যে তা উরুদেশের জিনিস নয়, বাহুদেশরই জিনিস। এটুকু সহজবোধ আর উপস্থিতবুদ্ধি তার থাকা চাই।

এ তো গেল শিক্ষার প্রথম দিকের কথা। শেষের দিকের কথা আরও বেশী জটিল রকমের। ডাক্তারী বিদ্যার শিক্ষাকালকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এর প্রথম অংশটা হলো পরিচয় পর্ব, শেষের অংশটা প্রয়োগ পর্ব। অর্থাৎ প্রথম অংশে কেবল শেখানো হবে যে আমাদের দেহের মধ্যে কোথায় কোন জিনিসটি আছে, তার প্রত্যেকটির কি কি ক্রিয়া, কেমনভাবে এই সমগ্র শরীরযন্ত্রটি চলছে; এবং সেই সঙ্গে আরও শিখতে হবে যে ডাক্তারী ওষুধের তালিকায় কি কি জিনিস আছে এবং তার প্রত্যেকটির কি কি ক্রিয়া, মানুষের ব্যবহারের পক্ষে তার প্রত্যেকটির মাত্রা কত। এইগুলি শেখা হয়ে গেলে তখন আসবে প্রয়োগ-পর্ব, অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক দেহে কোথায় কি কি বিকৃতি ঘটে সেগুলিকে চেনা এবং সেগুলি সারাবার জন্য কোথায় কি কি ব্যবস্থা করতে হবে তার সম্বন্ধে জানা। এর মধ্যে সার্জারি, মেডিসিন, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিভাগ আছে। এই প্রয়োগ-পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আরো বেশী কঠিন।

এই শেষের দিকটাতে আমাদের শিখতে হয় রোগীকে আপাদমস্তক পরীক্ষা করা, তার দেহের যেখানে যা রোগ আছে সবগুলিকে চেনা এবং তা যথাযথ-ভাবে নোট করে রাখা, সবগুলি রোগের যাতে চিকিৎসা হতে পারে এমনভাবে প্রেসক্রিপশন করা, রোগীর রক্ত মূত্র প্রভৃতির রাসায়নিক ও মাইক্রোস্কোপ পরীক্ষা করতে শেখা, ইনজেকশন করতে, অপারেশন করতে, ডেলিভারি করাতে শেখা, ইত্যাদি। শুধু শেখা নয়, এর প্রত্যেক বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হবে, প্রত্যেকটিতেই পাস করতে হবে।

এসব টেকনিক্যাল জিনিস শিখতে পারা খুব শক্ত বৈকি। নিজের আগ্রহ

থাকলে তবেই প্র্যাকটিক্যাল ভাবে এগুলি শেখা যায়, নইলে প্রফেসররা, হাজার বাতলে দিলেও সব কিছু ভুল শেখা হয়, বই-এর লেখার সঙ্গে নিজের শেখা কিছুই মেলে না। এমন কি ষ্টিথস্কোপ দিয়ে বুকের শব্দ কানে শুনে রোগ বুঝতে পারা, তাও ঠিক হয় না।

ছাত্রাবস্থাতে উঁচু ক্লাসে উঠলে অনেকেই আমরা আড়ম্বর করে গলায় ষ্টিথস্কোপ ঝুলিয়ে সকলের কাছে বাহাদুরি দেখিয়ে বেড়াই, যেন কতই ওর ব্যবহার শিখেছি, ডাক্তারী ব্যাপারের কত কিছুই জানি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ষ্টিথস্কোপের সঠিক ব্যবহার শতকরা দুই-চারজনের বেশী জানে কিনা সন্দেহ। বুকের মধ্যে দুই দিকের ফুসফুসে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, মাঝখানে হৃদ্‌যন্ত্রের চলার ধক্‌ধক্ শব্দ হচ্ছে, সেইসব যন্ত্রে একটু কিছু বিকৃতি ঘটলেই তখন শব্দগুলির নানারকম ইতরবিশেষ হবে। তাই শুনে বুঝে নিতে হবে যে কোথায় কোন ধরণের বিকৃতি ঘটেছে। কেবল শব্দ শুনে রোগ চেনা, এ শেখা এমনিতে হয় না, লক্ষবার নিজের কানে শুনে শুনে তবে এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। প্রফেসর কোন শব্দটির কি নাম দিচ্ছেন তার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে হবে, দফায় দফায়। প্রথম প্রথম বহুকাল পর্যন্ত ষ্টিথস্কোপ কানে দিয়ে কিছু বোঝাই যায় না, মনে হয় যে, সব শব্দই যেন এক রকমের। প্রফেসর যখন জিজ্ঞাসা করেন—"ক্রেপিটাস্ শুনতে পাচ্ছ ?" তখন অম্লানবদনে বলি—"হ্যাঁ, বেশ শুনতে পাচ্ছি।" কিন্তু বস্তুত কিছুই শুনি নি। তার মানে, কান আমার তখনও তৈরি হয় নি। কান তৈরি হতে অনেক সময় লাগে। এমন কি পাস করবার পরেও অনেকে ষ্টিথস্কোপ কানে লাগিয়ে নিউমোনিয়াকে বলে ব্রংকাইটিস, হাঁপানিকে বলে যক্ষ্মা। রোগী দেখে শুনে গম্ভীরভাবে বলে—"বুকে একটা প্যাচ হয়েছে!" অথচ 'প্যাচ' মানে যে কী গুরুতর অবস্থা, তাই ঠিক অনুধাবন করছে না। সেখানে নিজেরই লুকোচুরি চলে। আমাকেও এ দোষ থেকে রেহাই দিচ্ছি না, আমি নিজেও অনেকবার অমনি ভুল করেছি। অন্য কারো কাছে বলতে না পারলেও নিজের কাছে সে কথা স্বীকার করতেই হয়।

সুতরাং ডাক্তারি শেখাও সহজ নয়, আর পাস করাও সহজ নয়। এমন কি সামান্য ব্যাণ্ডেজ করা পর্যন্ত, যা নাকি ড্রেসার কম্পাউণ্ডারের কাজ, তাও মন দিয়ে যত্ন করে শিখতে হয়। নতুবা ক্লাসের এমন অনেক ভালো ছেলেকেই দেখা গেছে, যারা পড়াশোনায় খুব তৈরী, খাতায় লেখা পরীক্ষাতে খুব ভালো নম্বর পেয়েছে, কিন্তু সামান্য ব্যাণ্ডেজের পরীক্ষায় ফেল হয়ে গেল।

শেষের দিকটাতে খাটতেও হয় যথেষ্ট। উদয়াস্ত খাটুনি, ভোর ছ'টা থেকে রাত্রি আটটা-ন'টা পর্যন্ত। তার কারণ লেকচার শোনা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস করা ছাড়াও নানা রকমের ডিউটি পড়ে। অপারেশনের ডিউটি, আউটডোরের ডিউটি, এমার্জেন্সির ডিউটি, ডেলিভারির ডিউটি, হাউস-সার্জন ও ডাক্তারদের নানাবিধ কাজে সাহায্য করার ডিউটি। এইসব খাটুনির পরে আবার নিজের পড়া তৈরি করা, নইলে পরীক্ষায় ফেল মারতে হবে। কাজেই সারাদিনের মধ্যে নাইবার খাবার পর্যন্ত সময় থাকে না। প্রায়ই অবেলায় খাওয়া হয়, অনেকদিন বাড়িতে কিংবা মেসে ফিরে যাবারও ফুরসত মেলে না, স্থানীয় রেস্তোরাঁতেই যাহোক কিছু খেয়ে নিয়ে আবার ছুটতে হয়। এতে শরীর খারাপ হয়ে যায়, অসুস্থতা এসে পড়ে, শরীর দুর্বল থাকলে কোনো একটা রোগ ধরে যায়। অথচ সেও খুব বিপদ, শিক্ষার তাতে যথেষ্টই ব্যাঘাত হয়। এ সময়টাতে শরীরকে সুস্থ এবং সুপটু রেখে চলা খুবই দরকার।

তাই বলছিলাম, এ সাধারণ লেখাপড়া শেখার মতো জিনিস নয়, এ হলো একরকমের সাধনা। এর মধ্যে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। আবার শরীর সুস্থ-সবল থাকলেও এই সাধনার সময়টিতে মন অন্য দিকে চলে গেলেই মুশকিল, তখন এক করতে এসে আর এক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য বাধার মধ্যে বিশেষ এক বাধা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক-ঘটিত ব্যাপারে। পুরুষ-ছাত্রের কোনো মেয়ে-ছাত্রীর দিকে নজর পড়লে এবং তাই নিয়ে মেতে উঠলেই তখন সব-কিছু শিক্ষাদীক্ষা মাথায় উঠল, পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেল!

ডাক্তারি যারা পড়তে আসে তাদের মধ্যে তিন-রকমের ছেলে থাকে! একরকম যাদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে, ঘরে স্ত্রী আছে; তারা ছাত্রীদের দিকে ফিরেও চায় না, স্ত্রী-সংসর্গ কেমন জিনিস সে তাদের ভালো করে জানা আছে। আর একরকম, যাদের বিয়ে না হলেও স্ত্রীজাতীয়াদের সঙ্গে যথেষ্টই মেলামেশা আছে, স্ত্রী-রহস্যের সন্ধান আগের থেকেই যারা কিছু কিছু পেয়ে গেছে; তারা যদিও ছাত্রীদের সঙ্গে অবাধে মেশে, কিন্তু বেশী ঘনিষ্ঠতা করে না। আর একরকম যারা স্বচ্ছন্দচারিণী তরুণী নারীদের কখনো চোখে দেখে নি, কিংবা দেখলেও তা দূর থেকে, কাছে গিয়ে মেশার কোনো সুযোগ পায় নি, অথচ হয়তো নিজেদের অগোচরে সে বিষয়ে মনে মনে একটা লোভ ছিল; সাধারণতঃ এদের বেলাতেই যত কিছু বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা।

এক ধরণের পুরুষই থাকে, চলতি কথায় তাদের বলে মেয়ে-নেওটা। অর্থাৎ নারীমুখ দেখলেই সম্বিৎ হারিয়ে তারা যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ে।

ঠিক-যে সৌন্দর্য দেখেই এমন হয় তা নয়, কারণ তারা অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দর দেখে। তাদের কাছে হয়তো নারী-মাত্রই অপরূপ বস্তু। যে-সব মেয়ে ডাক্তারি পড়তে আসে তারা যে খুব সুন্দরী হয়, তা নয়। অন্ততপক্ষে আমার তো এই ধারণা যে আমাদের দেশে যারা দেখতে সুন্দরী হয় তারা অতটা বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থেকে কলেজে পড়লেও ডাক্তারি শিখতে আসে না, অন্যরকম ভাবে তাদের একটা কিছু 'হিল্লে' হয়ে যায়। সুতরাং ডাক্তারি যারা পড়তে এসেছে তারা বেশির ভাগই তেমন সুন্দরী নয়। কিন্তু তবু দূর থেকে দেখতে তারা বেশ সুন্দর বৈকি। তাদের শাড়ি-ব্লাউজের কত কিছুতেই বর্ণ-বৈচিত্র্য, শোভা-বৈচিত্র্য, ঢং-বৈচিত্র্য। তাদের বেণী দুলছে, বাতাসে অলক উড়ছে, শাড়ির প্রান্ত বারে বারে ভূমিতে লুটোচ্ছে, বারে বারেই তা ত্রস্তে টেনে নিয়ে বক্ষোদেশ আচ্ছাদন করছে। তাদের ভুরু কেমন আঁকা, ঠোঁট কেমন রঙীন, গ্রীবায় কেমন ভঙ্গী, চলনে কেমন ছন্দ, পাশ দিয়ে গেলে কেমন সেন্টের গন্ধে মনকে ব্যাকুল করে দেয়! বাড়িতে কোথাও এমনটি দেখা যায় না। এই-গুলোই তো অপরূপ। আসল মানুষটির কোনো কিছু সৌন্দর্য না থাকলেও ছাত্রটি তার খোলসের চমৎকারিত্বকে মানুষটির সঙ্গেই এক করে মিশিয়ে ফেলে; বেশ-প্রসাধনের বাহারকে তারা রূপের বাহার বলে ভুল করে। বাইরের চেক্‌নাই ও চটকের বহর দেখে মনে করতে থাকে যে মানুষটাই সুন্দর। সদ্যযৌবনপুষ্পিত তরুণ ছাত্রের দেহের তাজা রক্ত তাতেই চন্‌মন্ করে ওঠে। তারপর থেকে সেই অবলা-জাতীয়ার প্রভাবের কবল হতে কিছুতেই নিজেকে আর ছাড়িয়ে নিতে পারে না।

সে তখন কি করতে থাকে? পড়াশোনা তার ঘুচে যায়, সে কেবল সেই মেয়েটির পিছু পিছু ঘুরতে থাকে। কোন্ অজুহাতে কেমন করে তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাবে, এই কেবল চেষ্টা। নিজের শেখাটেখা চুলোয় গেল, ঐ মেয়েটির শিক্ষায় কিসে সাহায্য হয়, তার পরীক্ষায় পাস করবার কিসে সুবিধা হয়ে যায়, তাই নিয়েই ঔৎসুক্যের সীমা নেই। এতে মেয়েদের তরফের যে বেশী কিছু দোষ থাকে তাও ঠিক নয়। তারা প্রথমটাতে বরং বিরক্তই হয়, তার পরে এই অযাচিত অনুগ্রহ করার আগ্রহ দেখে ধীরে ধীরে তারাও আকৃষ্ট হতে থাকে। তবু তারা পারতপক্ষে বেশী ঘনিষ্ঠতাকে প্রথম দিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে।

তার পর যখন হাসপাতালে ডিউটি পড়তে থাকে, বাধ্য হয়ে পরস্পরকে পুনঃপুনঃ কাছাকাছি আসতে হয়, তখন আর ঘনিষ্ঠতা এড়ানো যায় না। তখন

নিত্যকার সাহচর্য ও সহানুভূতির দ্বারা পরস্পরের মধ্যে অনেকটা জানাজানি হয়ে গিয়ে আপনা থেকেই অন্তরঙ্গতা এসে পড়ে। তাতে পরস্পরের সঙ্গলাভের আরো বেশী প্রয়োজন বাড়ে। তাই তখন প্রায়ই দেখা যায় যে তারা ছুটিতে অলিতে-গলিতে একত্রে বেড়াচ্ছে, কিংবা গ্যালারীর পিছনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, কিংবা রেস্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছে। এ ঘনিষ্ঠতা যদি অস্থায়ী হয় তো ভালো, কেউ হয়তো পাস করে আর কেউ ফেল করে, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান এসে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। নতুবা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ালেই গণ্ডগোল, নানারূপ নিন্দা এবং কেলেঙ্কারি। অনেককে এই নিয়ে পড়া পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়েছে। কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত বিয়েও করে ফেলে, পাস করবার আগে অথবা পরে। দু'একজনের কথা জানি যাদের বিয়ে করবার জন্য ক্রিশ্চান হতে হয়েছে, অথবা রেজিস্ট্রি-বিবাহ করতে হয়েছে। দুজনেই তারা পাস করে ডাক্তারি করছে, হয়তো সুখেই আছে। কিন্তু বাবা-মা ও পূর্বাত্মীয়দের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখানে কথা এই যে, পড়ার সময় ঐদিকে মন দিলে আসল কাজের বিঘ্ন কিছু হবেই। যেখানে মানুষের জীবন-রক্ষার দুরূহ বিদ্যা অর্জন করতে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তাকে মুখ্য করে রাখা দরকার, আর-সব-কিছুই তার কাছে গৌণ। অন্ততপক্ষে যারা ডাক্তার হতে যাচ্ছে তাদের ঐজাতীয় লোভ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করতে না পারলেই ঠকতে হয়।

এ ছাড়া ছাত্রাবস্থাতে আরো অনেক রকমের বিঘ্ন আছে। রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়াই একটা বিশেষ বিঘ্ন। আমি নিজে পড়তে পড়তে মাঝখানে হঠাৎ কালাজ্বরে আক্রান্ত হলাম। তখন কালাজ্বরের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয় নি। আমার বন্ধুদের মধ্যে দু'একজন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন মারাই গেল। আমারও সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়েছিল, চিকিৎসকেরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একবছর ভুগে দৈবক্রমে আমি সেরে উঠলাম। তাতে একটা বছর আমার পিছিয়ে গেল। পড়াশোনার দিক দিয়ে অনেক ক্ষতিও হয়েছিল। প্রফেসররা যদি বিশেষ সাহায্য না করতেন তাহলে আরো একবছর নষ্ট হয়ে যেতো।

এখানে প্রফেসরদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এমনিতে কিছু বোঝা না গেলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই মহানুভব ব্যক্তি। শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও ছাত্রদের তাঁরা নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। একজন সার্জন বাইরে কোথাও অপারেশন থাকলে সাহায্য করার

জন্যে বেছে বেছে কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন, তাতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও হতো, আর দু'পয়সা তাদের পাইয়েও দিতেন। আমাদের বাড়িতে ভাই-বোনদের কোনো শক্ত অসুখ হলে একজন নামজাদা চিকিৎসক প্রফেসরকে অনুরোধ করলেই তিনি এসে তাদের দেখে যেতেন, চিকিৎসার সমুচিত ব্যবস্থা করে যেতেন। ফী দিতে যখন গেলাম, তখন ভয়ানক রেগে উঠলেন। আমি খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছি দেখে ঠাট্টা করে বললেন—"তুমি যখন ডাক্তার হবে তখন তাই করবে নাকি? ছাত্রদের কাছ থেকে, নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও হাত পেতে ফী আদায় করবে নাকি? এই শিক্ষা হচ্ছে বুঝি?"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—"তা নয়, তবে অন্তত গাড়ির খরচটা তো—"

তিনি একটু হেসে বললেন—"ও, গাড়ীর নাম করে বুঝি তোমার বাপ-মায়ের ঘাড় ভাঙবো? ফী নিচ্ছি না, তবে গাড়িভাড়াটা দাও, কেমন?"

আর একজন প্রফেসর তিনি খুব আমুদে ছিলেন আর ভারি মিশুক ছিলেন। তাঁর থিয়েটারের দিকে খুব শখ ছিল। প্রতিবছর বড়দিনের সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি এক অ্যামেচার থিয়েটার পার্টি খাড়া করতেন। তাদের দিয়ে ভালো ভালো নাটক অভিনয় করাতেন। নিজেই সন্ধ্যার পরে প্রত্যহ হাজির থেকে রিহার্শাল দেওয়াতেন, নিজের পয়সায় সকলকে চা খাওয়াতেন। প্রায় একটি মাস সন্ধ্যার সময়টা এমনি হৈ-চৈ করে কাটতো। তখন তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যেতেন। থিয়েটারের গানগুলি আর বিশেষ বিশেষ অভিনয়গুলি শেখাবার জন্যে পাবলিক স্টেজ থেকে নামজাদা মাস্টারদের ও অভিনেতাদের তিনি ধরে আনতেন, তাঁরা সম্ভবত এমনিতে আসতেন না। থিয়েটারের ব্যাপারে সাধারণত অনেক টাকাই খরচ হয়, তার জন্য ছাত্রদের ও প্রফেসরদের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হতো। সেইসব টাকা জমা করে তার হিসাব রাখা ও কার্যকালে তা খরচ করার ভার ছাত্রদের ভিতরকার একজন সেক্রেটারির উপর থাকতো। একবার আমাকেই সেক্রেটারি করা হয়েছিল। তাতেই বুঝতে পারলাম যে চাঁদা যা ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ হয়। বাকী টাকাটা ঐ প্রফেসর লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের পকেট থেকেই দিয়ে দেন, কেউ সে কথা জানতে পারে না।

শুধু তাই নয়, থিয়েটার হয়ে যাবার পরের দিন সেই সকল অভিনেতাদের আর উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে খেলার মাঠে এক বিরাট ভোজের আয়োজন করা হতো। সমস্তই ঐ প্রফেসরের নিজের খরচে। সেদিন খুবই আমোদ হতো,

প্রফেসর নিজেও সকলের সঙ্গে খেতে বসে যেতেন। অন্যান্য প্রফেসরদেরও তিনি নিমন্ত্রণ করতেন।

কিন্তু সব প্রফেসরই যে এমন উদারচরিত্র ছিলেন তা অবশ্য নয়। দু'এক-জনের কথা জানি যাঁরা ছিলেন অতি ক্রুর প্রকৃতির। কখন যে কার সর্বনাশ করে বসবেন কিছুই বলা যায় না। অথচ এমনি মুখমিষ্টি যে কার সাধ্য তাঁদের মনের ভিতরকার মতলবের সন্ধান পায়।

একবার আমাদের মধ্যে স্ট্রাইক হলো। তার একাধিক কারণ ছিল। কিছুদিন আগের থেকে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল, হঠাৎ এক সামান্য অজুহাতে ছাত্রদের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। আমাদের এক ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ছিলেন কিছুটা মাথামোটা এবং রগচটা। তাঁর খেয়াল হলো যে হাসপাতালে রাত্রে ছেলেদের ডবল-ডবল ডিউটি দিতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজনের বদলে দুজন-দুজন করে থাকবে, এবং রাত্রে তাদের শুতে দেওয়া হবে না, সর্বদা জেগে বসে থাকতে হবে। রীতিমতো জুলুমের ব্যাপার। এতে প্রত্যেককে মাসে তিন-চারবার রাত্রিজাগরণ করতে হয়, অথচ তার কোনোই প্রয়োজন নেই, কারণ নার্সরা তো জেগেই থাকে, প্রয়োজন হলে স্টুডেন্টকে তারাই ডাকতে পাঠায়। সেই ব্যবস্থাই বরাবর ছিল। আমরা ডিউটিতে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম, প্রয়োজন হলেই ওয়ার্ড-কুলী এসে আমাদের ডেকে নিয়ে যেতো। এই নতুন নিয়ম হওয়াতে আমরা সকলে অসন্তোষ প্রকাশ করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে! যারা নিয়ম না মেনে ঘুমিয়েছে বলে জানা গেল তাদের দু'একবার জরিমানা হলো। এর পরে একদিন অফিসের সামনের গোলাপ-বাগানে সুন্দর কয়েকটি গোলাপ ফুটতে দেখে জনকয়েক ছাত্র সেখানে গিয়ে ফুল ছিঁড়ে নিলে। মালীরা তাই দেখে হৈ-হৈ করে উঠল, ছেলেদের সঙ্গে তাদের বচসা শুরু হয়ে গেল। আমিও ছিলাম সেই দলে।

গোলমাল শুনে সাহেব অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন, মালীদের হুকুম দিলেন ছাত্রদের ধরে নিয়ে যেতে। আমরা যে যেদিকে পারলাম সরে পড়লাম, মালীরা কেবল দুজন ছাত্রকে ধরে ফেললে! সাহেব তাদের নাম জেনে তখনই সাসপেণ্ড করবার হুকুম দিলেন। এর থেকেই স্ট্রাইক শুরু হলো।

এই স্ট্রাইকের জের অনেকদিন পর্যন্ত চলতে পারতো, হয়তো অধ্যক্ষকে এর জন্য বিপদে পড়তে হতো। সাহেব তাই [illegible] উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঐ দুজন প্রফেসর তখন বললেন, [illegible] চিন্তা নেই, আমরা সব ঠিক করে
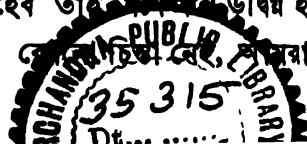
দিচ্ছি। তাঁরা নানাভাবে ছাত্রদের শাসাতে লাগলেন, ভয় দেখাতে লাগলেন, পুলিস ডাকলেন। যখন দেখলেন যে কিছুতেই কিছু হবার নয়, তখন তাঁরা হঠাৎ নিজেদের আচরণ পাল্‌টে ফেললেন। প্রত্যেক মেসে মেসে গিয়ে পাণ্ডাদের ধরে খোশামোদ করতে লাগলেন, পাস করবার পরেই হাসপাতালে ভালো ভালো কাজ দেওয়া হবে বলে তাদের প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। এইসব চালাকিতে তারা ভুলে গেল। ছাত্রদের মীটিং ডেকে স্ট্রাইক মিটিয়ে নিলে। যাদের সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছিল তাদের ক্ষমা করা হলো। কিন্তু পরীক্ষার পরে দেখা গেল যে স্ট্রাইকের আসল পাণ্ডা দুজন ফেল করেছে। বোঝা গেল যে তাদের কোনমতেই পাস করতে দেওয়া হবে না, এই ভাবেই পাকা রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারা পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে, ফেল করবার পরে তারা মাদ্রাজে গিয়ে কোনো এক পরীক্ষাতে পাস করে বিলাত চলে গেল; সেখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসে তারা কলকাতায় খুব ভালো ভাবেই প্র্যাক্‌টিস করছে।

এত রকমের বাধাবিঘ্নকে কাটিয়ে শেষে যখন পাস করার খবর নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দাদাবাবুর পায়ের ধুলো নিলাম, তখন তিনি একটু মিষ্টি হেসে বললেন—"এই যে ডাক্তারবাবু এসেছ। বেশ বেশ, বাড়িতে অসুখবিসুখ হলে আর আমাদের কিছু ভাবতে হবে না।"

দাদাবাবুর সেই মিষ্টিহাসি আর প্রথম সেই 'ডাক্তারবাবু' আহ্বানটি এখনও আমার কানে লেগে আছে।

॥ তিন ॥

ডাক্তারি পাস করলেও তখনই প্রকৃত ডাক্তার হওয়া যায় না। বিদ্যাটি শিখে ছাপ মারা হলেও যতক্ষণ তাকে কার্যক্ষেত্রে হাতে-কলমে, প্রয়োগে সুপটু না হচ্ছি ততক্ষণ আমি নির্ভরযোগ্য ডাক্তার হই নি। এ কেবল সায়ান্স নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট আর্টও রয়েছে। সায়ান্স শেখা হয়ে গেলে তখন সেই আর্ট শেখাটাই দরকার, নইলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গণ্ডগোল বেধে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে এ-কথা খুবই বুঝতে পারলাম। অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রতি পদেই ঠেক খেতে আর অপ্রস্তুত হতে থাকলাম।

দাদাবাবুর চাকরের জ্বর হয়েছে, সে তার ঘরে শুয়ে পড়ে আছে। দাদাবাবু

আমাকে ডেকে বললেন—"ওহে, সাগরের জ্বর হয়েছে, ওকে দেখেশুনে একটা কিছু ওষুধ দিয়ে সারাও তো দেখি।"

সাগরকে নিয়ে ডাক্তারি শুরু করলাম। তার বুক পিঠ পরীক্ষা করলাম, পেট টিপে, জিভ দেখে, চোখ টেনে, নাড়ি গুণে যথারীতি সব-কিছুই করলাম। কিন্তু রোগ আবিষ্কার হলো না। ওর কোথাও কোনো বিকৃতি নেই, সবই ঠিক আছে। অথচ জ্বর। বিশেষ কিছু সে বলতেও পারে না। যে লক্ষণটির সম্বন্ধেই প্রশ্ন করি তাতেই বলে, 'হ্যাঁ'। 'মাথা ব্যথা করছে কি?' 'হ্যাঁ।' 'পেটে কিছু কষ্ট হচ্ছে?' 'হ্যাঁ।' 'গাঁঠে গাঁঠে ব্যথা আছে?' 'হাঁ।' সবই যদি 'হ্যাঁ' বলে তাতে কিছু রোগ-নির্ণয় হয় না। বিব্রত হয়ে আমি দাদাবাবুকে গিয়ে বললাম—"ওর কি হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না, বলেন তো ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই।" দাদাবাবু একটু হেসে বললেন—"না না, ওর ঠাণ্ডা লেগে অমন হয়েছে, দু'দিন উপোস করে পড়ে থাক্, একটু হোমিওপ্যাথি খাক্, তাতেই সেরে যাবে।"

আর একদিন দাদাবাবু বললেন—"ওহে, আমার কোমরের ব্যথাটা কিছুতে যাচ্ছে না, কি করি বলো তো?"

আমি মহা ভাবনায় পড়লাম। কোমরের ব্যথা? সে তো অনেক কিছুতেই হতে পারে। আর্থ্রাইটিস, নিউরাইটিস, নিউর‍্যালজিয়া, লাম্বেগো, মেরুদণ্ডের ডিস্ক্ সরে যাওয়া থেকে শুরু করে হাড়ের টিউবারকুলোসিস পর্যন্ত। কোনটি প্রকৃত কারণ, তা না জেনে তো ওষুধ দেওয়া যায় না। বিব্রত হয়ে বললাম—"আগে মালিশ-টালিশ করে, সেঁক দিয়ে দেখুন-না, তাতেও না সারলে তখন বরং—"

দাদাবাবু হেসে বললেন—"ঠিক বলেছ, আগে সোজা জিনিসগুলো করে দেখা যাক্, তাতে যদি না সারে তখন তোমায় কন্‌সাল্ট করা যাবে। আগের থেকেই বড়ো ডাক্তারকে কল্ দেওয়া ঠিক নয়।"

তারপর সকলেই বললেন যে প্র্যাকটিসে নামবার আগে হাসপাতালে হাউস-ফিজিশিয়ন ও হাউস-সার্জনের চাকরি নিয়ে কিছুকাল প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। আমিও অবশ্য সেই কথাই ভাবছিলাম, নইলে ব্যবহারিক পদ্ধতির সন্ধানসূলুক কিছুই যে জানি না।

খ্যাতনামা ডাক্তার ঘোষ আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁকে গিয়ে ধরলাম। তাঁর ওয়ার্ডে জুনিয়র হাউস-ফিজিশিয়নের জায়গা খালি ছিল, তিনি সেই জায়গাতে আমাকে ঢুকিয়ে নিলেন, ছয় মাসের জন্যে। তাঁর সহকারী

হয়ে আমি হাতে-কলমে অনেক কিছুই শিখতে থাকলাম। তিনি আমাকে দিয়ে সব-কিছুই করিয়ে নিতেন। বড়ো বড়ো ইন্‌ট্রাভেনাস ইনজেকশন পর্যন্ত নিজে না দিয়ে আমাকে দিয়ে দেওয়াতেন। রোগ চেনাতেন, কোনখানে কোন ওষুধটা কেন দিচ্ছেন তা বুঝিয়ে দিতেন। একটু একটু করে আমার সাহস বাড়তে লাগল। এতে মনে মনে আমি একটু আত্মগর্বিত হয়ে উঠলাম। একটা মস্ত ওয়ার্ডের ইনচার্জ হয়েছি, কত ভারি ভারি রোগের চিকিৎসা করছি, মারাত্মক সব ওষুধগুলো প্রয়োগ করতে একটুও আমার বাধছে না, সাধারণে সে-সব ওষুধের নামও জানে না—তাহলে এখন আর আমাকে পায় কে?

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমি খুবই দমে গেলাম। সে দুঃখ এখনও আমি ভুলতে পারি নি। ওয়ার্ডে একজন নিউমোনিয়ার রোগী ছিল। রাস্তা থেকে পুলিসের দ্বারা কুড়িয়ে আনা একজন ভিখিরি, দুটো বুকেই তার নিউ-মোনিয়া ধরেছে। বাঁচবার আশা খুবই কম। তখনকার দিনে এখনকার মতো এ-রোগের অব্যর্থ ওষুধ বলতে কিছুই ছিল না। ওর চিকিৎসাই ছিল কেবল নানারকমের স্টিমুল্যাণ্ট ও ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক জিনিস দিয়ে রোগীকে চাঙ্গা করে রাখা, এবং কোনোগতিকে ক্রাইসিস্ অর্থাৎ রোগের শেষ মেয়াদটা পার করে দেওয়া। রোগের মেয়াদ কেটে গেলে তখন রোগী আপনিই সেরে উঠবে। কাজে-কাজেই কঠিন অবস্থা দেখলে সেখানে স্ট্রিকনিন, কেফীন, ক্যাম্ফর প্রভৃতি তিন-চার রকমের ইনজেকশন দৈনিক প্রয়োগ করা হতো।

রোগীটিকে ঐভাবে চিকিৎসা করতে করতে বেশ সারিয়ে তুললাম। প্রত্যহ তাকে চার-পাঁচটি ইনজেকশন প্রয়োগ করতাম। ক্রমে তার মুখে হাসি দেখা গেল, আপনা থেকে উঠে বসতে লাগল, এমন কি দুধ-ভাত পর্যন্ত খেতে শুরু করলে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি তার চোয়াল আটকে গেছে, সে আর কথা বলতে পারছে না। ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে সে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এ কী ব্যাপার!

ডাক্তার ঘোষ দেখেই বললেন—"টিটেনাস্! ও তাহলে আর কিছুতেই বাঁচবে না। আর তুমিই এর জন্যে দায়ী।"

"আমি দায়ী?"—কিছুই বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন—"বুঝতে পারছ না, টিটেনাসের বীজ ওর দেহের মধ্যে কেমন করে ঢুকল? তুমিই ঢুকিয়েছ। দূর থেকে পিচকারি ভরে এনে ওকে

ইনজেকশন দিয়েছ, হয়তো ভালো করে শোধন করেও নাও নি। কিংবা হয়তো ইনজেকশন করেই তার উপরে ঐ ময়লা কম্বলখানা চাপা দিয়েছ, ওর ধুলোর সঙ্গে সেই বীজ ইনজেকশনের ফুটোর মধ্যে ঢুকে গেছে। কেয়ারলেস্ হয়ে কাজ করেছিলে, যতটা হুঁশিয়ার হওয়া দরকার ততটা হও নি। তা ছাড়া আর অন্য কোন্ কারণে ওর টিটেনাস হতে পারে?"

আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম। আমার তখন মনে পড়ে গেল আরো একটি ঘটনার কথা। সেটা হয়েছিল কলেরা-ওয়ার্ডে। স্যালাইন ইনজেকশন দিয়ে রোগী সেরে উঠল, তার পর সে টিটেনাস্ হয়ে মারা গেল। তখন কেউ বুঝতে পারে নি যে কেন তা হলো। এখন তা বুঝতে পারা গেল। ইনজেকশনের দোষে অমন হতে পারে। খুবই সম্ভব।

কিন্তু ঠিকই কি তাই? তা না হতেও তো পারে। কিসের থেকে কি হলো তার তো কোনো প্রমাণ নেই। এই বলেই আমি মনকে প্রবোধ দিলাম। কিন্তু যতই প্রবোধ দিই, বাইরে যতই নির্বিকার ভাব দেখাই, ভিতরকার মন একেবারেই মুষড়ে গেল। সেই রোগীটি দু'দিন বাদে মারা গেল। আমার মন হাহাকার করতে লাগল। সজ্ঞানে দোষ করে না থাকলেও আমিই হয়তো তার মৃত্যুর জন্যে দায়ী।

তার পর থেকে আজও ইনজেকশন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথা একবারও আমি ভুলতে পারি নি।

ডাক্তার ঘোষের ওয়ার্ডে ছয় মাসের মেয়াদ শেষ হবার পরে কর্নেল চ্যাটার্জির ওয়ার্ডে জুনিয়ার হাউস-সার্জন হলাম। অতঃপর সার্জারির কাজেও খানিকটা রপ্ত হওয়া দরকার।

প্রথম প্রথম কর্নেল চ্যাটার্জি তাঁর অপারেশনের কাজে আমাকে সহকারী করে নিতেন। মাঝে মাঝে আমাকে ছুরি ধরতেও দিতেন। "এখানটা কেটে দাও", "ওখানটা বেঁধে দাও", "অমুক জায়গাটা ফাঁক করে ধরো", ইত্যাদি অনেক কিছুই সুযোগ দিতেন। এতে ক্রমে ক্রমে আমার সাহস বাড়তে থাকল। তখন আলাদাভাবে নিজেও দু'একটা ছোটোখাটো অপারেশন করতে থাকলাম।

মনে মনে সে সময়ে ভারি গর্ব। মনে করলাম এইবার পুরোদস্তুর একজন সার্জন হয়ে উঠেছি। ছুরি ধরতে আমার হাত কাঁপে না, বেপরোয়াভাবে অপারেশন করে যাই। কর্নেল চ্যাটার্জি যেমন ছুরি চালাতে চালাতে ছেলেদের লেকচার দিয়ে বুঝিয়ে দেন, আমিও তাই করতে থাকি। আমারও লেকচার

শুনতে ছাত্রেরা ভিড় করে আসে। সদ্য পাস করে বেরিয়েছি, প্রফেসারের নকল করতে শিখেছি, একটু চালের সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্লিনিক্যাল লেকচার ঝাড়ি।

মনের সুখে কাজ করে যাচ্ছিলাম। আমার আত্মগর্বের মাত্রা যে আরো কতখানি বেড়ে উঠত তা বলতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে ঐখানেই আমি থেমে গেলাম, ওদিক দিয়েও রীতিমতো একটা শিক্ষা হয়ে গেল।

আমার ওয়ার্ডে এক ভদ্রলোক রোগী এসেছিলেন, তাঁর কুঁচকিতে অনেক-গুলো গ্ল্যাণ্ড বেড়ে উঠে জট পাকিয়ে মস্ত এক ঢিবির মতো হয়ে উঠেছে, তার যন্ত্রণাতে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। যাকে বলে 'বাগী হওয়া' অনেকটা সেই জিনিস, কিন্তু তা পাকা নয়, গ্ল্যাণ্ডগুলো লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। এ একরকম সংক্রামক রোগই, এর চিকিৎসা আজকাল সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু তখন অপারেশন করা ছাড়া উপায় ছিল না। খুব কষ্ট পাচ্ছেন, আর আমারও হাত নিশপিশ করছে। আমি বললাম, "এ তো সামান্য জিনিস, আমিই এটা অপারেশন করে দিই।" ভদ্রলোক তাতে সম্মতও হয়ে গেলেন।

উপরের তলায় অপারেশন-থিয়েটার ছাড়া নীচের তলাতেও একটা ছোটো-রকমের অপারেশন-ঘর ছিল। ছোটোখাটো অপারেশন এবং ড্রেসিং প্রভৃতি সেখানেই করা হতো। আমি সেইখানেই রোগীকে নিয়ে গিয়ে ছাত্রদের দ্বারা ক্লোরোফর্ম করিয়ে নিশ্চিন্তে অপারেশন শুরু করলাম। কিন্তু ভিতরকার গ্ল্যাণ্ডগুলো বজ্রের মতো শক্ত, কিছুতে ছাড়িয়ে আনা যায় না, ছুরি দিয়ে কেটে-কেটে সেগুলিকে বের করতে হয় আমার উচিত ছিল ধৈর্যের সঙ্গে একটির পর একটি গ্ল্যাণ্ডকে ছাড়িয়ে আনা। কিন্তু অত ধৈর্য আমার তখন নেই, দুটি-তিনটি গ্ল্যাণ্ডকে ধরে একসঙ্গে নির্মূল করছি। এইভাবে ছুরি চালাতে-চালাতে আর্টারি কাটল কি ভেন্ কাটল জানি না, হঠাৎ সেখান থেকে ফোয়ারার মতো রক্ত ছুটে বেরোতে লাগল। আমার এপ্রনে আর নাকে-মুখে রক্তবৃষ্টি হতে থাকল। আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোথা থেকে যে রক্তস্রোত আসছে কিছুতেই ধরতে পারলাম না। এদিকে রক্ত থামাতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই রক্তক্ষয় হয়ে চলেছে, আর ততই বেশী আমি নার্ভাস হয়ে উঠছি। প্রায় পাঁচ মিনিট পর্যন্ত আমি সর্বত্রই ফর্সেপ্স্ চেপে-চেপে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করলাম। তখন হঠাৎ চেতনা হলো, আর বেশী বিলম্ব করলে রোগী মরে যাবে। এ রক্ত থামানো আমার

সাধ্য নয়, কর্নেল চ্যাটার্জিকে ডেকে আনি। অনেকখানি গজ তার মধ্যে ঠেসে গুঁজে দিয়ে একজন ছাত্রকে সেই জায়গাটা খুব জোরে চেপে ধরে থাকতে বললাম, তারপর উপরে ছুটে গেলাম তাঁকে ডাকতে।

কর্নেল চ্যাটার্জি তখন একটি অপারেশন শেষ করে সবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। আমি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বললাম—"স্যার, শীঘ্র আসুন, অপারেশন করতে-করতে আর্টারি কেটে ফেলেছি।"

সহকারীর হাতে ব্যাণ্ডেজ ছেড়ে দিয়ে তিনি তখনই আমার সঙ্গে নেমে এলেন। ঘরে ঢুকেই বললেন—"সবাই ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াও, কোথা থেকে রক্ত আসছে আগে দেখি।"

গজ প্রভৃতি তুলে নিয়ে সবাই সরে দাঁড়াল। রক্ত তেমনি ভক্‌ভক্ করে ছুটতে থাকল। একমুহূর্ত দেখেই তিনি একখানি ছুরি চাইলেন, কুঁচকির নীচে আরো খানিকটা অংশ লম্বা করে চিরে দিলেন। মোটা একটি শাখা-ভেন্ চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেটিকে তিনি ফর্সেপ্‌স্ দিয়ে চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় বলে গেলেন—"অপারেশনটা শেষ করে ওপরে এসো।"

কোনোগতিকে অপারেশনটি শেষ করে বাঁধা-ছাঁদা করে রোগীকে তাঁর বিছানাতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে, হাত ধুয়ে আমি ওপরে গেলাম।

কর্নেল চ্যাটার্জি তখন তাঁর নিজের অফিস-ঘরে বসে কাগজ পড়ছেন। আমি যেতেই বললেন—"বোসো। একটু বিশ্রাম নাও। এক কাপ চা খাবে?"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—"আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে, স্যার।"

"না না, তা নয়, অন্যায় এমন কিছু হয় নি। এরকম তো হতেই পারে। কিন্তু তোমার বাপু সার্জন হওয়া চলবে না। অত নার্ভাস হলে, সার্জন হওয়া যায় না।"

আমি শুকনো মুখে চুপটি করে বসে রইলাম।

তিনি আবার বললেন—"রক্ত দেখেই ঘাবড়ে না উঠে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখতে তাহলেই বুঝতে পারতে যে রক্তটা আসছে ভেন্ থেকে, আর্টারি থেকে নয়। সুতরাং নীচের দিক থেকে যে শিরা আসছে সেটাই কেটে গেছে। নীচের দিকে খানিকটা চিরে দিলেই সেটিকে তুমি পেয়ে যেতে। যখন এতটুকু উপস্থিত-বুদ্ধি তোমার মাথায় আসে না তখন ঐসব অপারেশন

করতে যাও কেন? তার চেয়ে বরং ফোড়া-টোড়া কাটো, তাতে কোনো হাঙ্গামা নেই।"

আর কোনো কথাটি না বলে আমি সেখান থেকে উঠে এলাম।

ভদ্রলোক অবশ্য শীঘ্রই সেরে উঠলেন। আমার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার সীমা নেই, বারে বারে বলতে লাগলেন যে—"আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।" তিনি তো ঘুণাক্ষরেও জানে না যে আমি তাঁকে মেরে ফেলতে বসেছিলাম, আর কিছুক্ষণ রক্তপাত হলেই তাঁর ক্লোরোফর্মের নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হতো। আমিই তাঁকে বাঁচিয়েছি বটে! কিন্তু সে-কথা তো তাঁকে খুলে বলতে কিছুতেই পারি না, আর বলেই বা লাভ কি আছে।

সেরে উঠে তিনি আমার বাড়িতে মিষ্টান্নের হাঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্য-প্রকাশক। ভালো ভালো সাহিত্যের বই আমাকে প্রায়ই উপহার পাঠাতেন। আর নির্লজ্জের মতো সে উপহার আমাকে গ্রহণ করতে হতো।

এমনি শিক্ষা যে প্রতিক্ষেত্রেই হয়েছে তা অবশ্য নয়, তবে বহুবারই হয়েছে। এখানে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত মাত্র দিলাম। 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য' কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

॥ চার ॥

সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে কাজ করার নির্দিষ্ট কাল শেষ হয়ে গেলে আমি ডাক্তার দাসের অধীনে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী ওয়ার্ডে গিয়ে ঢুকলাম। শুনেছিলাম ডাক্তার দাস অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, তাঁর কাছে বেশিদিন কেউ টিঁকতে পারে না, কিছুদিন থেকেই সবাই সরে পড়ে। সবাই তাঁকে যমের মতো ভয় করে। মুখের উপর কারও একটি কথা বলার সাধ্য নেই।

কিন্তু আমি তো বেশ টিঁকে গেলাম। আমি দেখলাম তিনি সোজাসুজি এক-কথার মানুষ। তাঁর সমস্ত নির্দেশগুলি নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হলেই আর কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু অন্যভাবে কিছু চালাকি করতে গেলে, রোগীদের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে গেলেই ফ্যাসাদে পড়তে হয়, সেদিকে তাঁর তীব্র দৃষ্টি থাকে। আমি ঐ-সবের ধার দিয়েই গেলাম না। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই বিদ্যাটি ভালো করে একটু শিখে নিতে হবে, তাই

আমি ডাক্তার দাসকে প্রত্যেক বিষয়ে আগে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তাঁর সকল কথার অনুসরণ করতে থাকলাম। কিছুদিন পরেই দেখলাম তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বনে গেল। তিনি আমাকে বরং একটু স্নেহের চোখেই দেখতে লাগলেন।

ডাক্তার দাস তখনকার দিনের খুব খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। অসাধারণ তাঁর প্রতিভা। শুধু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, তাঁর একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। রোগীরা তাঁর হাতে প্রায়ই সেরে উঠতো, মারা যেতো খুবই কম। আমি তো অন্তত তাঁর কোনো অপারেশনকেই ব্যর্থ হতে দেখি নি। যেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই সেখানে তিনি নিজেই ছুরি ধরতেন না।

রোগ চেনার শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ। ওয়ার্ডে ঢুকেই প্রথমে চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নিতেন, নতুন রোগী কে কে এসেছে। দূর থেকেই বলতেন, ওটা অমুক রোগ বলে মনে হচ্ছে না? তার পরে কাছে গিয়ে তাকে যথারীতি পরীক্ষা করতেন। বেশির ভাগ সময়েই দেখতাম, আগে যা অনুমান করতেন তা পরের ডায়াগ্নোসিসের সঙ্গে ঠিকই মিলে যেতো।

পোয়াতী প্রসবের ব্যাপারে তিনি নিজে সাধারণত হাত দিতেন না। সে ভার আমাদের ওপরই থাকতো। কোনো কঠিন কেস্ হলে দিনে বা রাত্রে অসময়ে তাঁকে ফোন করলেই তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়ি থেকে চলে আসতেন। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দিয়ে সব-কিছু করাতেন। ছুরি ধরবার দরকার হলে তখন তিনি হাত লাগাতেন।

আমি ছিলাম জুনিয়র; আমার উপর একজন ছিলেন সিনিয়র, তিনি ডাক্তার মুখার্জি। অনেক-কাল ঐ ওয়ার্ডে থাকায় তিনি ডাক্তার দাসের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলেন, এবং পরে তিনিও যথেষ্ট নাম করেছিলেন। একবার একটি মৃতবৎ শিশুকে প্রসব করিয়ে তিনি তাকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াবার জন্যে শেষ পর্যন্ত তার মুখে মুখ লাগিয়ে তিনি খুব জোরে জোরে ফুঁ দিতেন থাকেন। তাতেও কিছু ফল হয় নি। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল ডাক্তার মুখার্জির ঠোঁটের উপর একরকম ঘা ফুটে বেরিয়েছে। পরীক্ষায় জানা গেল তা সিফিলিসের ঘা। ঐ শিশুর মুখ থেকে রোগটি সংক্রামিত হয়েছে। প্রায় তিন মাসের জন্যে ছুটি নিয়ে তাঁকে চিকিৎসা করাতে হলো। সেই তিন মাসের জন্যে আমাকে একাই দুজনের কাজ করতে হতো। তখন আমার বাড়ি আসার ফুরসত হতো না। ওখানেই দু'বেলা হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খেতাম আর রাত্রে হাউস-সার্জনের বসবার

ঘরে শুয়ে থাকতাম। এতে যদিও বাড়ির লোকেরা খুব অসন্তুষ্ট হতো, কিন্তু আমার নিজের ওতে কাজ শেখবার খুব সুবিধা হয়েছিল।

ডাক্তার দাসকে তাঁর সকল অপারেশনেই আমি সাহায্য করতাম। সাহায্য করা মানে বিশেষ কিছু নয়; অপারেশন টেবিলের অপর পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এটা ওটা ধরতে বললে তাই ধরা, বা গজ তুলো প্রভৃতি সময়মতো এগিয়ে দেওয়া। তা ছাড়া সমস্ত কাজ তিনি নিজেই করতেন, অপর কাউকে তাঁর অপারেশনের মধ্যে হাত লাগাতে দিতেন না, এমন কি যন্ত্রপাতিতে পর্যন্ত নয়। স্টেরিলাইজ-করা যন্ত্রপাতি সব কিছুই সাজানো থাকবে পিছনের টেবিলের উপরকার পাত্রগুলিতে, যখন যেটি দরকার সে তিনি নিজের হাতে বেছে নেবেন। ট্রেগুলি সব শুক্‌নো, যন্ত্রপাতিও শুক্‌নো। কোথাও একফোঁটা জীবাণুনাশক লোশন বা জলের সংস্পর্শ নেই। তাঁর অপারেশনে কোনো লোশনের ব্যবহারই নেই। বাইরের কোনো জলবিন্দু তিনি তাঁর অপারেশনের জায়গাতে ঢুকতে দিতে চান না। তাঁর পদ্ধতি হলো 'ড্রাই' অপারেশন, সব-কিছুই শুক্‌নো থাকবে। আশ্চর্য এই যে রক্তপাতও তিনি খুব কম হতে দিতেন। আটঘাট সমস্ত বেঁধে নিয়ে তবে ছুরি চালাতেন, দৈবাৎ কোনো শিরা কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকত খুবই কম। চারিদিকে ক্লিপ-আঁটা সাদা তোয়ালের ঘেরার মধ্যে অপারেশনের ভিতরটা সর্বদাই দেখাতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেন বইতে আঁকা রঙীন একখানা ছবির মতো।

যত বড়োই অপারেশন হোক, খালি হাতে তিনি কাজ করতেন, সহজে দস্তানা পরতেন না। আর ছুরি ব্যবহার করতেম কেবল বাইরের দিকের চামড়া প্রভৃতি কেটে ফাঁক করার সময়, অপারেশনের ভিতরে প্রবেশ করলেই তিনি ছুরি ফেলে দিতেন। তখন চলতো কেবল তাঁর নিজের হাত আর কাঁচি। অন্যান্য যন্ত্র খুবই কম ব্যবহার করতেন, বেশির-ভাগ কাজ আঙুলের দ্বারাই সারতেন। আঙুলগুলিও তাঁর অসাধারণ লম্বা, মোটা মোটা মর্তমান কলার মতো, আর আশ্চর্যরকম ক্ষিপ্র ও নিপুণ। যন্ত্রের দ্বারাও যে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না, তাঁর আঙুলের দ্বারা সে কাজ অতি শীঘ্র ও অতি সহজে হয়ে যেতো। যেখানে কিছু কেটে বিচ্ছিন্ন করতে হবে সেখানে ছুরি নয়, কাঁচি। অল্প একটুমাত্র কাটবেন, তারপর আঙুল দিয়ে চারদিক ছাড়িয়ে নেবেন, তারপর আবার একটু কাটবেন। অবিচলভাবে এই কাজ তিনি করে যাবেন, অপারেশনের সময় মুখে কথাটি মাত্র বলবেন না। প্রয়োজন হলে ইঙ্গিত করবেন। সেইখানেই আমার কিছু সতর্কতা ও পূর্বপ্রস্তুতি

থাকা দরকার, হাত বাড়ালেই তাঁর ভঙ্গী দেখে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিতে হবে তিনি কি চাইছেন।

অপারেশনের সব কিছু করবেন তিনি নিজে। ছুঁচে সুতো পর্যন্ত পরাবেন নিজে, ক্লিপ্ এঁটে চামড়ার ফাঁক জুড়ে দেবেন নিজে, ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত করবেন নিজে। তাঁর অপারেশন ছিল দেখবার মতো জিনিস। অন্যান্য হাসপাতালের বড়ো বড়ো সার্জনরা মাঝে মাঝে তাই দেখতে আসতেন। পাশ্চাত্য দেশেরও কেউ কেউ এঁর অপারেশন পদ্ধতি দেখতে এসেছিলেন।

ডাক্তার দাসের হাতের বড়ো বড়ো অপারেশন শীঘ্রই বেমালুম জুড়ে যেতো. আর কখনই তা সেপ্টিক হতে দেখি নি। এইখানেই সার্জনের হাতের বাহাদুরি। ডাক্তারিও একটা আর্ট বটে, কিন্তু সার্জারি বোধ করি তার চেয়েও উঁচুদরের আর্ট। ডাক্তারিতে প্রকৃতির হাতের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়, কিন্তু সার্জারিতে সাফল্য সম্বন্ধে নিজের হাত থাকে তার চেয়েও অনেকখানি বেশি। ডাক্তারিতে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতাই একমাত্র সহায়, কিন্তু সার্জারিতে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও হাতের নিপুণতা থাকা চাই। মানুষের অঙ্গের মধ্যে আমি অস্ত্রাঘাত করবো, এই কথা নিশ্চিত জেনে যে—প্রকৃতিকে তা জুড়ে দিতেই হবে, প্রকৃতিকে আমি আমার পছন্দমতো মেরামতির কাজ করাতে বাধ্য করবো। কেবল এমন দক্ষতা আমার থাকা চাই যাতে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ কিছু না হয়, যাকে সংশোধন করে নেওয়া প্রকৃতির ক্ষমতার পক্ষে অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। সেইভাবে মানুষের দেহকে কাটা-ছেঁড়া করতে হবে, হাতসাফাই করা শিল্পীজনের মতো। তা ছাড়াও এমন হুঁশিয়ারি থাকা চাই যে ভালো করতে গিয়ে, মন্দ না হয়ে দাঁড়ায়। এমন সতর্ক হতে হবে যাতে ক্ষতস্থানে বাইরের কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তাকে সেপ্টিক ক'রে না তোলে। ডাক্তারিতে ব্যর্থতা ঘটলে বরং তা মার্জনীয়, কিন্তু সার্জারিতে ব্যর্থতা ঘটলে প্রায়ই তা অমার্জনীয়, বিশেষ কতকগুলি অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া। আগেকার দিনে সার্জারি-চিকিৎসা ছিল জীবের উপর অত্যাচার। কোনোগতিকে অপারেশন সার্থক হলেই হলো, রোগী তাতে কষ্ট পাক্ কিংবা মরে যাক্ সে-দায় সার্জনের নয়। কিন্তু এখনকার দিনের সার্জারিতে রোগীকে কোনোরকম কষ্ট দেওয়া চলবে না, এবং মরতে দেওয়াও চলবে না। এই হলো বর্তমান যুগের সার্জারির আর্ট। এই আশ্চর্যরকম আর্টে এখনকার যুগের মানুষ যত উন্নতি করতে পেরেছে, জগতের ইতিহাসের কোনো যুগেই তার তুলনা নেই। এই মানুষ-মেরামতির আর্টে সার্জনদের

দক্ষতা উত্তরোত্তর আরো বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন দেশে এমন সব সার্জন দেখা যাচ্ছে যাঁরা অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করে তুলছেন। তাঁরা অন্ধ-চোখকে দৃষ্টিক্ষম করছেন, বধির-কানকে শ্রবণক্ষম করছেন, মস্তিষ্কের মধ্যে ছুরি চালিয়ে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনছেন, এমন কি হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্যে থামিয়ে রেখে হার্টের মধ্যে ছুরি চালিয়ে তাকে মেরামত করে আবার আগের মতো চালু করে দিচ্ছেন। মানুষের বিগড়ে-যাওয়া দেহযন্ত্রকে কতখানি পর্যন্ত মেরামত করতে পারা যায়, সার্জারি হলো তারই এক অতুলনীয় আর্ট। ডাক্তার দাস সেকেলে মানুষ হলেও তিনি ছিলেন এমনি একজন আর্টিষ্ট-জাতের সার্জন। নিজের কাজের সঙ্গে ইনি সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যেতেন, তখন কিছুমাত্র আত্মচৈতন্য থাকতো না।

একদিন তিনি অপারেশন করছেন পেটের ভিতরকার এক টিউমার, ওজনে প্রায় পনেরো সের ভারি। একটি মাড়োয়ারী মহিলার বিরাট উদর-স্ফীতি ও বয়সাধিক্য দেখে কেউই তাকে অপারেশন করতে সাহস করে নি। ডাক্তার দাস বলেছিলেন কোনো ভয় নেই, আমি ওটি কেটে বের করে দেবো। হাসপাতালে ভর্তি করে মাসখানেক তাকে তিনি বিশ্রাম দিয়ে রাখলেন; নানারকম ওষুধ, খাদ্য ও ইনজেকশন প্রভৃতির দ্বারা তাকে যথেষ্ট সবল করে তুললেন। তারপর একটা দিন স্থির করে সেইদিন সকালে অপারেশন শুরু করলেন।

আগের থেকে তোড়জোড় সমস্তই প্রস্তুত। শিরার মধ্যে ধীরে ধীরে স্যালাইন ও গ্লুকোজ প্রয়োগ করা হচ্ছে; নিঃশ্বাস থেমে গেলে বা হঠাৎ হৃদ্‌স্পন্দন থামলে যা করা দরকার তার ব্যবস্থা সমস্তই ঠিক করা আছে। ক্লোরোফর্মের সঙ্গে ঈথর মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ডাক্তার দাস সংকল্প করে রেখেছেন যে বেশী রক্তপাত কিছুতেই তিনি হতে দেবেন না, তাতে অপারেশনে যত বিলম্বই ঘটুক। পেটটি উপর থেকে নীচে পর্যন্ত তিনি চিরে ফেলেছেন, রিট্রাক্টর দিয়ে দুই পাশের দেহমাংস ফাঁক করে ধরা হয়েছে, ধীর-স্থির অবিচল হাতে ডাক্তার দাস নিজের কাজ করে চলেছেন। ঘামে চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, মুখ ফেরালেই নার্স চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছিয়ে এবং চশমা সাফ করে আবার পরিয়ে দিচ্ছে। অল্প সময় তো নয়, টিউমারটিকে ভিতর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে দুই ঘণ্টা সময় লেগে গেল। তার পরে নানাস্থানে বাঁধতে হবে, জুড়তে হবে, পর্দার পরে পর্দা সেলাই করতে হবে, উপরের চামড়াকে দুই দিক থেকে মিলিয়ে ক্ষতস্থান বুজিয়ে দিতে হবে।

সমস্ত অপারেশনটি শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। রোগিণী সর্বক্ষণই অজ্ঞান অবস্থাতে অসাড় হয়ে রইল। মাঝে কোনো বিপদ ঘটল না, কোনো গোলমালই হলো না।

অপারেশন সেরে গায়ের এপ্রন ও মাথার ঢাকা খুলে ফেলে ডাক্তার দাস হাত ধুতে গেলেন। আমি তৃপ্তমনে স্মিতমুখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছি, তাঁর হাত ধোয়া হয়ে গেলে আমিও হাত ধুয়ে নেবো। হঠাৎ দড়াম করে ডাক্তার দাস আমার ঘাড়ের উপর পড়ে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেললাম, নইলে এমনই পড়েছিলেন যে মাথাটা মার্বেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকে যেতো। ধরে তখনই তাঁকে সেই মেঝের উপর শুইয়ে দিলাম। তখন তিনি একেবারেই অচৈতন্য, দেহে কোনো সাড়া নেই।

বরফ এনে মুখে চোখে ঘষতে থাকায় কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ মেললেন। চোখ চেয়েই তিনি উঠে বসলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো। তুমি আমার সঙ্গে এসো। ওদের বলো, রোগীকে তার বিছানায় যেতে, আর জ্ঞান হলে একটা মর্ফিয়া ইনজেকশন দিতে।"

আমার কাঁধ ধরে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। খুব সন্তর্পণে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম। চলে আসবার সময় তিনি বললেন—"এ-সব কোনো কথাই কাউকে বলবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, আমি বাড়িতে দু'দিন একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।"

সেইদিন ডাক্তার সরকার এসে তাঁকে পরীক্ষা করলেন। বললেন—"লো ব্লাড-প্রেসার। আর কিছু নয়, কয়েকটা দিন চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। বেশী পরিশ্রম করা আর আপনার এর পর থেকে চলবে না।"

ডাক্তার দাস সেই কথা শুনে একটু হাসলেন মাত্র।

কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পরে আবার যথারীতি তিনি কাজ করতে শুরু করলেন। আবার তেমনি বড়ো বড়ো অপারেশন করতে থাকলেন। তিনি অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত এই ধরণের কাজই করে গেছেন।

ছয় মাস পর্যন্ত ডাক্তার দাসের ওয়ার্ডে থেকে আমি আবার এসে ঢুকলাম মেডিক্যাল ওয়ার্ডে, ডাক্তার রায়ের অধীনে। ডাক্তার রায় তখন সবেমাত্র ওয়ার্ডের ভার পেয়েছেন। আমি হলাম তাঁর প্রথম জুনিয়র হাউস-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। তিনি বিলাত থেকে অনেক নতুন ধরণের চিকিৎসা শিখে এসেছেন, তাঁর কাছ থেকে অনেকরকম নতুন জিনিস শিখতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে খ্যাতনামা রজার্স সাহেবের সঙ্গেও কিছুকাল কাজ করলাম—যিনি কলেরা রোগে স্যালাইন ইনজেকশনের আবিষ্কার করেন। আমাশা রোগে এমিটিন ইনজেকশনের আবিষ্কার ইনিই করেছিলেন। প্রত্যহ একটি সাইকেলে চড়ে এসে সেই এমিটিন তিনি আমার হাতে দিয়ে যেতেন, আমাশা রোগীদের উপর প্রয়োগ করে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি একটি প্রশংসাপত্রও দিয়েছিলেন, তাতে পরবর্তীকালে আমার শিক্ষার উন্নতির পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

ডাক্তার রায়ের ওয়ার্ডে কাজ করার মেয়াদ যখন ফুরিয়ে গেল, তখন হাসপাতালের সকল বিভাগই আমি ঘুরে এসেছি। আর আমাকে সেখানে কোথাও নেবে না। কাজেই আমি তখন ডাক্তার রায়ের শরণাপন্ন হয়ে বললাম—"আপনার কাছে থেকে আমি আরো কিছু শিখতে চাই।" তিনি বললেন—"বেশ, কিন্তু তাহ'লে প্রত্যহ আমার চেম্বারে হাজিরা দিতে হবে, যে সময় আমি রোগী দেখি।" ডাক্তার রায়ের বাড়িতে তাঁর নিজস্ব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হতে পারা, এ তো পরম সৌভাগ্য। আমি সানন্দে তাঁর চেম্বারে গিয়ে নবাগত রোগীদের রিপোর্ট প্রস্তুত করতে লাগলাম। তাতে আমার রোগী দেখা ও ওষুধ নির্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা হতে থাকল। পরে অন্য চাকরিতে নিযুক্ত হলেও প্রায় দশ বছর অবধি প্রত্যহ বিকেলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে রোগী-দেখার কাজটি আমি ছাড়িনি।

॥ পাঁচ ॥

হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে কিছুকাল আমি বেকার বসে রইলাম। ঠিক বসে থাকা নয়, কোথায় বসে নিজের প্র্যাক্‌টিস করা যায়, কোথায়ই বা একটা ডাক্তারখানা খোলা যায়, কোনো বড়ো ডাক্তারখানাতে প্রত্যহ বসবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিনা—ইত্যাদির সন্ধানে নিযুক্ত হয়ে রইলাম।

তা ছাড়া ঘরে ঘরে ডাক্তারি করাও আমার তখন থেকে শুরু হয়ে গেল। অবশ্য সে হলো অধিকাংশই বেগারের ডাক্তারি। ভগ্নীপতিরা, আত্মীয়কুটুম্ব আর বন্ধুবান্ধবরা সবাই আমাকে ডাকে, কারণ সবাই জানে যে ওতে পয়সা লাগবে না। আত্মীয়ের সংখ্যাও আমাদের কম নয়, আর ভাগ্যগুণে বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়। তাদের মধ্যে যে-কেউ খবর দিলেই আমি ছুটে যাই।

তাদেরও সুবিধা হয়, আর আমারও যাকে বলে প্র্যাক্‌টিস তাই রপ্ত হতে থাকে। ডাক্তার রায়ের ওখানে গিয়ে যে-সব নতুন নতুন ওষুধের নাম শিখছি সেগুলিকে সুবিধা পেলেই ঐসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে ছাড়ি না। তারা নিজেদের পাড়ার ডাক্তারখানাতে সেই সকল প্রেসক্রপশন নিয়ে যায়, কিন্তু ডাক্তারখানার লোকেরা অবাক হয়ে প্রেসক্রপশন ফিরিয়ে দেয়, বলে যে এ-ওষুধের নামও কখনো শোনেনি। রোগীর বাড়ির লোকেরা যখন এ-কথা আমার কাছে নালিশ করে, তখন আমি একটু মুচকে হেসে বলি—"তোমরাও যেমন, তাই পাড়ার রদ্দি ডাক্তারখানাতে ওষুধ কিনতে গেছ। চৌরঙ্গীতে গিয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তারখানায় খোঁজো, সেখানে ঠিকই মিলে যাবে।" হয়তো কোনো একটা নামজাদা ডাক্তারখানার ঠিকানাও বলে দিই।

কিন্তু এতে আত্মীয় মহলে আমার একটা বদনাম রটল। আমি নাকি সদ্য আবিষ্কৃত নতুন ওষুধ দিয়ে তাদের উপর এক্সপেরিমেণ্ট চালাই, কিংবা দামী দামী ওষুধ লিখে দিয়ে তাদের জব্দ করি।

এ কথা একদিন আমার দাদাবাবুর কানে গেল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন—"ওহে বড়ো ডাক্তারবাবু, তোমার ডাক্তারিতে যে বদনাম হচ্ছে। এমন সব ওষুধ তুমি দাও যা বাজারে কোথাও পাওয়া যায় না, কিংবা পাওয়া গেলেও তার অনেক বেশি দাম নেয়। সোজাসুজি যা সস্তার ওষুধ তাই দাও না কেন?"

আমি বললাম—"তাই কি উচিত? চেনা আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে রোগ হলে যে ওষুধটিকে সব চেয়ে কাজের বলে জানি সেই ওষুধই দেবো। তাতে না হয় বেশি কিছু দাম পড়বে, কিন্তু রোগটা তাড়াতাড়ি সারবে। বেশিদিন ভুগতে হবেনা। সেখানে কৃপণতা করতে যাবো কেন?"

"তুমি এ-সব নতুন নতুন ওষুধ শিখলে কোথা থেকে? জার্নাল থেকে খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করো নাকি?"

"তা কেন, ডাক্তার রায় নিজে এইসব ওষুধ প্রেস্‌ক্রপশন করেন, তাতে তাঁর কত রোগী আরাম হয়ে যাচ্ছে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি।"

"ও, তাই বলো! কিন্তু তুমি তো বাপু এখনও ডাক্তার রায় হওনি। তাঁকে অনেক দর্শনী দিয়ে যারা দেখাতে পারে, তারা তেমনি অনেক দাম দিয়ে ওষুধগুলোও কিনতে পারে। কিন্তু এরা তা পারবে কেন? যারা বিনা দামে ডাক্তার দেখাবে, তারা অল্প দামের ওষুধই চাইবে। তোমার পুঁথিতে কি অল্প দামের ওষুধের কথা কিছু লেখা নেই?"

এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাচ্ছি দেখে তিনি আবার ডেকে বললেন—"ওহে শোনো শোনো, তুমি বরং এক কাজ করো। কি কি নতুন ওষুধ শিখেছ তাই লাগিয়ে আমার বাতটা আগে ভালো ক'রে দাও দেখি। এই হাঁটুর ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না। লাঠি না নিয়ে চলতে পারি না, বেড়াতে বেরিয়ে অনেক জায়গায় বসে পড়তে হয়। সারাও এই ব্যথাটা, দেখি তুমি কত বড়ো ডাক্তার। তুমি যেখান থেকে যা আনতে বলবে আমি তাই আনাবো। আজ থেকেই শুরু করো।"

খুশি হয়ে আমি দাদাবাবুর চিকিৎসা নিয়ে পড়লাম। কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে মালিশ ও সেঁকতাপ। হাঁটুর ব্যথাটি তাতে কমে গেল। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বললেন—"ওহে, ঐ হাঁটু ছেড়ে যে আবার এই হাঁটুটায় ধরলো। এ কি রকম চিকিৎসা হলো?"

আবার উৎসাহের সঙ্গে আমি দ্বিতীয় হাঁটুর চিকিৎসায় লাগলাম।

কিন্তু অতঃপর আমার ভাগ্যনিয়ন্তা অচিরেই আমাকে এ বিষয়ে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দিলেন। যাকে বলে রীতিমতো ঠেকায় পড়ে শেখা।

ইতিমধ্যে কলকাতার বাইরে আমার এক অস্থায়ী চাকরি জুটে গেল। মাত্র এক মাসের চাকরি। বিহার প্রদেশের কোনো রাজার ছেলের অন্নপ্রাশন হবে, সেই উপলক্ষে সেখানে প্রায় একমাস-ব্যাপী উৎসব চলবে। চতুর্দিক থেকে বহু অভ্যাগত সেখানে জড়ো হবে, মস্ত এক মেলা বসবে, নাচগানের আসর বসবে। মহা সমারোহের ব্যাপার। কিন্তু সেখানে ভালো একজন ডাক্তার রাখা দরকার, বেশি মানুষের ভিড়ে হঠাৎ কার কি হয়ে পড়ে বলা যায় না। সেখানে রাজার একটি দাতব্য ডাক্তারখানাও আছে, তাতে একজন স্থানীয় ডাক্তারও আছে, কিন্তু কেবল তার উপর নির্ভর করা এখন চলে না। কলকাতার একজন শিক্ষিত ডাক্তার সেখানে নিযুক্ত থাকলে ভালো হয়। ওষুধপত্র সবই আছে, কিন্তু কোনো বিপদ ঘটলে তৎক্ষণাৎ সামলে নিতে পারবে এমন একজন সুদক্ষ ডাক্তার চাই। মাইনে মিলবে পাঁচশো টাকা। তা ছাড়া খাওয়া থাকা ও দুজন চাকর মিলবে নিখরচায়। একজন প্রফেসর আমাকে স্নেহ করতেন, তিনি আমাকে ডেকে এই চাকরিটি দিলেন; বললেন —"যাও দিনকতক বাইরে ঘুরে এসো, অনেক কিছু দেখাও হবে, আর মোটা টাকাও কিছু হাতে আসবে।"

শুনে দাদাবাবু খুব খুশি হলেন। বিহারের সব জায়গাই তাঁর জানিত। বললেন—"ও জায়গাটি খুব স্বাস্থ্যকর, হয়তো বিশেষ কিছু ডাক্তারি তোমাকে

করতেই হবেনা। কিন্তু দেখো, ওখানে গিয়েও দামী-দামী নতুন ওষুধ করমাস ক'রে বোসো না।"

হ্যাট কোট চড়িয়ে পুরো ডাক্তার সেজেই আমি যাত্রা করলাম। তখন অঘ্রাণ মাস, বিহারে দারুণ শীত। একটি মোটা ওভারকোট কিনে নিতে হলো। দাদাবাবুই কিনতে বললেন।

সারারাত ট্রেনে কাটিয়ে নির্দিষ্ট স্টেশনে গিয়ে নামলাম। ভোরবেলা, তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। স্টেশনে নেমে চারিদিকে চেয়ে মনটি খুশিতে ভরে উঠল। মাঠের মাঝে মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাপরার ঘর, এই তো আমার ছেলেবেলাকার সেই পরিচিত দেশটি। জ্ঞান হবার পরে প্রথম সূর্যোদয় তো এখানেই দেখেছিলাম। বেশিদিন আগের কথা বলে মনেই হয় না!

গন্তব্য স্থান কাছে নয়, স্টেশন থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে। জায়গাটির নাম এখানে নাইবা বললাম। সেখানে যেতে হয় গরুর গাড়িতে, কিংবা পাল্কিতে, কিংবা হাতীতে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে রাজা পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গরুর গাড়িও বিস্তর এসে জড়ো হয়েছে, কলকাতায় কেনা তাঁদের অনেক কিছু মালপত্র নিয়ে যাবার জন্যে।

গন্তব্যস্থানে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। পাল্কি একটানা বরাবর যেতে পারেনি, দুই-চার স্থানে থেমে বিশ্রাম নিতে হয়েছে। রাজার বাসভূমি খুব বড়ো। গ্রামের মাঝখানে রাজার প্রকাণ্ড প্যালেস, গড়ের মতো উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই প্যালেসকে ঘিরেই সুবৃহৎ গ্রামখানি গড়ে উঠেছে। গ্রামের লোক অধিকাংশই গোয়ালা আর ভুঁইয়া, গরু মহিষ আর লাঙল নিয়েই তাদের কারবার। প্যালেস থেকে একটু তফাতে রাজার দাতব্য ডাক্তারখানা। সেইখানেই তার পাশের একটি আলাদা ঘরে আমার থাকবার স্থান হয়েছে। সেখানে দুটি চেয়ার, একটি টেবিল, একখানি খাটিয়া পেতে দেওয়া হয়েছে। আমাকে অভ্যর্থনা করলে বেশ ভদ্র চেহারার একজন যুবক। তার মুখের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য উপর দিকে চোম্‌রানো সুপুষ্ট মোচের গুচ্ছ। সে আমাকে এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে—"হুজুর, আমিই এখানকার ডাক্তার, আমিই এখানকার কম্পাউণ্ডার। আমার খুবই ভাবনা হচ্ছিল, গ্রামে অনেক বাইরের লোকের ভিড় জমে গেছে; আপনি আসাতে আমার ঝক্কি কমে গেল। এখানে বিলাতী ভালো ভালো ওষুধপত্র সবই মিলবে, যখন যেটি চাইবেন। রাজা এখানকার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে ওষুধ কিনতে কিছু কসুর করেন না। কিন্তু সে-সব ওষুধ প্রায় পড়েই থাকে, এখানে তার কোন

দরকারই হয় না। আপনি কি একবার দেখে নেবেন, কি কি ওষুধ আমাদের স্টকে আছে?"

কিন্তু ওষুধের স্টক্ দেখবার জন্যে আমি একটুও ব্যগ্র নই, আমার তখন খুব খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়া হয়নি। স্টেশনে চা খেয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু নতুন দেশ দেখবার ঔৎসুক্যে সে কথা মনেই হয়নি। আমি সেই লোকটিকে বললাম,—"ও-সব এখন থাক। আগে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?"

যুবকটির নাম শুনলাম দুর্গাপ্রসাদ। সে চায়ের কথা শুনে বেজায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। ইতস্তত ক'রে বললে—"একটু দাঁড়ান হুজুর, আমার মাকে ডেকে আনি।" এই বলে সে ছুটে চলে গেল।

পাশেই একটি খোলার বাড়িতে ওরা বাস করে। সেখান থেকে সে তার বুড়ী মাকে ডেকে আনলে। কি সুন্দর তার চেহারা, আর কি সুন্দর স্বাস্থ্যটি! বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় দুধের ফেনার মতো এলোমেলো এক মাথা পাকা চুল, সামনের দাঁত কয়েকটি পড়ে গেছে। কিন্তু সেই ফোকলা মুখে কি স্নেহমাখা একটি মিষ্টি হাসি! আমি যেন তার কত কালের পরিচিত। খুব কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে এক মুখ হেসে সে বললে—"কেয়া খাওগে বেটা?"

আমি চায়ের কথা বলতেই সে তার ছেলেকে বললে—"চায়ের জন্যে আর হাঙ্গামা কি আছে? বেনিয়ার দোকান থেকে দু পয়সার চা-পাত্তি কিনে নিয়ে আয়, আমি এখনই বানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমার বানানো চা কি ও ছেলের পসন্দ্ হবে?"

আমি বললাম—"খুব হবে। তুমি এক লোটা গরম জল নিয়ে এসো, আর চা নিয়ে এসো, আমি নিজেই বানিয়ে নিচ্ছি।"

বুড়ী বললে—"ছি ছি বেটা, জলে ভিজিয়ে চা খাবে কেন? আমি গরম খাঁটি দুধ এনে দিচ্ছি, আমার নিজের গরু আছে, আর চিনি এনে দিচ্ছি, দুধের সঙ্গে চা বানিয়ে খাও।"

অগত্যা আমাকে তার কথাই শুনতে হলো।

দুধ-চা খেয়ে তো প্রাণ বাঁচলো। কিন্তু তার পর খাওয়াদাওয়ার কি ব্যবস্থা?

বুড়ী বললে—"তারও কোনো ভাবনা নেই, রাজবাড়ি থেকে তোমার জন্তে সব রকম সিধা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

সে আবার কি ব্যাপার ?

বুড়ী পাশের ঘর থেকে দুটি বড়ো বড়ো বারকোশ এনে আমার সামনে ধরে দিলে। একটিতে আছে প্রচুর পরিমাণে আটা, ডাল, ঘি, আলু, কলা প্রভৃতি আনাজ তরকারি। আর একটিতে লাড্ডু, পেঁড়া, দরবেশ, মিঠাই, কিশমিশ ও বাদাম পেস্তা, দুই তিন রকমের আচার, ভাঁড়ে-ভরা দই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—"এত সব জিনিস কে খাবে ?"

বুড়ী হেসে বললে—"তুমি খাবে বেটা, তোমার জন্যে এসেছে। যা পারবে তাই খাবে।"

আমি বললাম—"এ-সব রাঁধবে কে ? আর ভাতের ব্যবস্থা কই ?"

বুড়ী বললে—"আমি রেঁধে দেবো, আমরা ব্রাহ্মণ আছি। আর রইস্ আদমিরা কি ভাত খায় ? আমি তোমার জন্যে পুরি, তরকারি পাকিয়ে দেব।"

আমি বললাম—"ও-সব পুরিটুরি আমার পোষাবে না। দুবেলা দুটি ভাত আমার চাই। আমরা ভাতখোর বাঙালী, ভাতই খেতে ভালোবাসি।"

বুড়ী বললে—"আচ্ছা, তারই ব্যবস্থা করছি। আর ভাজি-উজি ?"

আমি বললাম—"ও-সব কিছুই আমার চাই না। ভাতের মধ্যে দুটো আলু-টালু আর কাঁচকলা ফেলে দিও, আর একটু ডাল বানিয়ে দিও, তাতেই আমার চলে যাবে।"

সেই ব্যবস্থা হলো। ভাত, আলু-কাঁচকলা ভাতে, একটু ঘি, আর ডাল। তারপরে একটু দই, একটু কিছু আচার, আর ইচ্ছা হলে কিছু যাহোক মিষ্টান্ন। সঙ্গে বিস্কুট ছিল, দুইবেলা তাই দিয়ে দুধ-চা। এই হলো আমার দৈনন্দিন খাদ্যের বরাদ্দ। বারকোশ-ভরা সিধা প্রত্যহই আসতো, ওরা সেটা নিয়ে নিতো। কেমনভাবে অতো জিনিসের সদ্ব্যবহার করতো তা বলতে পারি না। ওরা তো মাত্র দুজন প্রাণী। দু-একদিন বুড়ী যত্ন ক'রে ভাজি তরকারি আমাকে বানিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সে ঝালে এবং হিঙে ভরা অখাদ্য। মুখে দেওয়া যায় না। আমি ভাবতাম, ঝাল যদি খেতে হয় তো লঙ্কা চিবিয়ে খেলেই হয়, তরকারিগুলোর মধ্যে এমনভাবে তা ঢুকিয়ে দেওয়া কেন ? কিন্তু এমনটি খেতেই ওরা অভ্যস্ত, আর এতেই ওদের রুচি।

এদিকে আমার কাজ বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কাজ কেবল দুবেলা প্যান্ট-কোট চড়িয়ে নিজের চেহারা দেখানো। গ্রামসুদ্ধ লোক দুবেলা ভিড় ক'রে আমাকে দেখতে আসতো, কলকাতা থেকে নতুন এক ডাক্তার-সাহেব

এসেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখতেই থাকতো, জু-গার্ডেনে গিয়ে যেমন তফাৎ থেকে দাঁড়িয়ে দর্শকেরা বাঘ-সিংহ দেখে।

রোগী আসতো ক্বচিৎ দুই-একজন মাত্র। কারো পেট দুখাচ্ছে, কারো শির দরদ করছে, কারো বা হাতে পায়ে আঘাত লেগে খানিক কেটে ছিঁড়ে গেছে। তার ব্যবস্থা দুর্গাপ্রসাদই করতো, আমাকে কিছুই করতে হতো না। দেখলাম যে এদের সকলের স্বাস্থ্য এমনিতেই ভালো থাকে, বিশেষ কিছু অসুখবিসুখ হয় না।

ডাক্তারখানার ওষুধের স্টক্ দেখলাম। দুটো আলমারি আছে, সত্যই তা ওষুধে ভরা। কিন্তু বেশির ভাগই কেবল টিংচার। নানারকম টিংচারের বড়ো বড়ো বোতলে আলমারি ভরে আছে। যেন ফার্মাকোপিয়ার বই খুলে এ থেকে জেড্ পর্যন্ত অক্ষরানুক্রমে যত-কিছু টিংচার আছে সবই ফর্দ ক'রে আনিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আছে সোডা বাইকার্ব, আর পটাস সাইট্রেট আর ক্যালসিয়ম, আর ম্যাগ সালফ। এইগুলিকে নিয়ে যা ডাক্তারি করতে পারো করো। ফিবার-মিকশ্চার বানাও, হজমের মিকশ্চার বানাও, জোলাপের আরক বানাও, যা তোমার খুশি। টিংচার তো সব রকমই রয়েছে। আর কুইনিনও অবশ্য আছে। কিন্তু তা ছাড়া কলেরা হলে তার কিছু করবার উপায় নেই। নিউমোনিয়া হলে ঐ টিংচার দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করবার উপায় নেই। ডিসেন্টি্র হলে কিছু করবার উপায় নেই। টাইফয়েড হলেও কিছু না, আর প্লেগ হলেও কিছু না। অপারেশনের জন্যে কয়েকটা ছুরি-কাঁচি আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারের অভাবে তাতে মরচে পড়ে গেছে। ইনজেকশন দেবার কোনো-কিছু ওষুধই নেই, একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ পর্যন্ত নেই। তেমন যদি কোনো কঠিন রোগ এসে পড়ে তাহ'লে বসে বসে আমাকে হাত কামড়াতে হবে। নিজের নিত্য ব্যবহারের ডাক্তারী ব্যাগটি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই আমিও সঙ্গে আনিনি। কলকাতা থেকে এখন নতুন কিছু আনতে চাইলে তোড়জোড় ক'রে তা আসতে-আসতেই এক মাস সময় পার হয়ে যাবে। দুর্গাপ্রসাদকে এ কথা বলায় পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে একটু হেসে বললে—"এতেই তো এতকাল চলে এসেছে বাবু, আপনিও এতেই ঠিক চালিয়ে দেবেন।"

চালিয়ে অবশ্য সে ই দিচ্ছে, আমি তো কিছুই করছি না। তখন আমার কাজ হলো চারিদিক দেখে-শুনে ঘুরে বেড়ানো। অন্নপ্রাশনের উৎসবটা কেমন চলেছে তাই মাঝে মাঝে দেখে বেড়াতে লাগলাম।

রাজবাড়িটি যেন এক মস্ত দুর্গের মতো। তার ফটকের ভিতর দিয়ে ঢুকেই এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ, প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তার তিন দিক ঘিরে মোটা থামওয়ালা সুবৃহৎ অট্টালিকা, প্রশস্ত বারান্দায় ঘেরা মহলের পর মহল চলে গেছে। অট্টালিকাগুলির নীচে থেকে উপর পর্যন্ত নানাবর্ণের ধ্বজাপতাকা দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। আমন্ত্রিত হয়ে আশপাশের দেশগুলি থেকে বড়ো বড়ো জমিদারেরা এসেছে, তাদের জন্যে এক একটা মহল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝখানে কোথাও বা মেলা বসেছে, কোথাও বা চরকিবাজি হচ্ছে, কোথাও কাঠের ঘোড়ার ঘূর্ণি ঘুরছে, কোথাও বেলোয়ারি চুড়ির বাজার বসে গেছে। আর স্থানে স্থানে সামিয়ানা খাটিয়ে চলেছে বাইজীর নাচ আর গানের জলসা।

একদিন এক বাইজীর নাচের আসরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

সন্ধ্যার পরে অনেকগুলো ডে-লাইট্‌ জ্বালা হয়েছে, তার নীচে বসেছে নাচের আসর। সেখানে বেজায় ভিড়। বাবু-ভাইরা আসরে পাতা জাজিমের উপর সারি দিয়ে বসেছে, তাদের পিছনে বসেছে সাধারণের দল। তবল্‌চি খুব দ্রুত লয়ে তবলা বাজাচ্ছে, সারেঙ্গীবাদক বাইজীর পিছু পিছু ঘুরছে, আর দুই হাতে প্রচুর চুড়িপরা এক ক্ষীণাঙ্গী বাইজী মৃদু নাচের ভঙ্গীতে ঘুঙুর বাজিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে নানারূপ লাস্যজনক ভাও বাৎলিয়ে একটি গান গাইছে। গান গাওয়া মানে তার দুটি মাত্রই কলি, নানারকম স্বরের তান ও ব্যঞ্জনা দিয়ে বারে বারে তাই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। কলি দুটি আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। সে বলছে—

"নদীকিনারে বগুলা বৈঠে মছরি চুন্‌চুন্‌ খায়
ঝিঙা মছরি কাঁটা মারে তড়প তড়প জিউ যায়,
—হাঁ হাঁ তড়প তড়প জিউ যায়।"

এই হলো তার গানের বক্তব্য। স্মিতহাস্যে চোখের মুখের নানা ভঙ্গী সহকারে সে এই বগুলারই গান গাইছে। আর প্রতি সমের শেষেই দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হয়ে "হায় হায়" ক'রে তালিম জানাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাইজী একটি রূপার রেকাবি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। গাইতে গাইতে বাবুভাইদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে,—তাতে প্রচুর প্যালা পড়ছে। উৎসাহ পেয়ে বাইজী আরো বেশি ক'রে গলার কসরত দেখাচ্ছে।

এখানকার মানুষরা কত অল্পেই তুষ্ট হয়! একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে এইই ওদের এক পরম বৈচিত্র্য, এতেই ওরা মহা খুশি। এমন গান আর

বুঝি কখনো শোনেনি। রসবস্তুর যে কত বৈচিত্র্য আছে তা এরা জানেই না।

উৎসব দেখে শুনে ফিরে গিয়ে নিজের খাটিয়াটিতে শুয়ে পড়তাম। বলতে ভুলে গেছি, দুজন চাকর পালা ক'রে দিবারাত্র সর্বদাই আমার কাছে মোতায়েন থাকতো, যেখানে আমি যেতাম আমার সঙ্গে সঙ্গে যেতো। রাত্রে একজন মেঝেতে আমার কাছে শুতো, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘুমোই আমার গা হাত টিপে দিতো। বারণ করলে শুনতো না, বলতো যে এটা ওদের দস্তুর। অগত্যা আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে বলতাম, এর উপর থেকে যত পারো টেপো। তাই টিপতো। তাতে বেশ আরামই হতো, শীঘ্রই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম।

কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ডাক্তারি ফলাবার সুযোগ এসে গেল। স্বয়ং রাজা-বাহাদুরেরই উপরে। রাত্রে খবর এলো তিনি অসুস্থ। তখনই ছুটলাম তাঁকে দেখতে। পেটে খুব কলিক্ ব্যথা ধরেছে, সম্ভবত কিছু অধিক মাত্রাতে লাড্ডু পেঁড়া উদরস্থ করেছিলেন। পেটটি ফুটবলের মতো টাইট্ হয়ে উঠেছে, বায়ু পর্যন্ত নিঃসরণ হচ্ছেনা। কি আর করি, পেটে সেঁক দিতে বললাম, আর যতরকম ব্যথা-নিবারক টিংচার আছে সমস্ত মিশিয়ে এক ওষুধ তৈরি ক'রে পাঠিয়ে দিলাম। ভাবলাম পেটের কষ্ট ওতেই অবিলম্বে কমে যাবে।

কিন্তু সকাল হতেই খবর এলো, ব্যথা কিছুমাত্র কমেনি। গিয়ে দেখি, বাড়ির সমস্ত লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, রোগীর ঘরে বেজায় ভিড় জমেছে। কেউ সেক দিচ্ছে, কেউ হাত বুলোচ্ছে, কেউ পা টিপছে। সবাই সন্ত্রস্ত। এদিকে রোগীর অবস্থাও খুবই আশঙ্কাজনক। তাঁর মুখ চোখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে, শীতের দিনেও কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে, যন্ত্রণায় তিনি দারুণ ছটফট করছেন, একমুহূর্ত স্থির নেই। চোখে দেখা যায় না এমন সঙ্গীন অবস্থা। ব্যাপার দেখেই আমি আর দাঁড়ালাম না; বললাম—"এখনই আমি এর ওষুধ নিয়ে আসছি।" বলেই ডাক্তারখানায় ছুটলাম।

মনে করলাম, আমার ব্যাগে একটি মর্ফিয়া আম্পুল আছে, এখনই তা এনে ইন্‌জেকশন দিয়ে দেবো। কিন্তু ব্যাগ খুলে দেখি সেই অ্যাম্পুলটির মুখ ভাঙা, সেটি শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আমার তো মাথা ঘুরে গেল। এখন তাহ'লে কি উপায় করি! এখানে কোনো কিছুই মিলবে না।

ভেবে চিন্তে দেখলাম, একমাত্র উপায় আছে, ডুশ দিয়ে ধোলাই করে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোনো কিছু করবার রাস্তা নেই। দুর্গাপ্রসাদকে

সেই কথা বললাম। দুর্গাপ্রসাদ জিভ কেটে বললে—"ওরে বাস্ রে, রাজা-বাহাদুরকে ডুশ দেওয়া! বাড়ির কেউই ওতে রাজি হবে না। নিতান্ত অশোভন অশ্লীল ব্যাপার, কে ও কাজে সাহস করবে? আর শুনলেই রাজা-বাহাদুর ক্ষেপে যাবেন, কারও তাহলে জান থাকবে না।" আমি বললাম—"তা হোক, আমি নিজেই ডুশ দেবো, তুমি জিনিসগুলো এনে দাও।"

দুর্গাপ্রসাদ কোথা থেকে এক চটাওঠা ডুশক্যান্ ও তোবড়ানো রবার-টিউব এনে হাজির করলে। অগত্যা আমি তাই ধুয়ে নিয়েই ছুটলাম।

রোগীর ঘরে গিয়ে বললাম—"খানিকটা গরম জল এনে দাও, আর তোমরা সবাই এখান থেকে সরে যাও। একজনও থাকতে পাবে না।"

গরম জল এলে আমি সকলকে তাড়িয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। আগের থেকে কোনো কিছুই না জানিয়ে রোগীকে পাশ ফিরে শুতে বলে আমি যথারীতি ডুশ দিতে শুরু করলাম। অতিরিক্ত যন্ত্রণার কারণেই হোক, বা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস থাকার জন্যেই হোক, রাজা-বাহাদুর কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করলেন না।

পুরোপুরি ডুশ দেবার পরেই পেট থেকে প্রচুর বদ্ধ মল নির্গত হতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পেটের যন্ত্রণা কমে গেল, তিনি আরাম বোধ করতে লাগলেন। তখন বাড়ির লোকজনদের ডেকে দিয়ে আমি সরে পড়লাম। তখন বুঝতে পারলাম, মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন যে দেওয়া হয়নি সে খুব ভালো কাজই হয়েছে, ঐ বদ্ধ মলগুলো তাহ'লে পেটের মধ্যে থেকেই যেতো। ইন্‌-জেকশনে ব্যথার সাময়িক নিবৃত্তি হতো বটে, কিন্তু মর্ফিয়ার গুণ ফুরিয়ে গেলেই আবার যন্ত্রণা শুরু হতো, তখন আরো মুশকিল হতো।

এর পর চারদিকে কিন্তু মুখে মুখে গুজব রটে গেল যে রাজা-বাহাদুর নির্ঘাত মারা যাবার শেষ পৈঠাতে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, ডাক্তার-সাহেব যন্ত্র লাগিয়ে সেই অবস্থা থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছে। এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন ডাক্তার গ্রামে কখনো দেখা যায়নি। এ লোকটি যা বলবে তা একেবারে অকাট্য। সবাই এসে অনর্থক আমাকে নাড়ি দেখাতে শুরু করলে, যেমন ক'রে জ্যোতিষীর কাছে ওরা কররেখা দেখায়। কোনো কিছু কথা না ব'লে হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপচাপ চেয়ে বসে থাকে, কথা বলবার যদি হয় তো তুমি বলো, আমি কিছু বলছি না। যদি জিজ্ঞাসা করি—"কি হয়েছে তোমার?" তাহ'লে সোজা বলে দেয়—"নাড়ি ধরকে সমঝ লিজিয়ে।" অর্থাৎ নাড়ি ধরলেই তো আদ্যন্ত সব তুমি বুঝতে পারবে, তাহ'লে আমি আর নিজের

মুখে বলি কেন? কি করি, নাড়িটা একবার হাত দিয়ে চেপে ধরতেই হয়। তার পর যাকে বলি—"কিছুই অসুখ তোমার নেই, সব ঠিক আছে"; সে তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে চলে যায়। বাইরে গিয়ে বলে বেড়ায়, ডাক্তার-সাহেব নাড়ি ধরে বলে দিয়েছে তার সব ঠিক আছে। আবার যাকে বলি—"তোমার দেহ এত দুর্বল দেখছি কেন?"—সে অমনি খুশি হয়ে বলে, ডাক্তার-সাহেব নাড়ি ধরে ভিতরকার খবর বুঝে ফেলেছে। "তাহ'লে এর কি প্রতিকার করতে হবে? কোনো দাওয়াই খেতে হবে?" আমি বলি—"না না, তার দরকার নেই, ভালো ক'রে দুধ ঘি খেলেই সেরে যাবে।" পুষ্টিকর খাদ্যের মাত্রা সেই দিন থেকেই সে বাড়িয়ে দিলে। এমনি আমি যে কথাই যাকে বলতে থাকি তাই ওদের মনের বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যায়। সরল বিশ্বাস এমনি জিনিস। কিন্তু প্রথমে আমার কিছু কাজ না থাকলেও পরে কাজের মাত্রা বেড়ে গেল। যদিও তা বেশির ভাগই এমনি বাজে কাজ।

শুধু তাই নয়, অতঃপর দূর-দুরান্তর থেকে কল্ আসতে শুরু হলো। কিন্তু আমার সে কল্ গ্রহণ করা উচিত নয়। যারা আসে তাদেরই আমি বলি, আমি রাজা-বাহাদুরের চাকরি নিয়ে এখানে এসেছি, তাঁর হুকুম ছাড়া আমি কোথাও যেতে পারি না। এই শুনে সকলেই ফিরে যায়।

কিন্তু খানিকটা দূর গ্রামের এক জমিদার, সে রাজা-বাহাদুরের কাছেই অনুরোধ ক'রে পাঠালে, বাতে সে পঙ্গু, তাঁর ডাক্তারকে দিয়ে সে ইলাজ্ করাতে চায়। রাজা-বাহাদুর তাতে সম্মতি দিলেন। তখন সেই জমিদার আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এক হাতি পাঠিয়ে দিলে। দুর্গাপ্রসাদ বললে, "চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে যেতে হবে।" আমি বললাম, "যেখানেই যেতে হোক, আমি একা যাবো না।" তাকেও আমি সঙ্গে নিলাম। সেও দেখলাম তাই চায়, খুশি হয়ে সঙ্গে চলল।

হাতিতে উঠতে কেমন ভয় করতে লাগল। সে কথা আমার এখনও মনে আছে। জীবনে কখনো হাতিতে চড়িনি। তাতে আবার হাতির উপর হাওদা নেই, তার পিছন থেকে দড়ি ধরে উঠতে হবে, আর পিঠের উপর পা ঝুলিয়ে দড়ি ধরে বসে থাকতে হবে। বসবার আসনটি হাতির পিঠের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু চড়ে দেখলাম যে ভয়ের কিছু নেই। হাতি যখন চলতে থাকে তখন গা দোলে, তাতে বেশ আমোদ হয়। রাজকীয় বাহন বৈকি!

জমিদারের কাছে গিয়ে বসতে জমিদারও হাতখানি বাড়িয়ে দিলে। পায়ে হাতে তার অনবরত এক দুর্গন্ধ তেল মালিশ হচ্ছে, হাত-পা গুলো সর্বদা তেলে

চক্‌চক্‌ করছে। সর্বাঙ্গেই তার ব্যথা, যেখানেই গাঁঠ আছে সেখানেই ব্যথা, যেখানে গাঁঠ নেই সেখানেও ব্যথা। ঘাড়েও ব্যথা, পিঠেও ব্যথা, পেটের মাংসেও ব্যথা। একে কোন্‌ জাতের বাত বলি? রিউম্যাটিজম্‌, না আথ্রাইটিস, না গাউট, না অন্য কিছু? মায়োসাইটিস্‌? ফাইব্রোসাইটিস্‌?—কোনোরকম বাতই বটে, না আর কিছু? বই-এর কোনো সংজ্ঞার সঙ্গেই যে মিলছে না।

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানলাম, লোকটির গতিবিধি খুবই সংক্ষিপ্ত। দিনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাইরের খাটিয়াতে, আর রাত্রে সেখান থেকে ফিরে যায় ঘরে। দশ-কুড়ি ফুটের বেশি তার হাঁটা চলা নেই। ব্যথার ভয়ে সে হাঁটতে সাহসই করে না। দুজন দুপাশ থেকে ধরে থাকে, তবে ঐটুকু সে কোনোগতিকে হাঁটে। আরো খবর নিয়ে জানলাম যে প্রত্যহই সে কিছু মাংস খেয়ে থাকে। তা-ই তার সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য। পেট পুরে খায়, আর ঐভাবে সর্বক্ষণ বসেই থাকে। সর্বদা তার ব্যারামেরই কৌশিশ হতে থাকে।

আমি তখন গম্ভীর হয়ে বললাম—"এ রোগ মালিশে সারবে না, এতে কয়েকটা ইন্‌জেকশন লাগবে। দেহের মধ্যে সুই ফুঁড়ে দাওয়াই দিতে হবে।"

সে তাতে খুবই রাজি।. আমি তখন বললাম—"আরো দুটি কাজ কিন্তু করা চাই। প্রথম কথা হলো, যতই কষ্ট হোক, রোজ খানিকটা ক'রে হাঁটতেই হবে, মানুষের সাহায্য নিয়েই হোক বা লাঠির সাহায্য নিয়েই হোক। বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে একটু ক'রে হাঁটতে হবে, ক্রমশ হাঁটার মাত্রা একটু একটু ক'রে বাড়াতে হবে। আর দ্বিতীয় কথা, মাংস খাওয়াটি একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে।"

"তার বদলে কি খেয়ে আমি বাঁচবো? আমরা তো মাছ খাই না।"

"দুধ খাবে, দহি খাবে, যতটা ইচ্ছা হয়।"

"দহি খাবো? তাতে যে বাতটা আরো জোর ক'রে চেপে ধরবে।"

"নেহি নেহি, আমার ইন্‌জেকশনের গুণে সব হজম হয়ে যাবে।"

"বহুৎ আচ্ছা, যেমন আপনার মেহেরবানি!"

বাতের ইন্‌জেকশন সেখানে আর কোথায় পাবো? আমার ব্যাগে ছিল কয়েকটা মিল্ক-ইন্‌জেকশন। রোগীর কোমরের নীচে তারই একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম, আর দুর্গাপ্রসাদকে ইসারাতে দেখিয়ে দিলাম কেমন ক'রে এই ইন্‌জেকশন দিতে হয়। তার পরে বললাম—"আজ আমি নিজে এটা দিয়ে গেলাম। কিন্তু এর পর থেকে আমি আর আসবো না, দুর্গাপ্রসাদ একদিন

অন্তর এসে এমনি ভাবে দিয়ে যাবে। আমার কথামতো ঠিক-ঠিক চললে এতেই ভালো হয়ে যাবে।”

আমি যখন উঠে আসছি তখন জমিদার আমার হাতদুটো ধরে টাকা দিতে এলো। আমি হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম—“টাকার জন্যে আমি আসিনি, টাকা নেওয়া আমার হুকুম নেই। তুমি আগে সেরে ওঠো, তার পর যা দিতে হয় রাজা-বাহাদুরকে পাঠিয়ে দিও।”

আশ্চর্যের কথা এই যে—বিশ্বাসের জোরেই হোক, বা ইন্‌জেকশনের গুণেই হোক, বা খাদ্যের পরিবর্তনেই হোক, ছয়টা ইন্‌জেকশনের পরে তার বাতের ব্যথা অনেক কমে গেল। সে সুস্থ হয়ে চলাফেরা করতে সক্ষম হলো। দুর্গা-প্রসাদ তাকে ইন্‌জেকশন দিয়ে আসতো, বোধ করি কিছু আদায়ও করতো। কিন্তু ইন্‌জেকশন শেষ হবার পরে সে রাজা-বাহাদুরের কাছে আমার জন্যে ভেট-স্বরূপ কিছু মেওয়া মিঠাই আর দুটি আকবরী আশরফি পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এর পর আরো এক রোগীর এমনি অদ্ভুত চিকিৎসা করলাম। তারাও আগে রাজা-বাহাদুরের অনুমতি নিয়ে আমার জন্যে পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেও এক ক্ষুদে জমিদারের বাড়ি, বেশ পয়সাওয়ালা লোক তারা। সেখানে জমিদারের পুত্রবধূর অসুখ, তাকে দেখতে হবে।

রোগিণী আপাদমস্তক এক চাদর মুড়ি দিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে। কেবল সোনার পঁইছা পরা বাঁ হাতটি বাইরে বের ক'রে রেখেছে। শুনলাম সে অসূর্যম্পশ্যা, স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকেই তার মুখ দেখাবার উপায় নেই। চাদরের ঢাকা খুলে তার মুখ-চোখও দেখা যাবে না, কোনো কিছু পরীক্ষাও করা যাবে না। কেবল ঐ নাড়ি ধরে আর উপর-উপর পরীক্ষা ক'রে রোগ চিনতে হবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা ঐ অবস্থাতেই করতে হবে।

কেবল নাড়ি ধরে কতটুকুই বা বোঝা যায়? শুনেছি কবিরাজেরা ওতেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন, কিন্তু আমরা অন্তত সে বিদ্যা শিখিনি। তবে এইটুকু বুঝলাম যে ওর নাড়ি কিছু দ্রুত এবং দুর্বল। আঙুলগুলো টিপে দেখলাম, খুব একটা এনিমিয়া আছে বলে মনে হলোনা। উপর থেকেই বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে এটুকু বুঝলাম যে হার্টে বা ফুসফুসে কোনো দোষ নেই। পেট টিপেও লিভার পিলে প্রভৃতি কিছু হাতে ঠেকল না।

অতঃপর শুনলাম রোগের বিবরণ। রোগিণী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। অল্প একটু ঘুষ ঘুষে জ্বর হয়। কিছু খেতে পারে না। সর্বাঙ্গে আড়ষ্ট ব্যথা,

দাঁতের গোড়াতেও ব্যথা। একটু একটু পা ফোলে। বয়স মাত্র কুড়ি-বাইশ, অথচ এর মধ্যে দুটি সন্তান হয়ে গেছে। আবার সে দুইমাসের গর্ভবতী। শেষের সন্তানটির বয়স দেড় বছর, এখনও সে মায়ের দুধ টেনে খায়।

এ কি অস্টিওম্যালেসিয়া? ক্যালসিয়মের অভাব? শুনেছি যে মেয়েটি অসূর্যম্পশ্যা, সম্ভবত রোদের মুখ ও কখনো দেখতে পায় না। সর্বক্ষণ ওকে কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোমটা টেনে থাকতে হয়, সূর্যের আলো ওর গায়ে লাগে না। তাতেই কথাটা আমার মনে হলো। তার পর আরো শুনলাম যে মেয়েটিকে দুধ খেতে দেওয়া হয় না, স্থানীয় বৈদ্‌রা মানা ক'রে দিয়েছে। তাতে নাকি রসবৃদ্ধি হবে, সর্দি ধরে যাবে।

আমি তখন বললাম—"ইন্‌জেকশন দেওয়া ছাড়া এ রোগ সারবে না। কিন্তু যেমন যেমন আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো তাই মেনে তোমাদের চলতে হবে। বৈদ্‌ কবিরাজের কোনো বিধান এখানে চলবেনা।"

তারা নিজেদের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ করলে। তার পর এসে বললে—"কোথায় ইন্‌জেকশন দেবেন বলুন, সেইটুকু জায়গা আমরা বের ক'রে দেবো। আর আপনি যেমন যেমন করতে বলবেন ঠিক-ঠিক তাই করবো।"

ব্যাগে আমার ছিল পুরো এক শিশি ক্যাল্‌সিয়ম-ওস্টেলিন। তখন সবে এই ইন্‌জেকশনটি বেরিয়েছে। তার থেকে খানিকটা সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে কোমরের নীচে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম। বলে দিলাম, এটা একদিন অন্তর দিতে হবে, দুর্গাপ্রসাদ এসে দিয়ে যাবে।

তার পর অন্যান্য ব্যবস্থার কথা। আমি বললাম—"প্রথম কথা ওকে প্রত্যহ সকালে দুই ঘণ্টা ক'রে ছাদের উপর রোদে বসিয়ে খালিগায়ে তেল মালিশ করতে হবে। গায়ের কাপড়-চোপড় সমস্ত খুলে ফেলতে হবে। সেখানে একজন পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ যেতে পাবে না। দ্বিতীয় কথা, ওকে প্রত্যহ এক সের দুধ খেতে দিতে হবে। তার মধ্যে প্রত্যেকবারেই খানিকটা ক'রে চুনের জল মিশিয়ে দেবে, তাহ'লে আর সর্দি ধরতে পারবে না। তৃতীয় কথা, শেষের সন্তানটিকে স্তনের দুধ খাওয়ানো একেবারে ছাড়িয়ে দিতে হবে, মায়ের কাছে তাকে যেন শুতেই দেওয়া না হয়। এগুলি নিশ্চয়ই করা চাই।"

সেখানেও আমি টাকাকড়ি কিছু নিলাম না। দুর্গাপ্রসাদ ইন্‌জেকশন দিয়ে আসতে লাগল। দশদিন পরেই শোনা গেল যে রোগিণী অনেকটা সুস্থ হয়েছে। তার ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর ছেড়ে গেছে, গায়ের ব্যথা কমে গেছে, পায়ের ফুলো শুকিয়ে গেছে। প্রত্যহ সে বাড়ির ছাদে গিয়ে রোদে বসছে।

এমনি আরো দু-একটি জটিল রোগী আমি ওখানে দেখেছিলাম। আমার চিকিৎসায় প্রত্যেকরই কিছু-না-কিছু উপকার হয়েছিল।

কিন্তু তা যে সবটা আমারই কৃতিত্বে কিংবা কেবল আমার ওষুধের গুণে এমন কথা নিশ্চয়ই নয়। বস্তুত নিজেই আমি এমন দ্রুত উপকার হতে দেখে মনে মনে ভাবতাম ভেল্কি হলো নাকি। হাতের কাছে যা মেলে এমন সামান্য ওষুধেই এখানে বেশ কাজ হচ্ছে, অথচ কলকাতায় তো এমন হতো না। কিন্তু তার পরে আরো ক্রমে এই অভিজ্ঞতা আমার জন্মালো যে, দামী দামী অনেকগুলো ভালো ওষুধ দিলেই যে তাড়াতাড়ি রোগ সারে এমন মনে করা ভুল। অথচ কলকাতায় আমরা প্রায়ই সেই ব্যাপার ক'রে থাকি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যাতে পিছিয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যেই হয়তো সেখানকার ডাক্তারদের তা করবার দরকার হয়। কিন্তু তা নইলে প্রকৃতপক্ষে দেখেছি তুচ্ছ ওষুধেও রোগ সারানো যায়। কিন্তু তার জন্যে ওষুধ ছাড়াও আরো কয়েকটি জিনিস বিশেষ করেই থাকা চাই। প্রথমত চাই রোগটিকে ঠিক চিনতে পারা। না চিনে বহুমূল্য ওষুধ দিলেও তাতে কিছু কাজ হবে না, কিন্তু চিনতে পেরে সামান্য ওষুধ দিলেও রোগ নিশ্চয় তাতে সাড়া দেবে—ঠিক যেন ছেলেবেলাকার চোর চোর খেলার মতো। লুকিয়ে-থাকা চোরকে যতক্ষণ খুঁজে না মিলছে ততক্ষণ সে লুকিয়েই থেকে যাবে, কিন্তু একবার ছুঁয়ে দিতে পারলেই সে 'মরে' গেল। অবশ্য এখানে অসাধ্য রোগের কথা নয়, সাধ্য রোগের কথাই বলছি। দামী দামী ওষুধ সংগ্রহ না হলেও ডাক্তারের পক্ষে তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। জগতে আজকাল ওষুধের অভাব নেই। বুঝে প্রয়োগ করতে পারলে তার সবগুলিই উপকারী। আর দ্বিতীয় কথা, রোগীর তরফে খানিকটা বিশ্বাসও থাকা চাই। এদের মনে যে সরল বিশ্বাসটি রয়েছে তাতেই অনেকখানি কাজ হয়।

এক মাস পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা-বাহাদুরকে জানালাম যে এবার আমি বিদায় নিতে চাই। এই কথা শুনতে পেয়ে তিনি সন্ধ্যাবেলা তাঁর সঙ্গে আমায় দেখা করতে বললেন। দেখা করতে গেলে এদিক ওদিক নানারকম কথার পরে বললেন—"আমি একটা কথা বলছিলাম। আপনি তো এখানে ভালোই কাজ করছেন দেখছি, চারিদিকে সবাই আপনার সুখ্যাতি করছে। আরো একটা মাস যেমন আছেন তেমনি থেকেই যান না। দুর্গাপ্রসাদকে বরং এর মধ্যে ভালো ক'রে একটু কাজ শিখিয়ে দিন। আরো এক মাস পরে যাবেন।"

আমাকে এখনই উনি ছাড়তে চাইছেন না। হিসাব ক'রে দেখলাম, আরো একটা মাস কোনোগতিকে এখানে থাকতে পারলে আমার হাতে নগদ হাজার টাকা পুঁজি হবে। প্রস্তাবটা খুবই লোভনীয়। কিন্তু আমার তখন বাড়ির দিকে টান হয়েছে। নিরামিষ আর ভাতে-ভাত খেয়ে আমার অরুচি এসে গেছে। তা ছাড়া এখানে কোনো আমোদপ্রমোদ নেই, কোনো বৈচিত্র্য নেই। মন খুলে দুটো কথা কইবার মানুষ নেই। বাইজীর সেই গানটা খালি খালি মনে পড়ে যাচ্ছে—"তড়প্ তড়প্ জিউ যায়।" আমার তখন বাস্তবিকই সেই রকম পালাই পালাই অবস্থা।

আমি বললাম—"আর আমার থাকার দরকার হবেনা। দুর্গাপ্রসাদকে সব কাজই শিখিয়ে দিয়েছি। ওকে কয়েকটা সিরিঞ্জ আর ইন্‌জেকশনের ওষুধপত্র আনিয়ে দেবেন, তাহ'লেই ও এখন বেশ চালিয়ে দিতে পারবে।"

পরের দিন আমি বিদায় নিলাম। আমার পাওনা টাকা ও যাতায়াতের খরচ ছাড়া রাজা-বাহাদুর আমাকে দুই প্রস্থ ধুতি-চাদর ও একটি সোনার আংটি উপহার দিলেন।

দুর্গাপ্রসাদের মা পুঁটুলি ক'রে খাবার বেঁধে দিলে, আর হাঁড়িব মধ্যে দিলে উৎকৃষ্ট এক সের গাওয়া ঘি। ঘি তার নিজের হাতের বানানো। ছলছল জলভরা চোখে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সে বললে—"ভাতের সঙ্গে তুমি এই ঘিউ নিজে খাবে, বেটা। এই গরিব বুড়ী মাকে তখন তুমি ইয়াদ করবে।" তার পর থেকে অনেকদিনই আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে সেই অকৃত্রিম স্নেহসজল পক্ককেশমণ্ডিত অমিয়স্নিগ্ধ এক অপরূপ মাতৃমূর্তি।

দুর্গাপ্রসাদ স্টেশন পর্যন্ত এসে আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে। তারও মুখটা দেখলাম কাঁচুমাচু হয়ে গেছে।

সেখান থেকে ট্রেনটা যখন ছাড়ল তখন যেন আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

॥ ছয় ॥

কলকাতায় ফিরে এসে দাদাবাবুর কাছ থেকে মূলধনের টাকা চেয়ে নিয়ে পাড়ার মধ্যে ছোটোখাটো এক ডাক্তারখানা খুললাম। দস্তুরমতো প্র্যাক্‌টিস শুরু ক'রে দিলাম। কিছু কিছু অর্থ উপার্জন তখন থেকেই করতে শুরু করলাম। অবশ্য উপার্জন যে প্রত্যহই হতো তা নয়, কিন্তু তবু ঘাঁটি পেতে বসে থাকবার

একটা জায়গা তো হলো। পাড়ার পাঁচজনে জানতে পারল যে আমি একজন নতুন ডাক্তার, অথচ বাইরের কেউ নই, পাড়ারই বাসিন্দা। সকাল-সন্ধ্যায় দু একজন ভদ্রলোক এমনিই আসা-যাওয়া করতে লাগলেন; খবরের কাগজ-খানা তুলে নিয়ে তাঁরা পড়তে থাকেন, সাময়িক পলিটিক্স নিয়ে কিংবা ইউরোপের যুদ্ধের খবর নিয়ে আলোচনা করতে লেগে যান। সে সময় প্রথম জার্মান যুদ্ধ খুব জোর চলছে।

সরকারী ডাক্তারেরা অনেকেই যুদ্ধের কাজে গিয়ে যোগ দিচ্ছিলেন। আবেদন মাত্রই তাই আমি স্থায়ী রকমের সরকারী চাকরি পেয়ে গেলাম। শিক্ষকতার কাজ। অ্যানাটমি শেখাতে হবে, ছাত্রদের ডিসেক্‌শন শেখাতে হবে। রীতিমতো মাষ্টারি করার কাজ।

ভালোই হলো। সকাল দশটা পর্যন্ত ডাক্তারখানায় বসে ডাক্তারি করতাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চাকরিতে যেতাম সাইকেলে চড়ে। বিকেলে যেতাম ডাক্তার রায়ের বাড়িতে, তাঁর রোগী দেখার কাজে সাহায্য করতে। সন্ধ্যায় ফিরে আবার ডাক্তারখানায় প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বসতাম।

কাজের মাত্রা আমার অনেক বেড়ে গেল। আলস্যে কাটাবার মতো একমুহূর্তও আর সময় রইল না। সারাদিন ধরে বিবিধ রকম কাজে ব্যস্ত তো থাকতেই হয়, আবার রাত্রে বাড়ি ফিরে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অ্যানাটমি পড়তে হয়। শিক্ষকতা করা সহজ কথা নয়। কাল গিয়ে ক্লাসে কি পড়াবো, তার জন্যে আজ থেকে প্রস্তুত হওয়াই চাই। নইলে সেখানে কিছুই বলতে পারবো না, ছাত্রদের কাছে অপদস্থ হতে হবে। অ্যানাটমি এমনই জিনিস যে প্রত্যহ পাঠ্য অংশটুকু ঝালিয়ে না নিলে বলতে গিয়ে বেধে যায়, দু-একটা কথা ভুল হয়েই যায়। কবে অ্যানাটমি পড়েছি, সে-সব তখন ভুলেই গিয়েছি। তা ছাড়া আমি দেখলাম যে ছাত্র হয়ে পড়া আলাদা, আর শিক্ষক হয়ে পড়ানো আলাদা। ছাত্রের বেলাতে ফাঁকি চলে কিন্তু মাষ্টারের বেলায় তা চলে না। আমি তাই দেখলাম, যা কিছু পড়ে জানছি তা যেন নতুন করে শিখছি। ছাত্রাবস্থায় এত কথা খুঁটিয়ে কখনই পড়ি নি, নিতান্ত ফাঁকি দিয়ে পাস করে গেছি। কিন্তু এখন আর তা চলবে না। পরীক্ষকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, কিন্তু ছাত্রদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না, আর তা উচিতও নয়। তাতে নিজেকেই খেলো হতে হয়। অতএব আগেকার চেয়েও গুরুতরভাবে আমাকে ছাত্র হতে হলো, পড়াবার জন্যে আমাকে অনেক বেশি পড়তে হলো।

প্র্যাকটিসের দিকে তখন আমার তত মন নেই, পড়ানোর দিকেই বেশি মন। অনেক শেখা হচ্ছে, শেখানো হচ্ছে, ছাত্রদের কাছে আমার পড়ানোর খ্যাতি রটে যাচ্ছে, অন্য ক্লাসের ছেলেরা আমার ক্লাসে এসে ভিড় করছে, আমি কোনো ডিসেক্‌শন বোঝাতে থাকলে চারিদিক থেকে ছাত্রদের দল ঝুঁকে আসছে। এর মধ্যে আলাদা একরকম গৌরব আছে, বিশেষ একরকম আত্মতৃপ্তি ও আত্মশ্লাঘা আছে। এর তুলনায় প্র্যাক্‌টিস হলো এক ধরণের উঞ্ছবৃত্তি। লোকের কাছ থেকে দুটো পয়সা আদায়ের জন্যে কত ফন্দিফিকির করতে থাকা, অনবরত তাদের তোয়াজ করতে থাকা। যারা তা করতে পারে তারা করুক, কিন্তু আমার তেমন অভাব বা খাবার ভাবনা নেই। বাড়িতে দাদাবাবু রয়েছেন, তার উপর একটা সরকারী চাকরিও পেয়ে গেছি। তার উপর ডাক্তার রায়ের কাছে থেকে প্রত্যহ নানারকম রোগী দেখা আর প্রেস্‌ক্রিপশন করার শিক্ষা আমার যথেষ্টই হচ্ছে। অন্যান্য ডাক্তারদের মতো লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানো নাই-বা আমার হলো। আমি তার থোড়াই 'কেয়ার' করি। এই তখন মনোভাব।

সুতরাং পাড়ায় প্র্যাক্‌টিস জমাবার দিকে আমি ততটা গা দিতাম না। ডাক্তারখানাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রোগীরা এলে তাদের অবশ্য দেখতাম, কিন্তু দশটা বাজার পরে কেউ ডাকতে এলে কিছুতে যেতাম না, তাহলে আমার চাকরির কাজে যেতে দেরি হয়ে যাবে। রাত্রি আটটার পরে কেউ ডাকতে এলেও যেতাম না, তাতে আমার পড়ার ব্যাঘাত হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেটুকু যা হয় তাতেই যথেষ্ট।

একদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে সাইকেলে চড়ে নিজের কাজে চলেছি। আমার যাবার রাস্তায় পড়ে হিন্দুস্থানী দারোয়ানদের কলোনির মতো এক খোলার বস্তি। জায়গাটা আমার ডাক্তারখানার কাছাকাছি। অনেক হিন্দুস্থানী সেখানে এক একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একত্রে বাস করে। তাদের মধ্যে প্রেসের দারোয়ান, কাগজের হকার, পোর্ট-কমিশনারের জমাদার, কুলী, অফিস অঞ্চলের বেয়ারা প্রভৃতি সব রকমই আছে। দু-চারজন স্ত্রীলোক এবং তাদের ছেলেপুলেরাও আছে, অর্থাৎ যারা দেশ থেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসেছে তাদের সংসার। এদের মধ্যে অনেককেই আমি চিনি, কারণ অসুখ-বিসুখ হলে কেউ কেউ এরা আমার ডাক্তারখানাতে আসে, ওষুধপত্র নিয়ে যায়।

আমি যখন ওদের বস্তির দিকে চেয়ে চেয়ে রাস্তা অতিক্রম করে যাচ্ছি,

তখন ওখান থেকে একজন লোক ছুটে এসে আমার সাইকেল চেপে ধরলে। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে—"নামুন ডাক্তারবাবু, আমাদের ভারি বিপদ।"

"কি হয়েছে?"

"একজন রোগী মারা যাচ্ছে, শিগ্‌গির আসুন।"

"আমার এখন সময় নেই, সরকারী কাজে যাচ্ছি।"

"তা হবে না, আপনাকে আসতেই হবে। নইলে সাইকেল ছাড়ব না।"

তার জোর-জবরদস্তি কোনোমতে এড়াতে না পেরে অগত্যা সেখানে যেতেই হলো।

গিয়ে দেখি এক কলেরা রোগী। তার প্রায় শেষ অবস্থা। নাড়ি মোটে পাওয়াই যায় না। হাত-পায়ের আঙুলগুলো চুপ্‌সে গেছে। চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে। অস্পষ্ট ভাঙা গলায় শেষ কাতরানি কাতরাচ্ছে।

আমি রেগে উঠে বললাম—"আগে খবর দাও নি কেন? এখন আর কি করব? তোমাদের এই তো হয় দোষ, মরবার সময় ডাকো ডাক্তারকে—"

সেখানে তখন অনেকগুলি লোক জড়ো হয়েছে। তারা বললে—"দুজন ডাক্তারকে আগে দেখিয়েছি, বাবু। তারা ওষুধপত্র দিচ্ছিল। শেষকালে জবাব দিয়ে গেল। বললে, আমাদের দ্বারা হবে না, হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু এ অবস্থায় কেমন করে হাসপাতালে নিয়ে যাই, মরতে হয় এখানেই মরুক। ওরা কিছু করতে পারলে না, আপনি যদি কিছু পারেন তো করুন।"

ঐ কথা শুনে আমার কেমন রোখ চেপে গেল। বাঁচাবার চেষ্টা এখনও অবশ্য করা যেতে পারে, মরছে মরুক বলে হাল ছেড়ে দেওয়া ডাক্তারের পক্ষে উচিত নয়। কলেরা-ওয়ার্ডে কাজ করে আমার এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে এমন মরণাপন্ন নাড়িছাড়া অবস্থাতেও রোগীরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিঁকে থাকে, এবং তখনও সেলাইন ইন্‌জেকশন শিরার মধ্যে দিতে পারলে কেউ কেউ সে অবস্থা থেকেও বেঁচে যায়। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

আমি ওদের বললাম—"চেষ্টা করে দেখতে পারি, কিন্তু বাঁচবে কিনা সে কথা বলতে পারব না। কিন্তু তার জন্যে অনেক তোড়জোড় করতে হবে।"

ওরা বললে—"যা করবার সবই করুন। আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম।"

চাকরিতে সেদিন আর যাওয়া হলো না। ওদের বললাম—"খুব বড় একটা হাঁড়িতে গরম জল চড়াও। আমি যন্ত্রপাতি সব নিয়ে আসছি। দুজন লোক আমার সঙ্গে এসো।"

ফিরলাম তখন ডাক্তারখানায়। বোতলে সীল করা রজার্সের সেলাইন

কয়েক বোতল আমার প্রস্তুতই থাকতো। আর কলেরাতে শিরা কেটে সেলাইন দেবার যন্ত্রপাতিও আমার ছিল। সমস্ত যোগাড় করে নিয়ে গিয়ে ওদের সেই হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম স্টেরিলাইজ করতে। সেলাইনের বোতলগুলিও একে একে সেই গরম জলে ডোবালাম গরম করে নিতে। এই সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগল।

তার পরে শুরু হলো আমার সেলাইন দেবার প্রক্রিয়া। সেখানে কোনো বসবার জায়গা নেই। রোগী এক নড়বড়ে খাটিয়ার উপর পড়ে আছে। আমি অন্য একটা খাটিয়া আনিয়ে তার পাশে বসলাম। আমাকে সাহায্য করবার মতো কেউ নেই, একাই সব-কিছু করতে হবে। এদিকে শিরার মধ্যে ছুঁচ ঢোকাবো কি, কোথাও কোনো শিরাই খুঁজে পাওয়া যায় না। সমস্ত শিরা চুপ্‌সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোথায় যে শিরা মিলবে তা হাত চেপে ধরা সত্ত্বেও উপর থেকে দেখতে পাচ্ছি না। চামড়ার ওপর আন্দাজে ছুরি চালিয়ে কেটে তার নীচে শিরা খুঁজে বের করতে হবে, তাছাড়া উপায় নেই।

আন্দাজ করে কনুই-এর সামনের দিকে এক জায়গায় চিরে ফেললাম। সেখানে শিরা নেই। উপরে নীচে আরো কিছু বেশি করে কেটে চামড়াটা অনেকখানি ফাঁক করে ফেললাম, এবং তার মধ্যে শিরার সন্ধান করতে লাগলাম। অতখানি কাটা জায়গার মধ্যে একটা কোনো শিরা নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বে। দেখি চেষ্টা করে।

খুঁজতে খুঁজতে খুব সরু একটি শিরা বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তার মধ্যে মোটা ছুঁচ ঢোকানো যাবে না, শিরাটিকে কেটে ফাঁক করলে তবে ঢুকতে পারে। কিন্তু সে শিরা এমনই সরু যে, কাঁচি দিয়ে কাটতে গেলে হয়তো সব শিরাটাই কেটে দুখানা হয়ে যাবে। অতি সন্তর্পণে কাঁচি চালালাম, তবু কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই হলো, সবটা শিরাই কেটে গেল। আমি তখন তার কাটা প্রান্তটিকে ফর্‌সেপ্‌স দিয়ে জোরে চেপে ধরলাম; ওদেরই একজনকে বললাম পিছন থেকে সেটা টেনে ধরে থাকতে। তার পরে ওই শিরারই উপরের দিকটা ডিসেক্ট করে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার চেষ্টা করলাম সেটিকে যাতে অর্ধ-ছেদন করতে পারি। রোগী তো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে, এত কাটাকুটি সত্ত্বেও তার দেহে কোনো সাড় নেই। কিন্তু আমার হাত তখন থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে, কাঁচি চালাতে গিয়ে আবার যদি সবটা কেটে ফেলি! নিঃশ্বাস রোধ করে হাতকে খুব সংযত করে ঈষৎমাত্র কেটে দেখলাম। দেখি যে ঈষৎমাত্রই কেটেছে বটে, কিন্তু ওতেই আমার কাজ চলে যাবে। মোটা ছুঁচটা

ওর ভিতর দিয়ে কোনোগতিকে ঢুকিয়ে দিতে পারব, আর বেশি কেটে কাজ নেই। কিন্তু প্রবেশের মুখ খুবই সঙ্কীর্ণ, তার ভিতরে সেলাইনের ছুঁচ প্রবেশ করাতে আমি বারে বারে ব্যর্থ হতে লাগলাম। বারকতক চেষ্টা করতে করতে একবার মনে হলো ঢুকেছে। শিরার মধ্যে ছুঁচটি ঠিক ঢুকে গেলে হাতে তা টের পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিরার উপর আঙুল রাখলে তার ভিতর দিয়ে ঝির্‌ঝির্ করে সেলাইনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাও অনুভব করা যায়। যখন তা স্পষ্ট অনুভব হলো তখন আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এইসব ব্যর্থ চেষ্টায় আমি আরো আধ ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছি। ভালো হাত-সাফাই থাকলে এ কাজ তিন মিনিটেই হয়ে যেতে পারতো। তা হোক, আমি যে শেষ পর্যন্ত সক্ষম হতে পেরেছি এই যথেষ্ট। কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া করতে করতে আমি গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছিলাম। কপাল দিয়ে টপ্‌টপ্ করে ঘাম ঝরছিল। সেটাও কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। শার্টের হাতা দিয়ে ঘামটা মুছে ফেলে ওদের একজনকে বললাম—"আমাকে একটু বাতাস করতে পারো?"

সেলাইনের নলটি ধরে আরো আধ ঘণ্টা আমাকে চুপচাপ এইভাবে বসে থাকতে হলো। ক্রমে ক্রমে দেখলাম রোগী যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সে সুস্থভাবে চোখ মেলে দু-একবার চেয়ে দেখলে, তার নাড়ি ফিরে এলো, কব্‌জির কাছে তার নাড়ির স্পন্দন স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যেতে থাকল। কিন্তু তা হলো চার বোতল সেলাইন তার শিরার মধ্যে প্রবেশ করবার পরে।

চার বোতল শেষ হয়ে গেলে আমার মনে হলো আর বেশি দেওয়া উচিত নয়। আমি শিরার ভিতর থেকে ছুঁচ টেনে বের করে নিলাম, তারপর ক্ষতস্থান বন্ধ করে চামড়া সেলাই করে দিলাম। সেই সময়ে রোগী একটু-আধটু কাতরোক্তি করতে লাগল। তাতে বুঝলাম যে এবার তার দেহের সাড় ফিরে এসেছে। তারপর দেখলাম সে নিজেই হাঁ করে একটু জল খেতে চাইছে। সে নিজেই সহজভাবে পাশ ফিরে শুলো।

কলেরাতে সেলাইন এমনি আশ্চর্যভাবে রোগীকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনে। হাসপাতালেও তাই দেখেছি, এখন নিজের চিকিৎসার বেলাতেও প্রত্যক্ষ তাই দেখলাম। আমি তো খুশি হয়ে উঠলামই, কিন্তু রোগীর আত্মীয়েরা তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল—"ভাগ্যিস এই ডাক্তারবাবুকে জোর করে ধরে এনেছিলাম, তাই ও বেঁচে গেল এ যাত্রা।"

সন্ধ্যার সময় রোগীকে দেখতে গেলাম। তখন সে ভালোই আছে, যদিও

তখনও তার দাস্ত বন্ধ হয় নি। জলের পিপাসা খুব জোর। তাকে ডাবের জল দিতে বললাম।

কিন্তু রাত্রে বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সারবার পরে আমার মনে হলো, এখন আর একবার তাকে দেখে আসা উচিত। এখনও তার রোগটি সারে নি, কি হয় তা বলা যায় না। কাছেই তো, একবার ঘুরে আসা যাক।

গিয়ে দেখি যা ভয় করেছিলাম তাই, আবার নাড়ি দমে গেছে। যদিও আগের মতো অবস্থা মোটেই নয়, রোগী এদিকে বেশ সুস্থ আছে, কথাবার্তা বলছে, কিন্তু এখনই আবার সেলাইন দেওয়া দরকার, নইলে এর পরে সামলানো যাবে না। আমি ওদের বললাম—"গ্যাসের আলো যোগাড় করে আনো, আবার ইন্‌জেকশন লাগবে।"

আবার সেই রাত্রিকালে সেই সব যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে আনা, আবার সেই সব হাঙ্গামা করা। এবার কম্পাউণ্ডারকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। এবার তাই কষ্টও পেতে হলো না, অল্পেই শিরা পাওয়া গেল, অল্পেই কাজটি সমাধা হলো। এবার সেলাইনের সঙ্গে কিছু গ্লুকোজ মিশিয়ে দিলাম। সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, রাত তিনটে বেজে গেছে।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি রোগী খুবই সুস্থ। আর কোনো আশঙ্কা নেই। তার দুদিন পরে সে অন্নপথ্য করলে।

সেদিন যখন দেখতে গেছি তখন দারোয়ানেরা একজোট হয়ে আমাকে ধরলে—"একটা মরা মানুষের জান বাঁচিয়ে দিলেন, আপনাকে কি দিতে হবে তা বলুন।"

আমি একটু হেসে বললাম—"দিতে হবে হিসাব মতো অনেক টাকাই—"

"আমরা যে গরীব, আপনাকে পুরোপুরি খুশি করবার মতো—"

"তবে আর জিজ্ঞাসা করে লাভ কি আছে, যা দিতে পারো তাই দিও।"

"কিন্তু আপনাকে একবার যেতে হবে আমাদের প্রেসে। আসুন, আমাদের কর্তাবাবু আপনাকে ডাকছেন। তিনি নিজেই আসতেন, কিন্তু বুড়ো মানুষ আসতে পারেন না, তাই বলে পাঠালেন। বেশি দূর নয়, কাছেই আমাদের প্রেস। আপনার টাকা তিনি নিজের হাতে দেবেন।"

গেলাম তাদের সঙ্গে। কলকাতার এক বিখ্যাত খবরের কাগজের মস্ত বড় প্রেস। যাঁকে ওরা কর্তাবাবু বলছে তিনি বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। আমার খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।—"তুমিই সেই

ডাক্তার, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছ?"—বলতে বলতে তিনি দু-হাত দিয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে বুকে জাপ্‌টে ধরলেন।

আমি তো হতভম্ব। হঠাৎ এমন স্নেহের আলিঙ্গনের অভ্যর্থনা পাবো, এ আমি কল্পনাই করি নি। আমি অপ্রস্তুত হয়ে কোনো কথাই বলতে পারলাম না।

তিনি তখন বললেন—"ঐ দারোয়ানটি আমাদের খুব কাজের লোক। ও তো মারাই গিয়েছিল। মারা গেছে বলে ওর দেশে ওর ছেলেকে আমরা টেলিগ্রাম করে দিলাম। তার পরে শুনলাম, কে একজন ডাক্তার এসে শিরা কেটে ইন্‌জেকশন দিচ্ছে। আমরা বললাম, মরা মানুষের ওপর ছুরি চালাচ্ছে, মিছিমিছি কিছু পয়সা আদায়ের মতলবে। তার পরে শুনলাম রোগী বেঁচে গেছে। অথচ যে ডাক্তার আগে ওকে দেখেছিল সে নিজে এসে আমাকে বলে গেল, ও কিছুতেই বাঁচবে না, সাক্ষাৎ এশিয়াটিক কলেরা। তাই তো আমরা টেলিগ্রাম করেছিলাম। তোমাকে আর কি বলে ধন্যবাদ দেবো! কিন্তু তুমি আজ থেকে আমাদের বাড়ির সকলের ডাক্তার হলে। এবার থেকে দরকার হলে তোমাকেই ডাকবো।"

আমার মাথায় হাত দিয়ে তিনি আমার হাতে কুড়ি টাকার দুখানি নোট গুঁজে দিলেন। বললেন—"তোমাকে এ কিছুই দেওয়া হলো না, কিন্তু ওরা সত্যই খুব গরীব। এখন যা দিচ্ছি তাই খুশি হয়ে নাও, এতে তুমি ঠকবে না।"

এখন আর তাঁর পরিচয় দিতে বাধা নেই। তিনি হলেন তখনকার দিনের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এডিটর স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ।

একবার আমার মনে হলো, এত কম টাকা! তার পরেই কিন্তু বুঝলাম, টাকার অঙ্কটা এখানে কিছুই নয়। এত যে উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি শুনছি, তাও এখানে বড়ো নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি পুরস্কার আমার মিলে গেছে, সে হলো আমার নিজের মধ্যে গভীর আত্মতৃপ্তির সঙ্গে একটা সুদৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়। টাকার চেয়ে এরই দাম অনেক বেশি। অমন মরণাপন্ন কলেরা-রোগীটিকে সারাতে পেরে সেদিক দিয়ে আমি এক লাফে অনেকখানি এগিয়ে গেছি। আমি বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে একটা শক্তি এসেছে, ইচ্ছা করলে এবং চেষ্টা করলে আমি এমনি কঠিন রোগকেও আরোগ্য করতে পারি। সেই বিশ্বাসটি আমার মনের মধ্যে সত্য হয়ে উঠেছে। বিদ্যার চেয়ে তার সার্থক প্রয়োগ অনেক বেশি বড়ো জিনিস, কারণ বিদ্যা জানলেও

তার প্রয়োগ সকলের হাতে সার্থক হয় না। আমি কেবল পাস-করা ডাক্তার নই, এখন থেকে বলতে পারি আমি সত্যিকার রোগজয়ী ডাক্তার।

আমার মনের মধ্যে সেদিন যা এসেছিল তার নাম ডাক্তারি চেতনা। ডাক্তারি শিখলেই ডাক্তার হওয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই চেতনাটি না আসে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে চেতনা না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যা জানলেও নিজের উপর আস্থা থাকে না, জোর করে কিছু বলা যায় না। এমন ডাক্তার দেখেছি যাদের দশ-পনেরো বছর প্র্যাক্‌টিসের পরেও নিজের উপর কোনো আস্থা আসে নি। আবার এমন লোককেও দেখেছি যারা পাস করবার দুই-এক বছরের মধ্যেই নিজের উপর আস্থাবান হয়েছে, নিরুদ্বেগে তারা প্র্যাক্‌টিস করছে আত্মশক্তি নিয়ে।

সেদিন থেকে মনেপ্রাণে আমি ডাক্তার হলাম। যাকে বলে থরোব্রেড্ মেডিকেল-প্র্যাক্‌টিশনর।

॥ সাত ॥

শিক্ষক হয়েও আমি ছাত্রদের সঙ্গে একটু বেশীরকম অন্তরঙ্গ ভাবেই মিশতাম। তাই তারা অন্য শিক্ষকদের মতো কেবল দূর থেকে আমাকে সমীহ করতো না, বরং আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো। অবসর সময়ে তাদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াও চলতো।

তারা তাদের সুবিধা-অসুবিধা ও সুখ-দুঃখের সব কথাই আমাকে বলতো। কোনোরকম কথাই বলতে মুখে বাধতো না। এটা আমার সহযোগী অন্যান্য শিক্ষকেরা খুব প্রসন্ন চোখে দেখতেন না। তাঁরা আমাকে আড়ালে ডেকে স্পষ্টই বলতেন—"ওহে, ছেলেদের সঙ্গে অমন করে মিশো না। জানো না তো কি মুশকিলে পড়বে, এর পর ওরা কাঁধে চড়ে বসবে, এত রকম অন্যায় আব্দার করতে থাকবে যে শেষ পর্যন্ত তাল সামলাতে পারবে না।"

আমি সে কথার কোনো জবাবই দিতাম না। মনে মনে ভাবতাম, করলেই বা কিছু উপদ্রব কিংবা আব্দার, তাতেই বা ক্ষতি কি। ওদের সঙ্গে আমার খুব বেশী তফাৎ আছে কি! কিছুদিন আগে আমিও ওদেরই দলে ছিলাম। বলতে গেলে এখনও তাই আছি, ছাত্র হয়ে আমাকেও প্রত্যহ পড়া মুখস্থ করতে হয়, তবেই ওদের পড়াতে পারি। কিছুদিন পরে ওরাও আমারই

মতো হবে। তফাৎ কেবল কয়েকটা বছরের। তার জন্তে আমাকে সর্বদা রাশভারি ভঙ্গি নিয়ে থাকতে হবে? সেটা আমার পছন্দ হতো না।

তবে ছাত্রদের বহুরকম আব্দারই আমাকে শুনতে হতো। কারো কারো বাড়িতে পর্যন্ত যেতে হতো, নইলে তারা কিছুতে ছাড়তো না। অনেকে সন্ধ্যার পরে আমার ডাক্তারখানাতে বই নিয়ে আসতো, পড়ার যে-সকল কথা ভালো করে বুঝতে পারে নি সেগুলো বুঝিয়ে দিতে হতো। তেমনি অপর পক্ষে তারাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতো। নিজেদের চেনাশোনার মধ্যে তারা মাঝে মাঝে রোগী জুটিয়ে দিতো। তা ছাড়া আমার নানারকম ফাই-ফরমাশ খেটেও দিতো, যখনই কিছু করতে বলতাম আগ্রহের সঙ্গে তা করে দিতো। ছাত্র-শিক্ষকের এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধটি আজকাল খুব বিরল।

সেই সব ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ করেই আমার ভক্ত ছিল। সত্যরঞ্জন তাদের মধ্যে একজন। ছেলেটি যেমন সপ্রতিভ ও সক্রিয় তেমনি অসম-সাহসিক। পড়াশোনার দিক দিয়ে একটু কম ধারালো হলেও কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বেলাতে সে সকল বিষয়েই অগ্রণী, কোনো কিছুতেই পিছপাও হয় না। যেখানে কোনো বিপদ-আপদের সম্ভাবনা সেখানে সে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে যাবে। তা ছাড়া সে পরোপকারী, নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করেও পরের উপকার করবে, তাতেই যেন তার সুখ। তবে তার চরিত্র সম্বন্ধে অন্য একটা কিছু বদনাম ছিল, কিন্তু সেকথা আমি জানতেও চাইতাম না, আমার তাতে কোনো কৌতূহলও ছিল না। গোপনে কে কী করছে তাই নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কি দরকার!

একদিন সত্যরঞ্জন আমাকে বললে—"স্যার, একটা অসহায় রোগীকে যদি একবার দেখেন—ডবল নিউমোনিয়া, বোধ হয় বাঁচবে না—তবে আপনি চেষ্টা করলে হয়তো—"

আমি বললাম—"তোমার কেউ হয় নাকি?"

সে বললে—"না স্যার, আমার আবার কে হবে! এমনি হঠাৎ চেনাশোনা—তবে খুব খারাপ পাড়াতে থাকে কিন্তু—যদিও আগে সে ভদ্রঘরের মেয়েই ছিল—"

আমি বললাম—"থাক থাক অত পরিচয়ের কি দরকার, কোথায় যেতে হবে তাই বলো।"

"না স্যার, তবু আপনাকে বলছি—ভদ্র ব্রাহ্মণের ঘরের ভালো মেয়ে;

বদ লোকের খপ্পরে পড়ে ঐ জায়গাতে এসে পড়েছে,—যদিও আপনাকে অমন জায়গাতে নিয়ে যাওয়া আমার উচিত নয়—"

"ডাক্তারি যখন করছি তখন ভালো জায়গাতেও আমাকে যেতে হবে আর মন্দ জায়গাতেও যেতে হবে। ঠিকানাটা বলে দাও, দেখে আসবো।"

"না স্যার, সে আপনি চিনে যেতে পারবেন না, আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো।"

গেলাম তার সঙ্গে। জায়গাটা এক কুখ্যাত পাড়ায়, গলিঘুঁজির মধ্যে। নীচেকার একটা ঘরে মাটিতে পাতা বিছানায় রোগিনী একা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মাথার কাছে জলের কুঁজো-গেলাস। ঘরে বিশেষ কিছু আসবাবপত্র নেই।

সত্যরঞ্জন তার মুখের দিকে ঝুঁকে গা-ঠেলাঠেলি করে ডাকতে লাগল—"মালা, এই মালা, চোখ চেয়ে দেখো, মাষ্টারমশাই তোমাকে দেখতে এসেছেন, যাঁর কথা তোমাকে বলেছিলাম।"

মেয়েটি মুখের ঢাকা খুলে চোখ তুলে চাইলে। চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল। নাড়িতে হাত দিয়ে দেখলাম, খুব জ্বর। বুক পিঠ পরীক্ষা করে দেখলাম ডবল-নিউমোনিয়া নয়, তবে একদিকের বুকে একটু প্যাচ্ হয়েছে।

মেয়েটির বয়স হবে কুড়ি-বাইশ। গায়ের রঙ ফরসা। মুখে চোখে প্রখরতা আছে, নির্বুদ্ধির মতো জড়তা নেই। ওষ্ঠকুঞ্চনের একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, যেন প্রত্যেক কথায় ব্যাপারটা সে বুঝে নিচ্ছে এমনি একটা চাপা রকমের ভঙ্গী। ভদ্রঘরেরই মেয়ে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। বহুভোগ্যাদের মুখে যে একটা অত্যাচারের কালো ছাপ পড়ে, তেমন কিছু তার মুখের কোনোখানেই নেই। হঠাৎ দেখলে তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা আসে না, বরং সহানুভূতি আসে।

নিউমোনিয়া অতি মারাত্মক রোগ। এখনকার দিনে পেনিসিলিন প্রভৃতি নানা ওষুধ থাকায় এ-রোগকে যেমন আমরা আর মোটে গ্রাহ্যই করি না, তখনকার দিনে তেমন ছিল না। তখনকার দিনে এ-রোগের ক্রাইসিস ছিল, নাড়ি দমে গিয়ে হঠাৎ হার্ট-ফেল হবার ভয় ছিল। আমি দেখলাম রোগিনীর ভিতরে বুদ্ধি থাকলেও আপাতত সব কথা সে ঠিক-ঠিক বলতে পারছে না, দু একটা এলোমেলো ভুল কথা বলছে।

সত্যরঞ্জনকে বললাম—"তুমি যেমন বলেছিলে সে রকম কিছু না হলেও, রীতিমতো যত্ন নেওয়া দরকার, নইলে রোগটা পরে বিগ্ড়ে যেতে পারে।"

রোগিনী নিজেই তাই শুনে বলে উঠল—"কে আর যত্ন নেবে বলুন?"

আমি একটু ধমক দিয়ে বললাম—"সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমরা যা হয় করছি।" সত্যরঞ্জনকে বললাম—"দুবেলা দুটো করে ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার, বুকে প্রলেপ লাগানো দরকার, ঘড়ি ধরে ষ্টিমুল্যাণ্ট ওষুধ খাওয়ানো দরকার, পথ্য দেওয়া দরকার—এসব ব্যবস্থা এখানে হতে পারবে কি? কেউই তো ওর নেই দেখছি।"

সত্যরঞ্জন বললে—"পাশের ঘরে ওর এক বন্ধু আছে, তাকে দিয়ে সবই করিয়ে নিতে পারব। আর ষ্টিমুল্যাণ্ট একটা আমি দিচ্ছি, স্তার, আমাদের বাড়িতে খুব ভালো এক বোতল ব্রাণ্ডি ছিল, তাই ওকে রোজ রাত্রে এক আউন্স করে খাইয়ে দিই, সারারাত পড়ে পড়ে ঘুমোয়।"

আমি বললাম—"অতটা নয়, আধ আউন্সের বেশী দিও না। কিন্তু তবুও রোজ ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার। সে-সব ওষুধপত্রের ব্যবস্থা যা করবার তা আমি করছি, কিন্তু ওর ভাল পথ্য চাই, সে ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। দুধ, হর্লিক্স, লেবুর রস এইসব খেতে দিতে হবে।"

ওষুধ ইন্‌জেকশন প্রভৃতি সব-কিছু আমারই ডাক্তারখানা থেকে দিতে লাগলাম। নিজে প্রত্যহ দুবার করে যেতাম ইন্‌জেকশন দিতে। হর্লিক্স প্রভৃতি কেনবার জন্যে কয়েকটা টাকাও দিয়ে দিলাম সত্যরঞ্জনের হাতে, সে বেচারাই বা কোথায় পাবে। সত্যরঞ্জন তো আমাকে লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত, কিন্তু যখন ভার নিয়েছি তখন যা করা দরকার তা সবই আমায় করতে হবে।

মেয়েটির প্রতি আমার কেমন একটা মমতাও এসে গেল। আমি দেখলাম সে নিতান্তই অসহায়। সুস্থ অবস্থাতে যাই থাক, কিন্তু এই রোগের অবস্থাতে তাকে দেখবার-শোনবার কেউ নেই। একটি অন্য মেয়ে এসে তার কিছু সেবা-টেবা করে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমি গেলেই বাড়ির বাড়িওয়ালী পান চিবোতে চিবোতে দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়ায়, আমার কার্যকলাপ দেখে, কিছু পরে একটু বাঁকা হাসি হেসে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে আমার খুবই খারাপ লাগে, কিন্তু আমি তার দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে একেবারে বজ্রগম্ভীর হয়ে থাকি।

ধীরে ধীরে প্রায় এগারো দিনে মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সে আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে শুরু করল। খুব নম্র, খুব অমায়িক, তার কথাগুলি সত্যিকার কৃতজ্ঞতায় ভরা। প্রায়ই সে বলে—"আপনি এসে না পড়লে আমার কি হতো বলুন দেখি? এরা আমাকে রাস্তায় টেনে ফেলে দিত। আপনি দুবেলা আসছেন, এত কষ্ট করছেন, দেখছেই তো

পাচ্ছি, নিজের পকেট থেকে অনেক পয়সা খরচও হয়ে যাচ্ছে। আমার বাপ-মাও আমার জন্যে এতটা করতো না। কিন্তু এই ঋণ আমি কেমন করে শোধ দেবো, ডাক্তারবাবু ?"

ঐ ধরণের কথা শুনলেই আমি কোনো জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াতাম।

সে ব্যস্ত হয়ে বলতো—"না না, বসুন একটু, এসব কথা বলে আর আপনাকে বিব্রত করবো না। দয়া করেছেন, তাই যথেষ্ট। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি একটু উঠে বসতে পারি ?"

তখন অন্য কথা এসে পড়ত। আমি মনে-মনে ভাবতাম, সুস্থ অবস্থাতে ওর কেমন করে চলতো ? এও কি অন্যদের মতো দেহের ব্যবসা করতো ? কিন্তু আমিও এ বিষয়ে ওকে কোনদিন স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি, সেও কিছু বলে নি।

ও যখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠল তখন বললাম—"কাল থেকে আর আমার আসার দরকার হবে না। এবার তুমি সেরে উঠেছ।"

সে যেন এ কথা শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—"তা ঠিক, এখানে আর আপনাকে আসতে বলার কোনো মানে হয় না। তবু মাঝে মাঝে এক-আধবার দেখে যাবেন তো, আপনার হাতের রোগীটা বেঁচে রইল কিনা ?"

আমি বললাম—"দরকার হলে নিশ্চয় আসবো।"

কিন্তু প্রায় মাসখানেক আর মোটে সেদিকে যাই নি। সত্যরঞ্জন বারকয়েক আমাকে বলেছিল যে সেই মালা মেয়েটি আমাকে একবার ডেকেছে, একদিন যেন যাই। কিন্তু তখন পরীক্ষার হুজুগ চলেছে। আমি তাকে বলেছিলাম—"দেখছো তো, পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। এখন যাবার সময় হবে না, পরে একদিন যাবো।" এই বলেই তখন কাটিয়ে দিলাম।

কিন্তু সত্যরঞ্জন একদিন খুব জোর করতে লাগলো। বললে যে তার তলপেটে কি একটা টাটানি ব্যথা হয়েছে বলছে—সেটা দেখা দরকার। একবার চলুন।

আমি বললাম, "আচ্ছা, এরই মধ্যে যেদিন সময় হবে সেদিন নিশ্চয় যাবো।"

তার দু তিনদিনের মধ্যে, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরবার মুখে সেখানে গিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি, মেয়েটি একাই রয়েছে।

আমি তার ঘরে ঢুকেই বললাম—"কৈ, তলপেটে কোথায় তোমার ব্যথা দেখি !"

সে চম্‌কে উঠে বললে—"দেখাচ্ছি, কিন্তু একটু বসবেন না ?"

আমি বললাম—"না, আমার এখন তাড়া আছে।" তার মানে বাড়ি ফিরে তখন কিছু খাবার সময়, ক্ষিদে পেয়েছে। সে কথা কিন্তু বললাম না।

সে পরীক্ষার জন্যে তখনই বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পেটের ওপরে ওপরেই যথারীতি টিপে-টুপে পরীক্ষা করে দেখে বললাম—"কৈ, কিছুই তো হয় নি। কোথায় ব্যথা ?"

"ব্যথা ভেতর দিকে, ওপর থেকে কেমন করে বুঝবেন ?"

"আমরা ভেতরের খবর ওপর থেকেই বুঝতে পারি। বিশেষ কিছুই হয় নি।"

"না ডাক্তারবাবু, ভেতরটা একবার পরীক্ষা করলে ভালো হতো। পাশের ঘরের মেয়েটিও তাই বলছিল যে ডাক্তারবাবুকে একবার দেখিয়ে নে-না।"

"আমার যা দেখবার ঠিকই দেখেছি। তোমার তলপেটের মধ্যে কোনো রোগ নেই, তবে যদি অন্য কোথাও কিছু হয়ে থাকে তো বলো।"

সে হঠাৎ উঠে বসে বললে—"আপনি আমাকে ঘৃণা করেন, না ডাক্তার-বাবু ? তা খুবই সম্ভব। আমি নিজেই নিজেকে খুব ঘৃণা করি।"

"এটা তুমি ভুল বললে। তুমি তো মেয়েমানুষ, বুদ্ধি কম, না বুঝে হয়তো ভুল কাজ কিছু করে ফেলেছ। এটুকু বেশ বুঝতে পারছি, তার বেশী কিছুই জানি না। কিন্তু তার জন্যে ঘৃণা করব কেন ? বরং একটু মমতা আর স্নেহই করি। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, আমাকে ডাক্তারবাবু না বলে অনায়াসে কাকাবাবু বলতে পারো। তাহলে আর এই সব ঘৃণা-লজ্জার প্রশ্নই থাকবে না।"

আমার কথাগুলি শুনে মালা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

যাঁরা এই কাহিনী পড়ছেন তাঁরা হয়তো মনে করছেন, লেখক বুঝি দেখাতে চাইছেন যে তিনি একজন জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ। কিন্তু তা ঠিক নয়। একে তো শিক্ষক পরিচয়ে সেখানে গেছি, মনের তন্ত্রীগুলো তারই চড়া সুরে বাঁধা রয়েছে। তার উপর ডাক্তারেরা রোগের ছোঁয়াচকে অত্যন্ত ভয় করে। তাদের মনে হয় যে, রোগীর দেহের সর্বাঙ্গে তো বটেই, এমন কি তার বিছানাপত্রেও রোগের বিষাক্ত জীবাণুরা ওৎ পেতে আছে। যাকে বলে ওস্তাদের ভূতের ভয়। অপরকে ভূতে ধরলে ওস্তাদ তাকে তাড়াতে পারবে, কিন্তু তার নিজেকে ধরলে তখন কি উপায় হবে ? এই ভয়ে আমরা রোগীর ঘরে কোনো কিছু ছুঁলেই বারে বারে হাত ধুতে থাকি। রোগীর বাড়িতে

কিছু খাবার জিনিস খেতেই পারি না, এমন কি নিজের বাড়িতে গিয়েও আগে কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-পা না-ধুয়ে কোনো কিছু খাই না। নতুন ডাক্তারের মনস্তত্ত্বটা অনেক স্থলেই এইরকম। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে তারা সব সময়েই সতর্ক থাকে।

মালা বললে—"আপনি যখন কাকাবাবু হলেন তখন আমার সব খবরটা আপনাকে শুনতে হবে, আমার একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এতদিন ভয়ে ভয়ে বলতে পারি নি, এখন আপনি নিজেই সে-ভয় ভেঙে দিলেন।"

"বেশ তো, বলেই ফেলো যা তোমার বলবার কথা।"

"আমার নাম মালা নয়। এটা এখানকার ঝুটো নাম। আমি পাটনা থেকে এখানে পালিয়ে এসেছি। আমার বাবা সেখানকার একজন অফিসার। এই বাংলাদেশেই একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরে তিনি আমার বিয়ে দেন, তারা খুব ভালো কুলীন বলে। কিন্তু একবছর যেতে না যেতেই আমার স্বামী কলেরা হয়ে মারা যান। তখন বাবা আমাকে তাঁর নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সেখানেই আমায় লেখাপড়া শেখাতে থাকেন। আমাদের বাড়িতে একজন আত্মীয়ের ছেলে থাকতো, সে ওখানে থেকে কলেজে পড়তো। বাবা তার হাতেই আমাকে পড়াবার ভার দেন। তার ফলে শেষ পর্যন্ত যা হলো তা বুঝতেই পারছেন।"

"সে-ই বুঝি তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে টেনে আনলে?"

"তা ঠিক নয়, মিথ্যে কথা বলব কেন, বরং আমিই তাকে ভুলিয়ে এনেছি। সে বলতো, আমার জন্যে সব-কিছু সে করতে রাজী, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে। আমি বললাম, তা যদি হয় তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করো। সে বললে তা হয় না, সম্পর্কে ভাই-বোনে কখনো বিয়ে হতে পারে না। আমি বললাম, বিয়ে নাই-বা হলো, আমায় কলকাতায় নিয়ে চলো, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবো চিরকাল। তুমি কলেজে কিছু পাস করেছ, যা উপার্জন করবে তাতেই আমাদের চলে যাবে। তা ছাড়া আমার নিজের কিছু গয়নাও রয়েছে। এই শুনে সে তখনই রাজী হয়ে গেল, আমরা দুজনে এখানে পালিয়ে চলে এলাম। এখানকার বাড়িওয়ালীর সঙ্গে তার আগে কিছু চেনাশোনা ছিল।"

"সে লোকটি তাহলে কোথায়? তাকে কোনোদিন দেখি নি তো।"

"সে কি এখনও আছে ভাবছেন! আমাকে ছেড়ে কবে সে সরে পড়েছে। মাস-দুয়েক মাত্র ছিল। প্রথমটায় আমাকে যেন মাথায় করে রাখতো,

নিজেই সব-কিছু কাজ করতো। কিন্তু কোনো রোজগার তো নেই, খরচ চলবে কিসে? প্রথমে আমার হাতের একগাছা বালা খুলে দিলাম। তাতেই চলল দুমাস। কিন্তু ক্রমশ আমি দেখলাম তার রোজগারের কোনো চেষ্টাই নেই, মনে করলে অনেক গয়না আছে, ওতেই বেশ চলে যাবে। ক্রমশ ওর ভাবভঙ্গি বদলে যেতে লাগল, চাকরি খোঁজার কথা বললেই রেগে ওঠে। তখন হাতের বালাগাছি ছাড়া অন্য যা ছিল তা লুকিয়ে ফেললাম, পাশের ঘরের বন্ধুর কাছে রেখে দিলাম। সে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতো, বাকী গয়না-গুলো কোথায় রেখেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে চারিদিকে খুঁজতো। আমি শুনিয়ে দিয়েছিলাম যে হাতের বাকী বালাটি ছাড়া আর কোনো গয়না আমার আনি নি। শেষে সেটিও যেদিন খুলে দিলাম, তাই নিয়ে সে চলে গেল, আর ফিরে এলো না।"

"তাহলে তুমি কষ্টে পড়েছ বলো? খরচের টাকার এখন অভাব হচ্ছে তো।"

"না না, তা নয়, আমার সত্যিই আরো কিছু গয়না রয়েছে, তাতে অনেককাল পর্যন্ত বেশ চলে যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমি থাকতে চাই না। যতই খারাপ মেয়ে হই, কিন্তু মনটা এখনও আমার মরে নি। আপনি আমাকে এই নরককুণ্ড থেকে বাঁচিয়ে দিন, যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমি এভাবে থাকতে চাই না, ভালো ভাবে থাকতে চাই। একটা ভুল কাজ করে ফেলেছি বলে কি নিতান্তই জাহান্নামে যেতে হবে?"

তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দেখে আমার মায়া হলো। কিন্তু আমার দ্বারা কতটুকু বা সাধ্য!

বললাম—"আমি এর কী ব্যবস্থা করতে পারি?"

"আপনারই বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলুন, কিংবা অন্য কোথাও রাখুন, আমি ঝি-গিরি করে খাবো, যে কাজ করতে বলবেন তাই করবো।"

"সেটা সম্ভব নয়। তার চেয়ে তোমার বাবার ঠিকানা দাও, আমি তাঁকে লিখে তোমার ফিরে যাবার বন্দোবস্ত করি।"

"তা আরো বেশী অসম্ভব। আপনি আমার বাবাকে চেনেন না। তিনি সেকেলে গোঁড়া মানুষ, সামাজিক মর্যাদাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো জিনিস। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু আমাকে তিনি বাড়িতে আর ঢুকতে দেবেন না। আমি যে ব্যভিচারিণী হয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছি, এ দোষের কখনই ক্ষমা নেই।"

আমি চুপ করে বসে রইলাম। তাহলে কি করা যায়! এ মেয়েটি যতই দোষ করে থাকুক, এখন সে শোধরাতে চাইছে, নিজের জীবনকে সে কোনো মতেই নষ্ট হতে দিতে চায় না—তাই আমার আশ্রয় চাইছে। আমার উপর নির্ভর করতে চাইছে। ভদ্র-বাঙালী ঘরের মেয়ে বলেই হোক, কিংবা স্বজাতি বলেই হোক, আমারও ওর উপর কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। আমার ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই উচিত। দেখা যাক না চেষ্টা করে।

কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে একটা মতলব ঠাওরালাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম —"তুমি ইংরেজী লেখাপড়া কিছু জানো কি?"

সে বললে—"হ্যাঁ, তা একটু-আধটু জানি। যদিও খুব বেশী নয়।"

আমি বললাম—"তাহলে এক কাজ করতে পারি। তোমাকে হাসপাতালে নার্সিং-শেখার ক্লাসে ভর্তি করে দিতে পারি। সেখান থেকে পাস করতে পারলে তুমি নিজেই স্বাধীনভাবে উপার্জন করতে পারবে।"

"আমি তাতে খুব রাজী, কিন্তু এখানে আর একদিনও থাকতে চাই না। আপনি জানেন না, আপনার ছাত্র ঐ সত্যকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে আমার ঘরে ঢুকতেই দিই না। বাড়িওয়ালী তাই রোজ আমাকে শাসাচ্ছে, অমন করলে এখানে থাকা চলবে না। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।"

"কিন্তু ব্যস্ত হলে চলবে না, কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে। যখন নার্সদের ভর্তি হবার সময় হবে তখন ছাড়া সেখানে যাওয়া যাবে না। আমি এখন থেকে বলে-কয়ে ঠিক করে রাখবো, যখন সময় হবে তখন এখান থেকে সরিয়ে নার্সদের হোস্টেলে তোমাকে রেখে দিতে পারবো। ততদিন পর্যন্ত এখানেই ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।"

অতএব আরো কয়েক মাস তাকে ঐভাবেই কাটাতে হলো। কিছুকাল অন্তর আমি এক একবার যেতাম, ইংরেজী খবরের কাগজগুলো দিয়ে তাকে পড়তে বলতাম, দু-একটা কথার মানেও বলে দিতাম, খাতা এনে দিয়ে হাতের লেখা লিখতেও বলতাম। নার্সিং-এর একখানা বই এনে দিয়েছিলাম, তাও সে পড়তো।

ইডেন হাসপাতালে নার্সিং-কোর্সে ভর্তি করে ওর হোস্টেলে থাকবার ব্যবস্থা সমস্ত ঠিকঠাক করে নির্দিষ্ট দিনে সত্যরঞ্জনকে সঙ্গে করে নিজের গাড়ি নিয়ে তাকে আনতে গেলাম। তখন আমার সাইকেলের বদলে ঘোড়ার গাড়ি হয়েছে। বলা বাহুল্য, দাদাবাবুই তা কিনে দিয়েছেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি, তাকে ওখান থেকে বের করে আনাও এক

মহা বিভ্রাটের ব্যাপার। যে বাড়িওয়ালী ওকে তাড়িয়ে দেবে বলে এতকাল শাসাচ্ছিল, সে-ই এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। এ বাড়ি থেকে কিছুতেই ওকে চলে যেতে দেবে না। আগের থেকে জানতে পেরে কোথা থেকে দুজন লোক এনে জুটিয়েছে, তাদের বলে বলীয়ান হয়ে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়েছে, মুখ-খারাপ করে বলছে—"কার এত বড়ো সাহস যে আমার ভাড়াটেকে আমার বাড়ি থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায়? এ কী মগের মুল্লুক পেয়েছে! বেশী চালাকি করতে গেলে আমি এখনই পুলিস ডাকবো।"

আমি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললাম—"আমি আগে থানায় খবর দিয়ে তবেই এখানে এসেছি। সেখানে লিখিয়ে এসেছি যে আমার চেনা মেয়েকে তোমরা বদ মতলবে এখানে এনে রেখেছ, আমি তাকে উদ্ধার করে আনতে যাচ্ছি। রাস্তার মোড়ে পুলিস দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আমাকে বাধা দিলেই পুলিস এসে তোমাদের হাতে হাতকড়া লাগাবে।"

এই বলে সত্যরঞ্জনকে ইঙ্গিত করলাম ওকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিতে। সত্যরঞ্জন আবার একটু বললে অনেকখানি করে; বাড়িওয়ালীকে সে দুহাতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তার উগ্রমূর্তি দেখেই হোক, কিংবা পুলিসের নাম শুনেই হোক, লোক দুটি কিছুই না করে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। আমি মালার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। সত্যরঞ্জন তার স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে আমার পিছু পিছু এলো।

গাড়িতে উঠেই কোচোয়ানকে বললাম—"খুব জোরসে হাঁকিয়ে একেবারে ইডেন হাসপাতালে চলে যাও।"

কিন্তু গাড়ি চলতে-না-চলতে বড়ো বড়ো ঢিল এসে পড়তে লাগলো গাড়ির আশেপাশে, পিছনের জানালার উপর। পিছনের কাচটা ভেঙে গেল, নতুন চকচকে গাড়িটাও কিছু কিছু জখম হলো। কিন্তু কোচোয়ান তখন খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা মোড় পেরিয়ে বড় রাস্তার উপর গিয়ে পড়লাম। ঢিল-পড়াও তখন থেমে গেল।

হোস্টেলে ওকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। যদিও একটা বছর ওর হোস্টেলের খরচ আমাকেই চালাতে হবে, কিন্তু অসহায় মেয়েটা তো জীবনের একটা রাস্তা পেলো। অন্ততপক্ষে একটি অবলা নারীকে আমি হীনবৃত্তি অবলম্বনের অনিবার্যতা থেকে রক্ষা করতে পেরেছি, এই ভেবে খুব তখন আত্মশ্লাঘা বোধ করলাম।

যথাসময়ে মালা নার্সিং পরীক্ষাতে পাস করলো। তখনকার দিনে নার্সের

খুবই অভাব, পাস করলেই তৎক্ষণাৎ কোনও হাসপাতালে চাকরি পাওয়া যায়। সেও একটা কলেজেরই হাসপাতালে চাকরি পেয়ে গেল। যথারীতি মাথায় নার্সিং ক্যাপ লাগিয়ে এবং কোমরে বেল্ট্ এঁটে সে নার্সের কাজে নিযুক্ত হলো। আমিও তাই দেখে পরিতৃপ্ত হলাম। ওর একটা গতি হলো।

কিন্তু এখানেই এ কাহিনীর সমাপ্তি হলো না। আরো কয়েক বছর ধরে মালার জীবনের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। সমস্তটাই এখানে বলতে হয়, নতুবা তার ইতিহাসটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পুরো একটি বছর সেই চাকরি সে করলো। ভালো নার্স বলে হাসপাতালে তার সুনামও হচ্ছে শোনা গেল। সেখানে সে নার্সদের কোয়ার্টার্সে থাকে, ছুটি পেলে মাঝে মাঝে আমার ডাক্তারখানায় আসে দেখা করতে, বেশ সপ্রতিভভাবে কথা বলে। দামী দামী জামাকাপড়ও কিছু কিনেছে দেখতে পাই। শুনলাম যে, মাইনের থেকে আলাদা করে কিছু জমাতেও পারছে। সবই ভালো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটু যেন কেমন কেমন চটুলতা লক্ষ্য করছিলাম। ভেবেছিলাম যে ওটুকু তো হবেই, স্বাধীন জীবন যখন পেয়েছে।

একদিন হঠাৎ শুনি, মালার চাকরি গেছে। হাসপাতাল থেকে নাকি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম, কোনো একটি ছাত্রের সঙ্গে কিছু অন্যায় রকমের গোলমাল বাধিয়েছিল, রেসিডেণ্ট-সার্জনের হাতে দুজনে ধরা পড়ে। সেই ছাত্রটিও রাস্টিকেট হয়ে গেছে, আর ওর-ও চাকরি গেছে।

তারপর কোথায় গিয়ে সে উঠেছে কে জানে। বিরক্ত হয়ে আমি আর কোনো খোঁজ করলাম না। সত্যর কাছে শুনলাম নার্সদের কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ঢুকেছে। নিজেই একটা কাজকর্ম যোগাড় করে নিয়েছে।

এর কিছুকাল পরে আমার নিজের হার্নিয়া অপারেশন হয়। জ্ঞান হবার পরে দেখি একজন নার্স আমার সেবা করছে। প্রথমটায় চিনতে পারি নি, তারপরে চিনলাম—মালা। ও কেমন করে এসে জুটলো? পরে শুনলাম, কোথা থেকে খবর পেয়ে ও নিজেই উপযাচক হয়ে এসেছে। দিনে রাত্রে একাই সর্বক্ষণ থেকে সে আমার খুব সেবা করলে, অন্য কোনো নার্সকে আনতে দিলে না। যে-কটা দিন শয্যাগত ছিলাম, সে অক্লান্তভাবেই পরিশ্রম করলে, কোথাও কিছুমাত্র ত্রুটি হতে দিলে না। তার কাজ দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে যে—হাঁ, এই একজন সত্যিকারের নার্স বটে!

তারপর আমি যখন সেরে উঠে নিজের কাজে বেরোতে শুরু করলাম, তখন সে আমার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগল। আমার অত সেবা করেছে, আর তার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে পারি না। তা ছাড়া সে নিজেই বললে—"আমাকে যে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে, তার মধ্যে অনেক কথা আছে, কাকাবাবু। আমার বিশেষ কিছু দোষ ছিল না, আলাপ-সালাপ তো এমনি কত লোকের সঙ্গে হয়েই থাকে, তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু দু একজন ডাক্তার আমাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছিলেন, আমি তাঁদের কথায় কান দিই নি, তাঁদের দ্বারাই এটি হয়েছে। যাক্, তা ভালোই হয়েছে, হাসপাতালের চেয়ে বাইরের কাজ করে আমি বেশী পয়সা পাচ্ছি। কোনোদিন আমাকে বসে থাকতে হয় না"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু কিছুকাল পরে মালা তার সুর পাল্টাতে শুরু করলে। বললে—"নাঃ, এ বড়ো একঘেয়ে রকমের কাজ, আমার ভালো লাগছে না। আমি এর চেয়ে আরো কিছু বেশীরকম শিখতে চাই। একটা হোমিওপ্যাথি কলেজে ভর্তি হয়েছি, সেখানে পড়াশোনা করছি, এতদিন সে কথা আপনাকে বলি নি। শুধু নার্সিং ছাড়া একটু-আধটু ডাক্তারিও শিখতে চাই।"

ওর আর কি জবাব দেবো! আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর একদিন বললে—"কাকাবাবু, আমাকে ডাক্তার রায়ের বাড়ির কাজে ঢুকিয়ে দিন না? পয়সাকড়ি চাই না, তাঁর ক্লিনিক্যাল নার্স হয়ে থাকবো, তাতে অনেক কিছুই আমার শেখা হয়ে যাবে।"

আমি বললাম—"আচ্ছা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।"

ডাক্তার রায়ের চেম্বারে কোনো ক্লিনিক্যাল নার্স ছিল না। অথচ অনেক স্ত্রীলোক রোগীও তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে আসতো। একটি স্ত্রীলোক সহকারী না থাকায় মাঝে মাঝে খুব অসুবিধা হতো, বিশেষ করে পর্দানশীন রোগীদের বেলাতে। তিনি এই প্রস্তাব শুনেই বললেন, মেয়েটিকে আগে আমি দেখতে চাই। তাকে একদিন নিয়েই গেলাম। তার চটপটে ভাব দেখে ও নম্র কথাবার্তা শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। বললেন—"এমনি আসতে হবে না, ট্রামভাড়া হিসেবে কিছু নিতে হবে। তোমারও তো নিজের খরচ চলা চাই।"

সেই দিন থেকে মালা প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ডাক্তার রায়ের চেম্বারে হাজিরা দিতে শুরু করলে। ডাক্তার রায় ওর কাজে আগ্রহ দেখে খুব খুশি হলেন।

রোগী দেখার পালা শেষ হয়ে যাবার পরে প্রত্যহ বিকালে আমাদের সেখানে চায়ের আড্ডা বসতো। আমি ছাড়াও ডাক্তার রায়ের আরো দুই-তিনজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছিল। ডাক্তার রায় বেরিয়ে চলে যাবার পরে আমরা সকলে মিলে বসে জিবে-গজার সঙ্গে চা পান করতাম। বাড়ির ভিতর থেকে আমাদের জন্যে প্লেটে ভরা গরম জিবে-গজার সঙ্গে চা এসে হাজির হতো। সকলে মিলে তার সদ্ব্যবহার করতাম, মালাও আমাদের একপাশে বসতো।

আমরা ছাড়া বাইরের দুই-একজন ডাক্তারও সেই আড্ডায় এসে কখনো কখনো জুটে পড়তো। তারা প্রায় রোগী নিয়েই আসতো, রোগীরা চলে যাবার পরেও তারা কিছুক্ষণ সেখানে থেকে যেতো, চা খাওয়া এবং আড্ডা জমানোর লোভে।

ওর মধ্যে একজন ছিলেন ডাক্তার বোস। অবাঙালীদের মহলে তাঁর বেশ কিছু পসার প্রতিপত্তি ছিল, নিজের মোটরগাড়ি ছিল। তিনি শৌখীন মানুষ, কিন্তু শুনেছিলাম বিপত্নীক। ভদ্রলোক আমাদের চেয়ে বয়সে তখন যথেষ্ট বড়ো, ঘাড়ের চুল কিছু কিছু পেকে গেছে। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের দলে মিশে আমাদের ঠাট্টা-তামাসায় সমানে যোগ দিতে আসতেন।

মালা ওখানে কেবল আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলা ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলতো না। একধারে শুধু চুপটি করে সে বসে থাকতো। ডাক্তার বোস প্রায়ই ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, কিন্তু সে থাকতো নির্বিকার হয়ে। এতে আমি মনে মনে খুশিই হতাম।

একদিন ডাক্তার বোস আমাকে ধরে বসলেন—"ঐ মেয়েটিকে তুমিই বুঝি এখানে জুটিয়েছ?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ।"

'কোথা থেকে যোগাড় করলে হে?"

"অনেক আগের থেকেই আমার চেনাশোনা।"

"ও, তাহলে তোমার হাতেরই লোক বলো। তা, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দাও না, আমিও তো ওকে দু-চারটে কেস্-পত্তর দিতে পারি, তাতে ওরই কিছু লাভ হবে।"

আলাপ করিয়ে দিলাম। কিন্তু সে আলাপ মানে কিছুই নয়। দেখা হলে মালা হাত তুলে একটু নমস্কার করে, এই পর্যন্ত। ভদ্রলোক অনেক বাজে কথা বলে ঘনিষ্ঠতা জমাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে দু-একবার 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' ছাড়া কোনো বাহুল্য কথাই কয় না।

ডাক্তার বোস তখন আমাকে ওর সঙ্গে জড়িয়ে প্রায়ই অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন, অবশ্য ওর অসাক্ষাতে। আমি দু একবার বুঝিয়ে বললাম যে আমি ওর সম্পর্কে কাকা হই, এ-সব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাতও করেন না, বলেন—"অমন পাতানো কাকা ঢের ঢের আমার দেখা আছে।" যখন বলতে ছাড়বেন না, তখন উনি যা-কিছু বলতেন আমি তাতে ততটা কান দিতাম না।

এমনি ভাবে কিছুকাল কাটলো। তারপর একদিন হঠাৎ আমার ওখান থেকে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। সবাই চলে যাবার পরেও আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকে কিছু কাজ করছিলাম। যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়িতে যেতে যেতে পথের দিকে মুখ বাড়িয়েছিলাম, খানিকটা গিয়েই দেখি একটা গলির মোড়ে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে ডাক্তার বোস আর মালা দুজনে মিলে দিব্যি কথা বলছে। মালার তখন কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই, বরং মনে হলো তার মুখচোখের হাসি হাসি ভঙ্গি খুবই সপ্রতিভ। কথার মধ্যে ওরা এতই তন্ময় যে সেখানে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো থাকা সত্ত্বেও আমাকে ওরা দেখতেই পেলে না।

আরো কিছুকাল কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন ডাক্তার রায়ের চেম্বারে যাওয়া মালার বন্ধ হয়ে গেল। সে যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল, তার কোনো পাত্তাই আর মিললো না। যে বাড়িতে সে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতো সেখানে গিয়ে শুনলাম, ঘর ছেড়ে দিয়ে সে কোথায় চলে গেছে, কাউকে কোনো ঠিকানাও বলে যায় নি। ডাক্তার রায় খোঁজ করাতে তাঁকেও সেই কথা বলতে হলো।

কয়েকটা দিন পরেই কিন্তু রাস্তায় আমি তাকে দেখতে পেলাম। সে চলেছে ডাক্তার বোসের মোটরে, তাঁরই পাশে বসে।

বুঝতে পারলাম সবই। সেই দিনই ডাক্তার বোসকে আমি নিজে টেলিফোন করলাম। একটু রূঢ়ভাবেই বললাম—"মালাকে অমন চুরি করে নিয়ে যাবার কোনো দরকার ছিল না। বলে-কয়ে নিয়ে গেলেই পারতেন তাহলে ডাক্তার রায়ের কাছে আমার মাথা হেঁট হতো না।"

ডাক্তার বোস তার জবাবে বললেন—"ওহে ভায়া, মালা কি চিরকাল তোমার গলাতেই দুলবে? এবার না হয় আমার গলাতেই কিছুদিন দুললো, তাতে অমন খাপ্পা হও কেন? কি বলো, হ্যা হ্যা হ্যা—"

বিরক্ত হয়ে আমি টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দিলাম।

যাক্, অতঃপর আমি ভাবলাম যে ঘাড় থেকে এ বোঝা নেমে গেল, আর আমার কাছে সে মুখ দেখাতেই আসতে পারবে না। আর তার কোনো দরকারও হবে না।

কিন্তু মাস তিনেকের বেশী কাটলো না। একদিন সন্ধ্যার পরে সে আবার আমার ডাক্তারখানাতে এসে হাজির। বোধ হয় অনেকক্ষণ থেকেই বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, যেমনি দেখলে যে লোকজন সব চলে গেছে, আমি একা বসে আছি, অমনি বাইরে থেকে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। কাঁদতে কাঁদতে বললে—"আগে আমার কথাগুলো সব শুনে নিন, তারপর আমাকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দেবেন। ক্ষমা করতে বলতেই পারি না, শুধু কথাগুলো আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই।"

দেখলাম চেহারাটা খুবই বিশ্রী আর মলিন হয়ে গেছে। বেশভূষার সে পারিপাট্য নেই, কাপড়চোপড় ময়লা, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। নিতান্ত দৈন্যদশা, দেখলেই তা বোঝা যায়।

আমি বললাম—"শুনে আর কি হবে? ডাক্তার বোস দুদিন বাদে রাস্তায় বের করে দিলে তো?"

মালা বললে—"লোকটা অত্যন্ত ছোটোলোক, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর। তা কেমন করে জানবো বলুন! দেখেছেন তো, আমি আগে ওর সঙ্গে মিশতেই চাই নি। কিন্তু ও সেধে সেধে আমার সঙ্গে আলাপ করতে শুরু করলে, কাজ দেবার ছুতো করে আমার বাসাতে গিয়ে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো। তারপর বললে, ওর ডাক্তারখানাতে আমার জন্যে আলাদা একটা হোমিওপ্যাথি বিভাগ খুলে দেবে, সেখানে বসে আমি প্র্যাক্‌টিসও করতে পারবো। অনেক রকমই লোভ দেখালে, তাতেও আমি রাজী হই নি। শেষে বললে যে রেজিষ্ট্রি করে আমাকে বিয়ে করবে। তখন আমি রাজী হয়ে গেলাম, একজন ডাক্তারের স্ত্রী হয়ে জীবনটা মানের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারবো। তখন আমাকে সব কাজ ছাড়িয়ে নিজের ডাক্তারখানার উপরকার একটা আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখলে। প্রথমটায় আমাকে খুবই যত্ন করতো, যেখানে যেতো আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। তারপর ক্রমশ আমাকে ড্রিংক্ করতে শেখালে। নিজেও ড্রিংক্ করতো আর আমাকেও করাতো। কিন্তু বিয়ের সম্বন্ধে আর কোনো উচ্চবাচ্যই করে না। বললেই, 'হবে হবে' বলে কাটিয়ে দেয়। তাতে একদিন আমি বেঁকে বসলাম। তখন থেকে আমার উপর রীতিমতো অত্যাচার করতে শুরু করলে। সেই ঘরটি থেকে

কোথাও আমাকে বেরুতে দেয় না, নিজে যখন আসে তখন ছাড়া ঘরে সব সময় আমাকে তালা বন্ধ করে রেখে দেয়। কিন্তু জোর-জবরদস্তি করে আমার সঙ্গে পারবে কেন? একদিন ড্রিংক্ করে যখন একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে, তখন একসময় তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল টেনে দিয়ে আমি এক-কাপড়ে পালিয়ে এসেছি। আমার এক নার্স-বন্ধুর ঘরে এসে উঠেছি, কিন্তু সে আর কতদিন চালাবে? আমার পয়সাকড়ি কিছুই নেই, এখন খেতে পাচ্ছি না। আমি গরীব ভিখিরি, দুনিয়াতে আপনি ছাড়া দুঃখ জানাতে আমার কেউ নেই। আপনার কাছে শেষ পর্যন্ত না এসে কি করি বলুন? সব কথাই আপনাকে খুলে বললাম, এখন আমাকে রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন।"

স্বীকার করছি যে ওর সম্বন্ধে আমার মনে একটু দুর্বলতাই ছিল। গোড়া থেকেই ছিল। মনে মনে ভাবতাম, আহা অমন একটি ভদ্র মেয়ে, অনর্থক নষ্ট হয়ে যাবে! একটু চেষ্টা করলে যদি ওকে সেই নিদারুণ নিয়তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তো সেটা ভালো কথা নয় কি? দোষত্রুটি পদস্খলন একটু-আধটু এতে হবেই, সেটুকু ক্ষমা না করলে চলে না। নির্দয় নির্মম বিচারক হয়ে কোনো লাভ নেই, তাতে কাউকে ভালো করা যায় না। আমি চাই যে ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক, পৃথিবীকে চিনে নিয়ে সংযত হয়ে ভদ্ররকমের মনুষ্যজীবন যাপন করতে শিখুক। কিন্তু তা কি এককালেই হওয়া সম্ভব? এমনি ভাবে ঠেকতে ঠেকতে তবে তো শিখবে।

"ক্ষমার যোগ্য আমি নই, কাকাবাবু, আমার দিকটা ভেবে দেখবারও কেউ নেই। যারা ক্ষমা আদায় করে নিতে জানে তাদের সকলেই ক্ষমা করে, কিন্তু যে জানে না তার উপায় কি হবে? তার উপায় আপনার মতো দয়ালু মানুষ।"

চোখের জল ও পায়ে ধরা আর এইসব অনুনয়ের পরে অগত্যা আমাকে ক্ষমাই করতে হলো। আবার আগের মতো সব কিছুই করতে হলো। আবার তাকে এক নার্সিং-হোমে ঢুকিয়ে দিলাম। সে অন্যান্য নার্সদের সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে ভদ্রভাবে কাজ করতে শুরু করলে। কিন্তু ডাক্তার রায়ের চেম্বারে কোনোমতে আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে এতেই খুশি হয়ে থাকো, এর চেয়ে বেশী কিছু উচ্চাশা করে তোমার কাজ নেই। সেও কথাটা এবার যেন বুঝে নিলে।

বছরখানেক পর্যন্ত আর কোনো গোলমাল হয় নি। আবার সে তেমনি

স্মার্ট হয়ে উঠল, মন দিয়ে কাজ করতে থাকলো, ডাক্তার-মহলে তার সুখ্যাতি শোনা গেল। নার্সের দরকার হলে অনেকেই ওর খোঁজ করে। দু একটা বড়ো বড়ো বাড়িতে ওকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, তারাও দরকার পড়লে আগে ওকেই ডেকে পাঠায়। এদিকে বেশ মিশুক, কাজেই তাদের বাড়িতে দিদি মাসী প্রভৃতি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে। বাড়ির কাজেকর্মে তারা ওকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে পাঠায়। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতেও বেশ পটু, কাজেই সকলেরই ও প্রিয়পাত্রী। আর অনেকেরই বাড়িতে ও নিজের কাকাবাবুর গুণব্যাখ্যা করে বেড়ায়। বলে, 'এমন ডাক্তার তোমরা দেখ নি। সব ডাক্তারে যাকে এলে দিয়েছে তাকেও উনি সারিয়ে তুলতে পারেন।' বলে যে, 'আমি নিজে তো একবার মরেই গিয়েছিলাম, উনি আমাকে কি-সব ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘাট থেকে ফিরিয়ে আনলেন।' ওর মুখে এইসব আশ্চর্য বিজ্ঞাপন শুনে দুরারোগ্য ক্রনিক রোগী কেউ-কেউ আমাকে চিকিৎসারও ভার দেয়, তাতে আমার বেশ কিছু অর্থাগমও হয়। তাকেও আমি যেমন কিছু কাজ পাইয়ে দিই, সেও তেমনি মাঝে মাঝে আমাকেও কিছু পাইয়ে দেয়। এ বিষয়ে তার খুবই আগ্রহ দেখতে পাই। ওর যে প্রকৃত একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে এটা অনেকবারই দেখেছি। আমার দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া সম্বন্ধে কাউকে রাজী করাতে পারলে ও নিজেই এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়, আমার যা ন্যায্য ফী তার ডবল তাদের কাছ থেকে আদায় করে দেয়। আমাকে চুপি চুপি বলে, "আমি এই ফী ওদের বলেছি, কম ফী বললে ওদের মনে বিশ্বাস আসতো না। আপনি যেন এতে 'না' করবেন না।" কাজেই চুপ করে যাই।

ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোকের স্ত্রীর মেরুদণ্ডের হাড়ে ঘুণ ধরলো, যাকে বলে 'বোন্ টি.বি.'। তাকে প্ল্যাস্টার বেঁধে বহুদিনের জন্যে বিছানায় ফেলে রাখতে হলো। ভদ্রলোক কোনো অফিসে চাকরি করেন; ভালোই চাকরি। তিনি সকল সময় বাড়িতে থাকতে পারেন না। তার উপর আবার তিন-চারটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। কেই বা তাদের দেখাশোনা করে, আর কেই বা শয্যাগত রোগিনীর পরিচর্যা করে। ঝি-চাকরের দ্বারা যদিও সংসারের কাজ চলে যেতে পারে, কিন্তু এ-সব কাজ তাদের দ্বারা ঠিকমতো ভাবে হতে পারে না। তখন আমি সেই ভদ্রলোককে বললাম, আপনি একজন নার্স রাখুন, যে দিনে অন্তত দুবার করে এসে এইসব কাজগুলো করে দিয়ে যেতে পারবে। তিনি বললেন, নার্স রাখার মতো তাঁর সামর্থ্য নেই।

আমি বললাম, বেশী খরচ লাগবে না, আমি অল্প খরচেই নার্সের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। মালাকে সেখানে নিযুক্ত করে দিয়ে বললাম, নার্সিং-হোমে যাবার সময় আর সেখান থেকে ফেরবার সময় দুঘণ্টা এখানে এসে রোগীর সব-কিছু কাজকর্ম করে দিয়ে যাবে। যদিও সামান্যই কিছু পাবে, কিন্তু এখানে পয়সার দিকটা দেখলে চলবে না। সে খুব সন্তুষ্ট মনেই এতে রাজী হলো।

সে ঐ ভাবেই ওখানে কাজ করছিল। কিন্তু রোগিনীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে লাগলো। তাঁর নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো, চারিদিকে বেড্-সোর হতে লাগলো। মালা তখন নার্সিং-হোম থেকে ছুটি নিয়ে দিনের সর্বক্ষণই ওখানে থাকতে লাগলো। দেখলাম যে ভদ্রলোকটিও ওর উপর নানা বিষয়ে নির্ভর করতে শুরু করেছেন, আর ছেলেমেয়েরাও ওর খুব বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু সেই রোগিনী হঠাৎ আমাকে একদিন সোজা জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"ঐ নার্সটিকে আপনি এ বাড়িতে কেন আনলেন?"

আমি বললাম—"আপনারই সেবা করবার জন্যে! কেন, ও কি ভালো করে আপনার যত্ন নিচ্ছে না?"

"সে যা করবার তা করছে বৈকি। কিন্তু এদিকে যে আমার স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?"

আমি হেসে উঠে বললাম—"একটু দূরে দূরে সরিয়ে রাখাই তো আমি চাই। ও ঠিক কাজই করছে। রোগটা কিছু ছোঁয়াচে ধরণের কিনা। ছেলেমেয়েরা আপনার সঙ্গে বেশী মাখামাখি করলে ওদের অনিষ্ট হতে পারে। আপনি আগে সেরে উঠুন না, তখন সবাই আপনার কাছে থাকবে। তখন কি আমরা বাধা দিতে আসবো?"

যদিও আমি জানতাম যে তাঁর এ রোগ সারবার নয়, আর রোগিনীও সে কথা বুঝেছিলেন, তবু আমার কথা শুনে তিনি চুপ করে গেলেন।

কিছুকালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

এর পর অনেকদিন মালার সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। প্রয়োজন না হলে এমানতে তখন আর তেমন দেখাই হয়না। সেও থাকে তার নিজের কাজ নিয়ে, আমি থাকি আমার নিজের তালে। সে আমার কাছে না এলেও আমি তার বাসায় গেলে অবশ্য দেখা হতে পারতো; কিন্তু আমার

তাতে যথেষ্ট আপত্তি ছিল, আমি মনে করতাম যে ওতে গাম্ভীর্য বজায় থাকবে না। বিনা কারণে কেনই বা যাবো ওর বাসাতে।

কিন্তু একদিন যাবার বিশেষ প্রয়োজন হলো। একটি মাতৃহীন শিশুর কঠিন আমাশা রোগ হয়েছে, আজই রাত্রে সেখানে নার্স নিযুক্ত করা চাই কোথায় নার্স খুঁজতে যাবে এই ভেবে তারা ইতস্তত করছে, আমি বললাম যে আমিই একজন নার্সকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে খুব ভালো কাজ জানে, আপনাদের কোনো ভাবনা নেই।

সেই রাত্রে হঠাৎ গিয়ে হাজির হলাম মালাদের বাসাবাড়িতে। দোতলায় উঠে দেখলাম, তার ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাটা ভেজানো। হাতের চাপা দিতেই দরজাটা খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকেই দেখি, সেই মৃতদার ভদ্রলোকটি একপাশে চেয়ারে বসে আছে। তার সামনে এক ছোটো টেবিলের উপর ডিক্যাণ্টার ও মদের বোতল। আরো দেখি যে, মালার হাতে সিগারেট জ্বলছে।

আমাকে দেখেই ভদ্রলোক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠল—"আমি তাহলে চলি"—বলেই আমার পাশ কাটিয়ে ঝড়ের মতো সে বেরিয়ে গেল।

আমিও তখন চলে আসবার জন্যে পা বাড়িয়েছি। মালা ছুটে এসে দরজা আগ্‌লে দাঁড়ালো। বললে—"শুনুন আগে কথা, আমার কোনো দোষ নেই, কাকাবাবু—"

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে আমার নজরে পড়ে গেল ওর ঘরের কোণে একটা মস্ত মাকড়সা। কে যেন সেটা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

আমি একটু হেসে ওকে বললাম—"বুঝেছি বুঝেছি। ঐদিকে চেয়ে দেখ। তুমি ঠিক কথাই বলেছ, মাকড়সার কোনো দোষ থাকে না, ও কেবল জাল পাততেই জানে। মাছিদেরই যত দোষ, তারাই উড়ে উড়ে ওর জালে গিয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি চললাম। তুমি তো এখন ভালোই আছো। আমার কাছে আর কখনো যেও না।"

সেই থেকে মালার কোনো খোঁজ নিই নি, সেও আর আমার কাছে আসে নি।

॥ আট ॥

মালার সঙ্গে জড়িত আরো একটি করুণ স্মৃতি এখনও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। তার কথা আজও আমি ভুলে যাই নি।

যার কথা বলতে যাচ্ছি সেও অমনি একটি মেয়ে, তার নাম নির্মলা। মালার সঙ্গে পরিচয়-সূত্রেই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যায়। যে বাড়িতে মালা থাকতো সেই বাড়িতে সেও দৈবক্রমে এসে উঠেছিল। মালা সেখানে তখন রয়েছে।

একদিন মালা হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠালে। বলে পাঠালে যে অন্য একটি রোগী আছে, তাকে একবার দেখতে আসতে হবে।

আমি যেতেই মালা তাকে আমার কাছে এনে হাজির করলে। বললে—"প্রণাম করো, ইনি আমার কাকাবাবু, তোমারও কাকবাবু।" মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম করলে।

চেহারা খুবই রোগা, মুখখানি অতি করুণ, নেহাৎ বোকাসোকা ভালো-মানুষের মতো। বয়স বেশি নয়, একুশের উপর হবে বলে মনে হয় না। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, রক্তহীন। দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি গর্ভবতী, প্রায় পূর্ণগর্ভা। সে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, থপ্ করে মাটির উপর সেখানেই বসে পড়ল।

মালার কাছে ওর পরিচয় পেলাম। মালা যা বললে তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সে বললে—"এ হতভাগীর অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ। অল্পবয়সে বিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়িতেই ছিল, ওর বাপ-মা কেউ নেই। পল্লীগ্রামের লোক, কিন্তু তাদের অবস্থা ভালো। সেখানে ওর এক ভাসুর আছে, সে যেমন বদচরিত্র তেমনি নেশাখোর। বাপ-মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে সে এক-রকম জোর করেই ওকে নষ্ট করেছে। ওকে ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে রেখেছিল—'খবরদার কাউকে যদি বলিস তাহলে তোকে খুন করে ফেলব।' প্রাণের ভয়ে ও কাউকে কিছু বলে নি। কিন্তু যখন পেট বড়ো হয়ে উঠতে থাকল তখন তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। যখন জানাজানি হলো তখন সবাই ওর নামেই দোষ দিলে, বললে যে ওকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও। তখন ভাসুর বললে, 'তোমরা কিছু ভেবো না, আমি ওর ব্যবস্থা করছি।' সেই ভাসুরই ওকে এখানে এনে ফেলে দিয়ে গেছে। বাড়িওয়ালীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছে, বলে গেছে যে, প্রসব হয়ে যাবার পরে বাচ্চাটার একটা কিছু গতি

করে ওকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে'। সে যে কবে ফিরিয়ে নিতে আসবে তা বেশ বুঝতেই পারছি। বাড়িওয়ালী কিন্তু আর ওকে এখানে রাখতে চায় না, কেবলই বলছে ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসব। আর ওর অবস্থা দেখছেন তো, প্রসব হতে হতে হয়তো মরেই যাবে। এখন আপনি যদি ওর একটা কিছু উপায় করে দিতে পারেন। ওর দোষ তো নিশ্চয়ই আছে, ও এমন ন্যাকা কেন? কিন্তু তবুও যাতে এখন ও প্রাণে বাঁচে সে-চেষ্টা আমাদের করতে হয়।"

মেয়েটি হেঁটমুখে বসে হাঁপাতে লাগল। তার দুচোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। আমি যন্ত্র দিয়ে হার্টটা একবার দেখলাম, হার্টের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এ অবস্থায় এখনই হাসপাতালে নিয়ে রাখা খুবই দরকার।

আমি তখন বললাম—"দেখি, হাসপাতালে আগে একটা বেড্ ঠিক করে আসি। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়ার যাহোক ব্যবস্থা হবে।"

নির্মলা আবার হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধুলো নিতে এগিয়ে এল। এদিকে তখনও হাঁপাচ্ছে। আমি বললাম—"থাক থাক, ওসব পরে হবে।"

হাসপাতালে একটা বেড্ যোগাড় করতে আমায় কোনো বেগ পেতে হয় নি। দুদিনের মধ্যেই তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সত্যকে বললাম গাড়ি ভাড়া করে ওকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে।

যে ওয়ার্ডে ওকে ভর্তি করা হলো সেখানকার ডাক্তার ও নার্স প্রভৃতি সকলকেই আমি বলে রেখেছিলাম যে মেয়েটি আমার বিশেষ পরিচিত। সুতরাং ওর চিকিৎসার ও যত্নের কোনই ত্রুটি হলো না।

শরীরটা একটু সেরে আসছিল, কিন্তু প্রসবের সময় নানারকম গণ্ডগোল বাধল। দেখা গেল যে প্রসবের কোনো বেগ নেই, আর ভিতরকার সন্তানটিও জীবিত নেই। বাধ্য হয়ে নানারকম কৃত্রিম উপায়ে তাকে প্রসব করাতে হলো। তার পরে ওর প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকল। কিছুতেই তা থামানো যায় না। এর জন্যেও অনেক কৃত্রিম উপায়ে রক্তস্রাব বন্ধ করতে হলো। এইসকল কারণে শেষ পর্যন্ত সে নিতান্ত নির্জীব হয়ে পড়ল। কেবল প্রাণে বেঁচে রইল, এই মাত্র।

কিন্তু এর উপরে তার প্রবল জ্বর হতে লাগল। এখনকার দিনে প্রসবের পরের এই জ্বরকে কোনোই ভয় নেই, এর খুব ভালো ভালো ওষুধ রয়েছে যাতে দু তিনদিনেই তা আরোগ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে এও ছিল এক মারাত্মক রোগ, অনেক প্রসূতিই এ-রোগে মারা যেতো।

তখনকার নিয়ম অনুযায়ী যথোচিত চিকিৎসা হতে থাকল, কিন্তু সে জ্বর সহজে কমতে চায় না।

আমি প্রত্যহ তাকে একবার করে দেখতে যেতাম। জ্বরের ঘোরে আমার দিকে চেয়ে সে যেন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতো। বলতো—"কাকাবাবু, আমার জন্যে আপনি অনেক কিছুই করলেন, কিন্তু এবার আমাকে যেতে দিন। আমার মতো হতভাগীকে বাঁচিয়ে কি লাভ আছে বলুন? আমি তো দুঃখ পাবোই, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও দুঃখ পাবেন। বরাত কি কারো বদলানো যায় কাকাবাবু?"

বাস্তবিক সান্ত্বনা দেবার কিছুই ছিল না, তাই তাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখতাম। আমার একটু ধমক খেলেই সে তৎক্ষণাৎ শান্ত হতো।

কিন্তু ক্রমশ ধীরে ধীরে সে আরোগ্য হয়ে উঠতে লাগল। জীবন সম্বন্ধে সে আশান্বিত হলো, তার মুখে একটু হাসিও দেখা গেল। তখন সে বলতো—"কতকাল পরে আমার ভয় ঘুচল তার ঠিকানা নেই। সারা-জীবনটা আমার ভয়ে-ভয়েই কেটেছে। কিন্তু ভয় গেলেও ভাবনা তো যায় না, কাকাবাবু! এর পরে আমার কি দশা হবে, কোথায় গিয়ে উঠবো, কি নিয়ে থাকবো?"

আমি আবার ধমক দিয়ে বলতাম—"ওসব তোমায় এখন ভাবতে হবে না, মনে ভাবনা থাকলে সারতে আরো দেরি হবে। আগে ভালো করে সেরে ওঠো, তারপরে সে তখন দেখা যাবে। এখন ওসব ভাবনা আসতেই দিও না।"

সে বলতো—"আপনি যখন বলছেন তখন আর ও-কথা ভাববোই না। আপনি আর-জন্মে আমার বাবা ছিলেন। নিশ্চয় ছিলেন।"

মুখে ঐ কথা বললাম বটে, কিন্তু এ মেয়েটিকে নিয়ে যে কি করি, কোথায় ওকে রাখি, তাই নিয়ে এক মহা ভাবনায় পড়লাম। ও যেন আমারই ঘাড়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াল। যেখান থেকে হাসপাতালে এনে রেখেছি, সেখানে আর ওকে ফিরিয়ে পাঠানো যায় না। প্রথমত কার কাছেই বা পাঠাবো, আর দ্বিতীয়ত থাকবার মতো খরচপত্র না দিলে কেই বা ওকে জায়গা দেবে। শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাবার কথা একবার উত্থাপন করে দেখেছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই ভাসুর রয়েছে; ও বলে যে—গাছতলায় পড়ে থাকি সেও ভালো, তবু সেখানে আর নয়। অন্য আত্মীয়-স্বজনও কেউ এমন নেই যেখানে ওর স্থান হতে পারে। দুনিয়ার কোনোখানেই ওর স্থান নেই। কিন্তু আমিই বা ওর কোন্ উপায় করতে পারি, কতটুকু আমার ক্ষমতা!

হাসপাতালে বেশিদিন ওকে রাখবে না, একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই ডিস্‌চার্জ

করে দেবে। একজন রোগী অনেকদিন পর্যন্ত বেড্ অধিকার করে থাকবে, হাসপাতালের এ নিয়মই নয়। এর মধ্যেই ওরা বলতে শুরু করেছে যে এবার বাড়ি নিয়ে গিয়ে পুষ্টিকর পথ্যাদি দিয়ে ওকে সারিয়ে তুলুন। রক্ত-শূন্যতার অজুহাতে আরো কিছুদিন রাখতে অনুরোধ করেছি, নিতান্ত আমার খাতিরে আরো কিছুদিন ওরা রাখতে স্বীকার হয়েছে। ইতিমধ্যে যাহোক্ একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি এক নারী-আশ্রম খুঁজে বের করলাম। তারা এমনি সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায় মেয়েদের স্থান দিয়ে রাখে। অনেকগুলি ধনী লোকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত উন্নত ধরণের এক নারী-আশ্রম, সেখানকার সবকিছু ব্যবস্থা বেশ ভালো। মেয়েদের দ্বারাই সেটি পরিচালিত হয়, পুরুষের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। মেয়েদের সেখানে সুতো কাটতে, তাঁত চালাতে, পশম প্রভৃতি বুনতে, আর জামা-কাপড় সেলাই করতে শেখানো হয়। কিন্তু সেখানে ভর্তি করার হাঙ্গামা আছে। কেউ একজন অভিভাবক-স্বরূপ দাঁড়িয়ে দায়িত্ব গ্রহণ না করলে যাকে-তাকে সেখানে স্থান দেওয়া হয় না। ঐ নারী-আশ্রমের একজন কর্তৃপক্ষকে আমি চিনতাম, তাঁকেই গিয়ে ধরলাম। তিনি বললেন, আমি নিজে যদি গার্জেন-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াই, তাহলে তিনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তাতেই আমি স্বীকার হলাম, সম্পর্কে আমি কাকা হই বলে দরখাস্তের উপর স্বাক্ষর করে দিলাম। নাম ধাম ঠিকানা সমস্তই দিতে হলো। কয়েকদিন পরে ঐ আশ্রম থেকে চিঠি পেলাম যে মেয়েটিকে ওরা নিতে রাজী আছে।

সঙ্কোচ কাটিয়ে ওকে গিয়ে তখন বললাম যে আপাতত এই ব্যবস্থাই আমি করেছি। এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

ভেবেছিলাম যে, নারী আশ্রমে এইভাবে চালান করে দেবার কথা শুনে ও হয়তো দুঃখিত হবে, হয়তো আপত্তি করবে। কিন্তু তা কিছুই হলো না। বরং সে খুশি হয়েই বললে—"আপনি যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই আমি যাবো। যেমন ভাবে রাখবেন তেমন ভাবেই থাকবো। আমার আবার মত কি।"

সেই নারী-আশ্রমে ওকে পৌঁছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তখন ও বেশ সুস্থ হয় নি। দেহ রক্তশূন্য, শরীর দুর্বল। আমি তাই আশ্রমে বলে দিলাম যে ওকে আপাতত একটু সাবধানে রাখতে হবে, সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে আসছে। ওর জন্যে আলাদা দুধের ব্যবস্থা করে দিলাম।

নিয়মিতভাবে খাওয়াবার জন্যে বলকারক ওষুধ প্রভৃতিও দিয়ে এলাম। তারা বললে, এখন ওকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হবে না, যত্ন করেই রাখবে।

তার পর দুই-একবার মাত্র সেখানে ওকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখা করাও কম হাঙ্গামা নয়, অনেকটা সময় নষ্ট হয়। প্রথমে আবেদন জানিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে হয়, আশ্রমকর্ত্রীর কাছে খবর যায়, তিনি হুকুম দিলে তবে উদ্দিষ্ট মেয়েটিকে বাইরের ঘরে ডেকে আনা হয়। যখন দেখলাম যে শরীর দুর্বল হলেও মোটামুটি সে ভালোই আছে এবং ওষুধপত্র ঠিকভাবেই খাচ্ছে, তখন আর সেখানে যাবার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

প্রায় একমাস-দেড়মাস এইভাবে কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর আমার ডাক্তারখানায় বসে আছি, মাথায় মস্ত পাগড়ি বাঁধা এক লম্বা-চওড়া পাঞ্জাবী যুবক এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে আমাকে অভিবাদন করলে। খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে—"আপনার কাছে আমার একটি প্রাইভেট আর্জি আছে, কখন আপনার সে কথা শোনবার সময় হতে পারে?"

আমি বললাম—"এখনই।" তখন কেউই সেখানে ছিল না।

সে বললে—"আমি আপনার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছি। যদি অনুমতি দেন তাহলে আপনার কন্যাটিকে বিয়ে করবার সৌভাগ্য আমার হতে পারে।"

আমি তো অবাক। আমার কন্যা! বললাম—"আপনি বোধ হয় কিছু ভুল করেছেন। কোথা থেকে কন্যার খবর জেনেছেন বলুন তো?"

সে বললে—"নারী-আশ্রম থেকে। সেখানে একটি মেয়েকে আমি দেখে এসেছি। আপনি তার গার্জেন, সে আপনার পালিতা কন্যা। তাকেই আমি বিয়ে করব বলে মনস্থ করেছি, কিন্তু আপনার অনুমতি ভিন্ন তা হতে পারে না। আশ্রমের লোকেরা সেই কথাই আমাকে বললে।"

তখন সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম তার কাছে। নারী-আশ্রমের এক নিয়ম আছে যে, কেউ যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওখান থেকে কন্যা বেছে নিয়ে বিবাহ করে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার জন্যে সেখানে কিছু চাঁদা দিতে হয়, আর কর্তৃপক্ষের ও অভিভাবকের অনুমতি নিতে হয়। চাঁদার টাকা জমা দিয়ে কন্যা বেছে নিতে চাইলে, বিবাহযোগ্যা সকল মেয়েকে সামনে এনে দাঁড় করানো হয়, তার মধ্যে যেটিকে খুশি বেছে নিতে পারা যায়। ঐ যুবকটি দেশ থেকেই এই নারী-আশ্রমের সন্ধান পেয়ে এখানে

এসেছে, অন্যান্য বাঙালী মেয়েদের মধ্যে নির্মলাকেই তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে।

যুবকের পরিচয় শুনলাম। পাঞ্জাব প্রদেশে গুরুদাসপুরের কাছে তার বাড়ি, বিয়াস নদীর ধারে। সেখানে ওদের কিছু ফলের বাগান আছে, ভেড়ার পশমের ব্যবসা আছে। ওর বাপ আছে, মা নেই। বাপ ওকে অনেকদিন থেকেই বলছে একটি বৌ ঘরে আনতে। কিন্তু ওদের দেশে মেয়ের বড়ো অভাব। অনেক টাকা দিয়ে ওখানে মেয়ে কিনতে হয়, কিন্তু তারা প্রায়ই হয় অতিশয় গোঁয়ার ও নোংরা। ও দেশের ভদ্রসমাজের লোকেরা প্রায়ই অন্যান্য প্রদেশ থেকে মেয়ে সংগ্রহ করে এনে বিবাহ করে, এটা ওদের দেশে চল হয়ে গেছে। বাঙালী মেয়ের উপরেই ওদের সবচেয়ে বেশী ঝোঁক, কারণ বাঙালী মেয়েরা যেমন নম্র ও ভদ্র হয়, তেমনি অতি পরিচ্ছন্ন। ওদের দেশের অনেকেই তাই নিজেদের জন্যে এই নারী-আশ্রম থেকে মেয়ে বেছে নিয়ে গেছে। এখান থেকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে তারা সকলেই খুব সুখী হয়েছে। বাঙালী মেয়েদের মতো বিশ্বস্ত ও সেবাপরায়ণ মেয়ে নাকি আর কোনো দেশে নেই, এই হলো ওখানকার লোকদের অভিমত.। সাংসারিক সুখ-শান্তির জন্যে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে বাঙালী মেয়ের সন্ধান করাই উচিত।

সব কথা শুনে আমি বললাম—"আমার অনুমতি দিতে কোনোই আপত্তি নেই, কিন্তু প্রথমে তার নিজের অনুমতি নেওয়া দরকার। সে যদি ওতে রাজী না হয় তাহলে কেবল আমার অনুমতি নিয়ে কোনো লাভ নেই।"

যুবক বললে—"আমি আগে তার অনুমতি জেনেই তবে আপনার কাছে এসেছি। সে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, আপনার আপত্তি না থাকলে তার কোনোই আপত্তি থাকবে না। আপনি যেমন হুকুম করবেন তাই সে শুনবে। সব-কিছু আপনারই হাতে।"

আমি বললাম—"তাহলে আমারও কোনো আপত্তি নেই। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে, তোমার কাছে গেলে সে খুব সুখেই থাকবে। কিন্তু একটা কথা, ও সম্প্রতি খুব একটা কঠিন রোগ থেকে উঠেছে, এখনও ওর শরীর খুবই দুর্বল। এই সময়ে বিবাহাদির হাঙ্গামা, তার পরে ট্রেনে অত দূর-দেশে নিয়ে যাওয়া, এতে ও হয়তো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।"

সে বললে—"আমি তা দেখেই বুঝতে পেরেছি, আর ওখানকার লোকেরাও সে-কথা আমাকে বলেছে। যদি সময় থাকতো তাহলে কিছুকাল

এখানে অপেক্ষা করে যেতাম। কিন্তু দেশে বুড়া বাপকে একলা ফেলে এসেছি। আর বুঝতে পারচেন তো, অত দূর থেকে আবার আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি এখনই এ-কাজ শেষ করে ফেলতে চাই। কোনো হাঙ্গামা হবে না, এখানে রেজিস্ট্রী বিবাহ করে ওকে রিজার্ভ-বার্থে খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে যাবো। ওখানে একবার গিয়ে পড়তে পারলে ওকে আঙুর-বেদানা আর খাঁটী ভঁইষা-দুধ খাইয়ে একমাসের মধ্যেই তাগড়া করে তুলবো। আমি দু'বছর পরে আপনার কাছে এনে ওকে দেখিয়ে নিয়ে যাবো, ওর চেহারা দেখে তখন আপনি চিনতেই পারবেন না। এখান থেকে যত মেয়ে ওখানে গেছে সকলেই স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। ওখানকার জলহাওয়া খুব চমৎকার।"

পাঞ্জাবের ঐ অঞ্চলের জলহাওয়া খুব ভালো সে-কথা আমিও শুনেছি। তা ছাড়া এ তো আনন্দেরই কথা, মেয়েটারও জীবনের একটা কিনারা হয়ে যাবে, আর ঘাড় থেকে দায়িত্বের বোঝা নেমে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারবো। কাজেই আমিও তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিলাম।

দুদিন বাদেই রেজিস্ট্রী ক'রে বিয়ে হয়ে গেল। আমাকেও রেজিস্ট্রী অফিসে যেতে হয়েছিল। অনেক পয়সা খরচ করে সেই পাঞ্জাবী যুবক বেনারসী জামা ও কাপড় কিনে দিয়েছিল; গলায় হার, কানে দুল, হাতে চুড়ি প্রভৃতি কিছু কিছু গহনাও দিয়েছিল। আশ্রম থেকে তারা নির্মলাকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনচর্চা, সিঁথিতে সিঁদুর। সেই অভাগিনী নির্মলাকে তখন যেন সত্যই চেনা যাচ্ছিল না। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম বেশ খুশিতে ভরা। বিবাহের পরে ওরা একসঙ্গে প্রণাম করলে। পাঞ্জাবী যুবকটি এক গরদের জোড় ও দশটি টাকা আমার পায়ের কাছে রেখে দিলে। এ আবার কি! সে বললে, শ্বশুরকে বিয়ের দিনে প্রণামী দিতে হয়, এটা ওদের দেশের দস্তুর।

পরের দিনে ট্রেনে ওদের তুলে দিয়ে এলাম। সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি রিজার্ভ-বার্থ নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বিস্তর জিনিসপত্র, নির্মলার জন্যে নতুন সুটকেস, ফল ও খাবারের টুকরি। ওরা দুজনে আমাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে যাবার পরেও নির্মলা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছলছল চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সারা দিন ধরে তার সেই দৃষ্টিটা বারে বারে মনে পড়তে লাগল।

দিন চারেক পরে আমার কাছে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। সেখানা পড়ে আমি চমকে উঠলাম। তাতে লিখেছে, নির্মলা হঠাৎ মারা গেছে, পরে

চিঠিতে সব কথা জানা যাবে। এ-কথা যেন আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

কয়েকদিন পরে এক চিঠি পেলাম। সে এমন বিচিত্র চিঠি যা পড়ে খুব করুণও মনে হতে পারে আর অবিশ্বাস্যও মনে হতে পারে। পাঞ্জাবী যুবক লিখছে—

"মাই ডিয়ার ফাদার-ইন-ল,

টেলিগ্রামে জানতে পেরেছেন যে নির্মলা আর নেই। গুরুদাসপুর স্টেশনে হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই সে প্রাণত্যাগ করল, তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি নি। অথচ চারদিন ট্রেনযাত্রার মধ্যে সে খুবই সুস্থ ছিল, আর বরাবর আমার সঙ্গে আদর্শ স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করেছিল। ওরই মধ্যে আমাদের ভাষা একটু-আধটু শিখে নিয়েছিল। খাবার সময় যত্ন করে আগে আমাকে খাইয়ে তবে সে খেতো, ঘুমের সময় আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিত। কখনো মুখ ভার করে থাকে নি। আলাপ করবার জন্যে খুবই আগ্রহ, কোন্‌টাকে কি বলে বারে বারে জিজ্ঞাসা করত। এমন শান্ত সরল মেয়ে আমি কখনো দেখি নি, নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছিলাম। মাত্র চারটি দিনেই মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পরিচয়। কিন্তু স্টেশনে নেমেই সে বুকে হাত দিয়ে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগল। কতকগুলি কথা বললে তা আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না, শেষ পর্যন্ত কেবল সে 'কাকাবাবু' নাম করে আপনাকে ডাকতে থাকল। ঐ কথা বলতে বলতেই তার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। ওখানকার ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি ডাকা হয়েছিল, সে বললে হঠাৎ হার্ট-ফেল করেছে।

—হতভাগ্য আপনার জামাতা"

এই জাতীয় বিড়ম্বনা, এও আমার ডাক্তারি অভিজ্ঞতার মধ্যে। অন্য কোনো ডাক্তারকে এই সব ভোগ করতে হয় কিনা জানি না, কিন্তু আমাকে অন্তত ভুগতে হয়েছে।

কিন্তু আমার একটা শিক্ষা হলো। দুবারই দেখলাম যে আমি চাইছি একরকম, কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তার ঠিক উল্টো রকম।

॥ নয় ॥

এই সময়ে একজন সাধুকে আশ্চর্যভাবে আরোগ্য করে আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। দুঃসাধ্য একটা রোগ আশ্চর্যভাবে সারাতে পেরে মনে করেছিলাম যে বড়ো বড়ো ডাক্তারের উপর টেক্কা দিয়েছি।

তিনি একজন খ্যাতনামা ধার্মিক ব্রহ্মচারী। অধিকাংশ লোকেই তাঁকে চেনে, সকলেই তাঁকে উঁচুদরের মানুষ বলে শ্রদ্ধাভক্তি করে। প্রকৃত নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী বলে তিনি সর্বমান্য, সকলের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারেন বলে রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে সবাই তাঁকে খাতির করে, কেউ তাঁর কথা সহজে ঠেলতে পারে না। সকলের কাছেই তাঁর প্রতিপত্তি, আর সকলের মঙ্গলের কাজ নিয়েই সর্বদা লেগে আছেন। যেখানে অন্নাভাব ও দুর্ভিক্ষ সেখানে তিনি তা সাধ্যমতো দূর করবার চেষ্টা করছেন, যেখানে বন্যা কিংবা মহামারী দেখা দিয়েছে সেখানে তিনি ছুটে যাচ্ছেন, যেখানে শিক্ষার অভাব সেখানে শিক্ষা-বিতরণের ব্যবস্থা করছেন, যেখানে লোকে উৎপীড়িত সেখানে গিয়ে নানা ভাবে চেষ্টা করছেন যাতে তার কিছু কিনারা হয়। কাজেই দেশের লোকে তাঁকে একজন কর্মযোগী সন্ন্যাসী বলেই জানে। তাঁর শিষ্যাদিও অনেক আছে, ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তাঁর উপদেশ-বাণী শুনতে সভা-সমিতিতে অনেক লোকের ভিড় হয়।

এই সাধু আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ইতিপূর্বে তাঁর নামও যথেষ্ট শুনেছি, আর তাঁর সঙ্গে আমার কিছু মৌখিক পরিচয়ও ছিল। পথে ঘাটে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যেতো। কিন্তু ইদানিং আর তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না, শুনেছিলাম তিনি অসুস্থ।

তাঁর এক শিষ্য ছিল আমার রোগী। তাকে আমি পুরোনো ডিস্‌পেপসিয়া রোগ থেকে আরোগ্য করেছিলাম। সেই অবধি আমার উপর তার খুবই বিশ্বাস ছিল। সে প্রায়ই এসে বলতো যে সাধু হার্টের রোগে কষ্ট পাচ্ছেন, অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তারকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করানো হচ্ছে, কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই কিছু উপকার হচ্ছে না। আমি শুনতাম, কিন্তু কিছু মন্তব্য করতাম না। হার্টের রোগ সত্যই দুরারোগ্য।

কিছুকাল পরে সেই লোকটি একদিন এসে বললে—"আপনি একবার চলুন, সাধুকে দেখবেন।"

আমি বললাম—"তা হয় না। আপনি বললেই আমি যেতে পারি না।

আর, যেখানে অন্য ডাক্তারে চিকিৎসা করছে সেখানে আমার যাওয়াই উচিত নয়। ডাক্তারি নীতিতে এটা নিষিদ্ধ।"

সে উত্তেজিত হয়ে বললে—"আরে মশাই, ও কথা কি আমি জানি না? আপনাকে কি অপমানিত হতে সেখানে নিয়ে যাবো? অনেকদিন পর্যন্ত অ্যালোপ্যাথী চিকিৎসা করিয়ে উপকার না পেয়ে তিনি এখন সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন। কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। ভদ্রলোক খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, অনেকে বলছে এমনি ভুগতে ভুগতে হঠাৎ একদিন হার্ট-ফেল করে মারা যাবেন। সে কষ্ট চোখে দেখা যায় না। কিছু খেতে পারেন না, উঠে দাঁড়াতে পারেন না, সামান্য একটু নড়াচড়াতেই বুকের কষ্ট হয়, ছট্‌ফট্ করতে থাকেন, রাত্রে পর্যন্ত ঘুম নেই। আমি তাই বললাম যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা যখন সবাই ফেল করলে, তখন আমাদের পাড়ার ছোটো ডাক্তারকেই একবার দেখান না। কিছুতেই কিছু যখন হচ্ছে না, তখন এতে ক্ষতি কি আছে। আমার এমন রোগটা যখন সে সারিয়ে দিতে পেরেছে, ভগবানের ইচ্ছা হলে আপনারটাও হয়তো সারিয়ে দিতে পারে। তিনি দুদিন পর্যন্ত আমার কথার কোনো জবাব দেন নি, দুদিন পরে আজ নিজে বলেছেন যে তাকে ডেকে নিয়ে এসো। তবেই আপনাকে ডাকতে এসেছি।"

অগত্যা সাধুকে দেখতে যেতে হলো। তিনি থাকেন তাঁর এক আশ্রম-বাড়িতে, ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে। ভক্তরা যথেষ্টই তাঁর সেবা করছে।

আমাকে দেখে তিনি একটু হেসে বললেন—"সব ডাক্তারকেই দেখানো হলো, কেউই কিছু করতে পারলে না। শেষ পর্যন্ত এখন তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম, দেখি যদি তুমি কিছু করতে পারো। মরে গেলে কোনো দুঃখ নেই, তার জন্যে আমি প্রস্তুতই আছি। কিন্তু এই যন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দাও, অন্তত কিছুটা এর কমিয়ে দাও, তার বেশি আর কিছু আমার চাই না।"

আমি যথারীতি তাঁকে পরীক্ষা করলাম। তার পরে বললাম, আজ পর্যন্ত কি কি চিকিৎসা করা হয়েছে, আর কি কি ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করানো হয়েছে সমস্তই আমার জানা দরকার।

ইঙ্গিতমাত্রেই একজন ভক্ত প্রকাণ্ড এক বাণ্ডিল এনে হাজির করলে। অফিসের ফাইলগুলো যেমন হয়, তেমনি। তাকে এক সুবৃহৎ দপ্তর বলা চলতে পারে। আমি নিবিষ্টমনে প্রত্যেকটি কাগজ উল্‌টে-পাল্‌টে দেখতে লাগলাম।

হার্টের ওষুধ, ব্যথা নিবারণের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ প্রভৃতি নতুন ও

পুরোনো যত রকমের আছে সমস্তই ব্যবহার করা হয়েছে। বলতে গেলে ডাক্তারি শাস্ত্রের কোনো ওষুধই বাদ যায় নি। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, এমন কি জাপানের পর্যন্ত নতুন নতুন কোম্পানীর নতুন নতুন ওষুধ সবগুলিরই নাম এই বাণ্ডিলের মধ্যে পাওয়া যাবে। আর অন্যদিকে রক্ত, মূত্র, থুতু, মল প্রভৃতি সব-কিছুরই ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করানো হয়েছে, তার রিপোর্টগুলি রয়েছে। কার্ডিওগ্রাফিও করা হয়েছে, হার্টের এক্সরে ছবিও নেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটি বা ছিদ্র নেই।

সব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মনে হলো, ডব্লু. আর. পরীক্ষার কোনো রিপোর্ট দেখছি না তো। সমস্ত কাগজগুলি খুঁজে দেখলাম, কোথাও তার উল্লেখ পেলাম না।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"ডব্লু. আর. পরীক্ষা কি কখনো করানো হয় নি?"

একজন ভক্ত হেসে বললে—"যে-সব বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা ওঁকে চিকিৎসা করার ভার নিয়েছেন তাঁরা কেউই হয়তো তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আপনি কি তার প্রয়োজন বোধ করছেন?"

আমি একটু বিব্রত হয়ে বললাম—"তা নয়, এখানে ঠিক প্রয়োজনের কথা নয়। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে-সব পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া চাই বলে নিয়ম আছে, তার কোনোটিকেই বাদ দেওয়া উচিত নয়। রোগীর শরীরে কোন্ দোষ আছে আর কোন্ দোষ নেই সে সম্বন্ধে যেন অন্ধকার কিছু থেকে না যায়, সকল বিষয়েই প্রমাণ পেয়ে স্থিরনিশ্চয় হয়ে চিকিৎসায় নামা দরকার, অন্ততপক্ষে এইরকম রোগের বেলাতে।"

আর একজন ভক্ত বললে—"সাধারণ মানুষের সম্পর্কে সেই কথাই ঠিক বটে, কিন্তু এই সাধু মহাপুরুষের সম্বন্ধে ও-পরীক্ষার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এঁর রক্তে সে-দোষ কিছু নেই বলেই আপনি ধরে নিতে পারেন। ঐসব বৈজ্ঞানিক তর্ক ছেড়ে আপনি এঁর কষ্ট নিবারণের উপস্থিত কিছু ব্যবস্থা করুন। সেইজন্যেই আপনাকে ডাকা হয়েছে।"

আমি বললাম—"আমাকে আপনারা অন্ধের মতো কাজ করতে বলছেন। অন্য ক্ষেত্রে হলে তাই হয়তো আমি করতাম। কিন্তু এখানে যখন এই একটা ত্রুটি আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে, তখন এটকুর সমাধান না করে আমি চিকিৎসার দিকে হাত দিতেই পারবো না।"

সাধু তখন নিজেই বিরক্ত হয়ে ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন—"যার হাতে চিকিৎসার ভার দিতে চাইছি, তার সঙ্গে কোনো রকমের তর্ক করতে যাওয়াই আমাদের মূর্খতা। ভার যখন একবার দিয়ে দিলাম, তখন থেকে আমার অন্ত কোনো কথা বলবার অধিকারই রইল না। উনি যখন সে ভার গ্রহণ করেছেন, তখন ওঁর যা খুশি তাই করবেন। তোমাদের কথা উনি শুনবেন কেন?—তুমি যদি ঐ পরীক্ষা করাতে চাও তাহলে এখনই তার ব্যবস্থা করতে পারো।"—এই কথা বলে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

আমার সঙ্গে ব্যাগ ছিল, তার মধ্যে টেস্ট-টিউবও প্রস্তুত ছিল। আমি তাঁর হাতের শিরা থেকে খানিক রক্ত টেনে নিলাম। রক্ত নেবার সময় আমার হাত কিন্তু খুব কাঁপছিল, মনে হচ্ছিল এর জন্যে আমাকে হয়তো হাস্যাস্পদ হতে হবে।

ল্যাবরেটরিতে সেই রক্ত পাঠিয়ে দিলাম। চারদিন বাদে রিপোর্ট এলো—ডব্লু. আর. 'স্ট্রং পজিটিভ'। অর্থাৎ যে রোগের আশঙ্কা করে এই বিশেষ রকমের পরীক্ষাটি করা হলো সেই রোগের বিষলক্ষণ এই প্রেরিত রক্তের মধ্যে পুরো-মাত্রাতেই বিদ্যমান।

রিপোর্টটি পেয়ে আমার মনে আনন্দের সীমা নেই। দোষ যখন খুঁজে পেয়েছি তখন সেই দোষ ধরে চিকিৎসা করলে রোগও নিশ্চয় সারবে। আমাকে আর আন্দাজে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। রোগও এখন নির্দিষ্ট, চিকিৎসার লক্ষ্যও নির্দিষ্ট, লক্ষ্যভেদী বাণও নির্দিষ্ট করা আছে, কেবল তার প্রয়োগের অপেক্ষা—চিকিৎসাতে সফল আমি হবোই।

কিন্তু রিপোর্টটি নিয়ে আমাকে মুশকিলে পড়তে হলো। কেমন করে এ-কথা জানানো যায় যে, ঐ সাধু ব্রহ্মচারীর রক্তের মধ্যে খারাপ রোগের বিষ রয়েছে! প্রকাশ্যে এ-কথা বলাই আমার উচিত নয়। রোগীর সম্বন্ধে যা গুপ্ত কথা তা সকলের কাছ থেকেই গোপন রাখতে হবে, এই হলো ডাক্তারের নীতি। এ নীতি আমি কিছুতে লঙ্ঘন করতে পারি না। আমাকে এ খবরটি গোপন রাখতেই হবে।

সেদিন অনেক রাত্রে আমি চুপি চুপি সাধুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একজন মাত্র লোক তাঁর কাছে তখন ছিল, আমি তাকে বললাম—"আমি ওঁকে একটু প্রাইভেটে পরীক্ষা করতে চাই।" সে লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

তার পর রিপোর্টটি পকেট থেকে বের করে তাঁকে দেখালাম।

তিনি রিপোর্ট দেখে প্রথমে কিছু বুঝতে পারলেন না। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এর অর্থ কি হলো?"

আমি বললাম—"আপনার রক্তে খারাপ রোগের বিষ পুরোমাত্রায় রয়েছে, রিপোর্টে সেই কথা বলছে।"

"কেমন করে এ বিষ রক্তের মধ্যে প্রবেশ করলো?"

"সে কথা আমি কেমন করে বলবো! বরং আপনি হয়তো বলতে পারেন, কোনোসময় যদি—"

তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুজে বসে রইলেন। তার পর চোখ চেয়ে বললেন—"আমার প্রথম যৌবনের কথা স্মরণ হচ্ছে। সে সময় আমি নিষ্কলঙ্ক ছিলাম না, চরিত্রের কিছু দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সে অবস্থাটা ছিল সাময়িক। আর সে হলো প্রায় বিশবছর আগেকার কথা। তা ছাড়া আমি জ্ঞানতঃ এইটুকু বলতে পারি যে কোনো খারাপ সংসর্গে যাই নি। আর খারাপ রোগ শরীরের মধ্যে ঢুকলে তখনই তো তার কিছু চিহ্ন বাইরে প্রকাশ পাবে? কিন্তু শরীরের কোথাও তেমন কোনো লক্ষণই কোনোদিন প্রকাশ পেতে দেখি নি। এতেই আমার খুব আশ্চর্য মনে হচ্ছে!"

আমি বললাম—"আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণটা যখনই ঘটবে, তার ফলও যে তখনই ফলবে এর কোনো মানে নেই। অনেক সময় এমন হয় যে এই রোগের জীবাণুরা শরীরের মধ্যে ঢুকে তখনই কিছু চিহ্ন প্রকাশ করলে না, কিন্তু কয়েক বছর পরে একেবারেই কোনো ভিতরের যন্ত্রকে আক্রমণ করলে। যেমন এখন আপনার হাটকে ধরেছে।"

"তাই হয়তো হবে। কিন্তু আমি তা ভাবছি না, আমি ভাবছি আমার নিজের কথা। আমি যখনই কেন দোষ করে থাকি, ফাঁকি দিয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। তার ফল আমাকে ভুগতেই হবে। অনেকদিন আগের কথা কিনা, আমি সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন সব মনে পড়ছে। নিজের উপর খুব অশ্রদ্ধা হচ্ছে, নিজেকে এমন করে আবার চিনতে পেরে। তুমিও নিশ্চয় মনে মনে আমাকে ঘৃণা করছ?"

"নিশ্চয়ই না। সকল রোগীকে আমরা রোগাক্রান্ত রোগী বলেই দেখি, তার ব্যক্তিগত দোষগুণের কথা নিয়ে মাথা ঘামাই না। আর আপনিই বা তা ভাববেন কেন? আপনি এখনকার মানুষটি আলাদা, আর তখনকার মানুষটি ছিলেন আলাদা। গোড়া থেকে সকলেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ হয়ে জন্মায় না। মানুষ গোড়ায় থাকে দুর্বল, তার পরে হয় সবল; গোড়ায় থাকে অন্ধ, তার

পরে হয় দৃষ্টিবান। এমনি করেই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ। আপনাকে আমি চিনি, জগতের কাজ কত করছেন জানি। আগেকার জীবনের কথা নিয়ে এখনকার জীবনের বিচার চলবে কেন? আপনারাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন বিল্বমঙ্গলের কথা, কত নীচে থেকে কত উঁচুতে মানুষ উঠতে পারে। মনে করুন, আমরা যদি শুনি যে বিল্বমঙ্গলের পরবর্তী জীবনে তাঁর রক্তের মধ্যে এইরকম দোষ পাওয়া গিয়েছিল, তাহলে কি তাঁকে অমনি অশ্রদ্ধা করতে শুরু করবো?"

ব্রহ্মচারী আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে বললেন—"এটি খুব চমৎকার কথা বলেছ। আজ তোমার কাছ থেকে একটি নতুন কথা শুনলাম। কিন্তু এ খবর তুমি আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তিকে জানানো উচিত নয়, কি বলো? একজন জানলেই পাঁচজন জানবে। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হবে। কেউই আমার কথা তখন মানবে না; বলবে—এটা ভণ্ড, দুশ্চরিত্র। তাতে সাধারণের যে কাজে আমি নেমেছি সে-কাজ একেবারেই পণ্ড হয়ে যাবে। তখন ছিলাম অসাধু আর এখন হয়েছি সাধু, এ কথা বললে সাধারণের মধ্যে কেউই মানবে না।"

আমি বললাম—"কাউকেই জানাবার দরকার নেই। আমি আজ রাত্রে এখনই আপনাকে একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে যাচ্ছি। তাতে আপনার খুব জ্বর হবে। কাল সকালে সবাই জানবে যে আমি কিছু ইন্‌জেকশন দিয়েছি, তার জন্যেই জ্বর হয়েছে। এর এক সপ্তাহ পরে আবার একটা ইন্‌জেকশন দেব। কি দিচ্ছি আর কি করছি তা কাউকে জানাবার কি দরকার?"

"কিন্তু ওতে রোগটা সারবে কি?"

"আশা তো করি। ধরা যখন পড়েছে তখন এবার সারতেই হবে।"

"একটা ইন্‌জেকশনেই কি উপকার বুঝতে পারবো?"

"আশা তো করি তাই। দেখুন-না কি হয়।"

"একটু যদি সুস্থ হতে পারি তাহলে এর পরে তোমার ওখানে গিয়েই ইন্‌জেকশন নিয়ে আসতে পারবো। তোমাকে আর এখানে আসতে হবে না।"

সেই রাত্রেই তাঁর শিরার মধ্যে আর্সেনিকের ইন্‌জেকশন দিলাম।

ভদ্রলোক আশ্চর্যরূপে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। এক সপ্তাহ পরে তিনি গাড়ি করে নিজেই এলেন আমার ডাক্তারখানাতে। ডাক্তারখানার পাশে একটি আলাদা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে, স্ত্রীলোক রোগীরা এলে সেখানেই তাদের দেখি, আর রাত্রিকালে কম্পাউণ্ডার সেখানেই শুয়ে থাকে। আমি

তাঁকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে ইন্‌জেক্‌শন দিলাম, তার পর গাড়ি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

মোটের উপর বারোটি ইন্‌জেকশন তাঁকে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকেই উৎসুক হয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে ওঁকে কিসের ইন্‌জেকশন দিয়েছি, কোন্ চিকিৎসায় ওঁকে আরাম করেছি। আমি এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিতাম। এমন কি যে লোকটি আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকেও কোনো কথা বলি নি। তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকেই বলি নি।

এই সাধুটিকে আরোগ্য করে আমি খুব তৃপ্তি লাভ করেছিলাম, আর মনে মনে যে আমার গর্ব হয়নি এ-কথা বললে মিছেকথা বলা হবে। বারে বারেই আমার মনে এই ভাবের উদয় হতো যে, অন্যান্য ডাক্তার যা পারে নি আমি তা পেরেছি। আমি না চিকিৎসা করলে এই লোকহিতৈষী সাধুটি নিশ্চয় মারা যেতেন।

কিন্তু সত্যই কি তাই? আমার কৃতিত্ব ওখানে কতটুকু, আমার নিজের হাত ওর মধ্যে কতটুকু ছিল? দৈবাৎ আমার মাথায় ঢুকে গেল যে রক্তের ঐ বিশেষ রকমের পরীক্ষাটি করা দরকার, তবেই আমি সাফল্যের সঙ্গে রোগটি আরোগ্য করতে পারলাম। যদি ঐ কথাটি আমার মনে না হতো তাহলে আমিও অন্যান্যদের মতো সকল চেষ্টায় বিফল হতাম। আর এ না-হয় বোঝা গেল যে রোগের মূল কারণটি ধরতে পারা যায় নি বলেই চিকিৎসায় তাঁর এ-পর্যন্ত কোনো ফল হয় নি। কিন্তু যেখানে অমন কোনো কিছুই জটিলতা নেই, রোগও স্পষ্টভাবে জানা আছে, তার ওষুধও জানা আছে, সেই ওষুধ যথারীতি প্রয়োগও করে যাচ্ছি—তবু কেমন করে মৃত্যু এসে রোগীকে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে কোথায় থাকে আমার কৃতিত্ব? এ তিক্ত অভিজ্ঞতা পেতে আমার বেশিদিন বিলম্ব হয় নি। কিছুকালের মধ্যেই উল্টো দুই রকমের দুটি অভিজ্ঞতা আমার মিলে গেল।

প্রথমে আমার এক বন্ধুর কথা বলছি। ডাক্তারি পাস করার আগেই যে ছিল আমার-পাড়ার বিশিষ্ট বন্ধু। বেশ বিদ্বান ছেলে, কিন্তু তার ছিল হাঁপানি রোগ। ডাক্তারখানা খোলার পর থেকেই সে আমার কাছে এসে ইন্‌জেকশন নিতো, তাতেই তখনকার মতো আরোগ্য হয়ে যেতো। কয়েক মাস অন্তর মাঝে মাঝে তার এমনি হাঁপানির আক্রমণ হতো, কিন্তু তার জন্যে সেও কোনোদিন চিন্তিত হয় নি, আমিও হই নি। রোগও জানা আছে, ওষুধও

জানা আছে, ভাবনার কিছু নেই। এমন হাঁপানির ধাত অনেকেরই থাকে, কোনো প্রকার ঋতুর গণ্ডগোল কিংবা খাদ্যের গণ্ডগোল হলেই তা দেখা দেয়। এই ধাত নিয়েই তারা সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, এবং দেখা যায় যে তারা বাঁচেও অনেককাল।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পরে সেই বন্ধুটির হাঁপানির হঠাৎ কিছু জোরালো রকমের আক্রমণ হলো। সে নিজে ডাক্তারখানায় আসতে পারলে না, আমাকে ডেকে পাঠালে। নিজে গিয়ে তাকে ইন্‌জেকশনটি দিয়ে এলাম। একটু অধিক রাত্রে বাড়ি যাবো মনে করে ডাক্তারখানা বন্ধ করতে যাচ্ছি, আবার সেখান থেকে ডাক এলো, হাঁপানি এখনও কমে নি। আবার সেখানে গেলাম এবং এবার ডবল মাত্রায় ইন্‌জেকশন দিলাম। কিন্তু রাত্রে দুই ঘণ্টা পরে আবার ডাক এলো, তখনও হাঁপানির কষ্ট কিছুমাত্র কমেনি। এবার গিয়ে অন্যরকম একটি ইন্‌জেকশন দিলাম। এবার নিশ্চয় কমবে বলে আমি চলে এলাম। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে আবারও আমাকে যেতে হলো। সেখানে গিয়ে দেখি, বন্ধুটি রীতিমত শ্বাস টানছে, বসে থেকেও দম নিতে পারছে না। আমি যাবার সঙ্গে সঙ্গে আরো একজন ডাক্তার এসে হাজির হলেন, ওরা তাঁকেও ডেকে এনেছে। কঠিন অবস্থা, যেমন করে হোক কষ্টের উপশম করা দরকার।

তখন দুজনে মিলে আমরা পরামর্শ করলাম এ-অবস্থাতে কি করা যায়। ডাক্তারটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কি ইন্‌জেকশন বা ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। সবই আমি বললাম। তিনি বললেন—"যা যা দেওয়া উচিত ছিল সবই দেওয়া হয়েছে, তাতে যখন কিছু ফল হলো না, তাহলে আর কি করা যেতে পারে?" আমি বললাম, একমাত্র বাকী আছে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন। তাই দিলে নিশ্চয় এই কষ্ট কমে যাবে, আর রোগী সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি বললেন—"ঠিক কথা, মর্ফিয়া ছাড়া এখন আর অন্য কোনো উপায় নেই, এখনই দিয়ে দাও।" তিনি ছিলেন আমার চেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। দুজনের একই মত হওয়াতে আমি একটি মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই তার ফল হতে দেখা গেল। রোগীর কষ্ট কমে গেল, সে নিজেই বললে—"এখন একটু আরাম পাচ্ছি।" তার পর সে বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

কিন্তু ভোরের বেলা ওরা আবার আমাকে ডাকতে এলো, বললে যে রোগী একেবারে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। গিয়ে দেখি সেই অন্য ডাক্তারটিও এসে হাজির হয়েছেন। দুজনেই আমরা রোগীকে পরীক্ষা করতে গেলাম। কিন্তু

বুকে স্টিথোস্কোপ বসাবার প্রয়োজন হলো না, চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম যে রোগীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একেবারে থেমে গেছে।

বদনাম হলো আমারই। আমিই মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছি। অথচ সে-সময়ে তাই দেওয়া ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না, অন্য কোনো-কিছুর দ্বারাই তার কষ্টের লাঘব করতে পারতাম না। এ-সময়ে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিতেই হয়, বইতেও পড়েছি, এবং হাসপাতালেও বহুবার তাই করেছি। সামান্য আধ গ্রেন মর্ফিয়াতে কখনো কারও অনিষ্ট হতে দেখি নি। অন্যান্য অভিজ্ঞ ডাক্তারদের আমি এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম। তাঁরা সকলেই বললেন যে চিকিৎসার দিক থেকে ঠিকই করা হয়েছিল, কিন্তু বোধ হয় অতিরিক্ত হাঁপানির কষ্টে হার্ট যন্ত্রটি খুব কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই মর্ফিয়ার দরুন যে ক্ষিপ্র প্রতিক্রিয়া ঘটল তা আর হার্ট সহ্য করতে পারলো না। একে একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা আকস্মিক ব্যাপারই বলা যেতে পারে। এমন অঘটনের উপর কারোরই কোনো হাত নেই।

কিন্তু এ-কৈফিয়ত সাধারণের কাছে খাটে না, সুতরাং আমি কাউকে কিছু বললাম না। বদনাম আমার ছড়াতেই থাকলো। পরের বদনাম করে বেড়ানো, বিশেষত একজন ডাক্তারের বদনাম করতে পারা অনেকের কাছেই বেশ উপভোগ্য জিনিস। অমুক ডাক্তার অমুক ইন্‌জেকশনটি যেমনি দিলে, আর সিরিঞ্জের ছুঁচ টেনে বের করতে-না-করতে জ্যান্ত মানুষটা ছট্‌ফটিয়ে মরে গেল, অনেক শাখা-প্রশাখা জুড়ে দিয়ে এই ধরণের বিস্তারিত আলোচনা অনেকের কাছেই মুখরোচক। তারা যেন উত্তেজিত হয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করবার মতো একটা খোরাক পেয়ে যায়। অবসরের সময়টা এই নিয়ে বেশ কাটাতে পারা যায়। এবং তারাই আবার আমার কাছে এসে ইনিয়ে-বিনিয়ে শোনাতে থাকে যে, অমুক লোকটা আপনার বিরুদ্ধে এইসব বদনাম রটাচ্ছিল, আমি তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি, ইত্যাদি। এ-অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্টই হয়েছিল, সুতরাং কোনো কথারই আমি কিছু জবাব দিতাম না। বদনামকে যতই চাপা দিতে চেষ্টা করা যাবে ততই তার প্রতাপ আরো বেড়ে যেতে থাকবে, খড়ের আগুনে দু বালতি জল ঢেলে নিবোনোর চেষ্টা করতে গেলে যেমন হয়। পাড়ায় আমার প্রসার-প্রতিপত্তি অবশ্যই কিছু কমল, কিন্তু তার আর কি করা যাবে। চুপচাপ থেকে একে ভাগ্য বলেই হজম করে নিলাম।

কিন্তু এর কিছুকাল পরেই রাত্রে আমার জরুরী ডাক পড়ল, ঐ মৃত বন্ধুরই

অন্য এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানেও রোগপীড়া হলে আমাকেই ডাকা হতো, আমার প্রতি তাদের খুব বিশ্বাস ছিল।

সেখানে গিয়ে দেখি, এও প্রায় একই রকমের ব্যাপার। বরং তার চেয়ে আরো বিপজ্জনক অবস্থা। এক বর্ষীয়সী মহিলা—আগের থেকেই তাঁর হার্টের অবস্থা খারাপ ছিল, তার উপরে এখন হাঁপানির কষ্ট শুরু হয়েছে। সম্ভবত হার্টের দরুনই এই অবস্থা। বুকে দারুণ কষ্ট হচ্ছে, তার উপরে তিনি মোটে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। বসে বসে হাঁপাচ্ছেন, গলায় সাঁই-সাঁই শব্দের সঙ্গে একরকম ঘড়্-ঘড়্ শব্দ হচ্ছে। এখানে খুবই বুঝেসুঝে কাজ করতে হবে যাতে হঠাৎ হার্ট-ফেল না করেন। তা করবার খুবই সম্ভাবনা।

কি করা যায়! হাঁপের কষ্ট কমানোর ওষুধগুলি দিয়ে আর কিছুক্ষণের জন্যে অক্সিজেন দিয়েও দেখলাম, তাতে কিছুই ফল হলো না। এদিকে এমন কঠিন অবস্থাতে রোগীকে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যায় না, তাতেও হার্ট-ফেল হয়ে যেতে পারে। এ-কষ্ট নিবারণ করার একমাত্র উপায় হলো মর্ফিয়া। এমন নিদারুণ কষ্টের অবস্থা দেখেও তা যদি না দেওয়া যায়, তাহলে রোগীর প্রতি নৃশংসতা করা হয়। একজনকে মর্ফিয়া দিয়ে সে মারা গেছে বলে সেই দৃষ্টান্তে আমি অপরের প্রতি নৃশংসতা করতে পারি না। আমি তখন বাধ্য হয়ে বললাম—"এখন মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিতে হবে, তা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই।"

রোগিণী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—"তাহলে শিগ্‌গির তাই দিয়ে দাও বাবা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

তাঁর আত্মীয়েরাও সকলে ব্যস্ত হয়ে বললে—"যা ভালো বোঝেন তাই এখনই দিয়ে দিন, অনর্থক দেরি করছেন কেন?"

আমি মর্ফিয়া ইন্‌জেকশনটি প্রয়োগ করলাম, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। দেবামাত্রই কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর সকল কষ্টের লাঘব হয়ে গেল। তিনি সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাড়ির সকলে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি কই! এই ঘুম যদি মৃত্যুর ঘুমে পরিণত হয়! ছেলেটির বেলাতে যে সেইরকমই হয়েছিল। আমি ওদের তাই স্পষ্টই বললাম—"রাত্রে আমাকে ওঁর কাছেই থাকতে হবে, কারণ এখন সুস্থ হলেও পরে হার্ট-ফেল করার আশঙ্কা আছে।"

কথাটা শুনিয়েই রাখলাম। অতঃপর সেই ব্যবস্থাই করা হলো।

সারা রাত্রি আমি রোগিণীর পাশে বসে রইলাম। তিনি সারা রাত ঘুমিয়ে

কাটালেন, কিন্তু আমি সারা রাত জেগেই বসে কাটালাম। মাঝে মাঝে তাঁর নাড়ি টিপে দেখি, নাড়ি ঠিক চলছে কিনা ; বুকে হাত দিয়ে দেখি, হার্ট চলছে কিনা। সকালে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল তখন কোনো কষ্টই আর নেই। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। হাতের কাছে ছিল হার্টকে সতেজ করবার অনেক জিনিস, তার একটাও ব্যবহারে লাগল না।

এঁরা সকলে আমার সুখ্যাতি করলেন। রোগিণীকে আশ্চর্যরূপে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে সুখ্যাতি বাইরের অন্য কেউ যেন তেমন কানেই নিলে না। এও আমার জানা হয়েছিল। কুখ্যাতি জিনিসটা যেমন মুখরোচক, সুখ্যাতি জিনিসটা তা কখনই নয়। একজন লোককে দোষী 'প্রতিপন্ন করা খুব সহজ, কিন্তু নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারা খুবই কঠিন। দোষের বেলা মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি খোলে, গুণের বেলা সে অন্ধ হয়ে যায়।

॥ নয় ॥

আট-নয় বছর একভাবে শিক্ষকতার কাজ করবার পরে আমার চাকরিতে অন্যত্র বদ্‌লি হবার সময় এলো। সরকারী চাকরির নিয়মই এই, কাউকে তারা স্থায়ীভাবে এক স্থানে রাখে না, কিছুকাল পরেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদ্‌লি করে দেয়। আমার কাছে খবর এলো, এবার এখান ছেড়ে অন্যখানে অন্য কাজে মফঃস্বলে যেতে হবে।

কোথায় যেতে হবে? শুনলাম যে কলকাতা ছেড়ে ঝাড়গ্রামে। শিক্ষকের কাজের বদলে মহকুমা-ডাক্তারের কাজ। তবে তা বেশিদিনের জন্যে নয়, মাত্র একমাসের জন্যে। সেখানে যিনি ডাক্তার আছেন তিনি একমাসের জন্যে ছুটি নিচ্ছেন, তাই একমাস তাঁর জায়গাতে আমাকে কাজ করতে হবে।

কিন্তু আমার কলকাতার প্র্যাক্‌টিসের কি হবে? সে দিকের উপার্জন আপাতত আমাকে ছাড়তেই হবে। চাকরি বজায় রাখতে গেলে সব দিকেই সুবিধা ভোগ করবো এমন বরাবর হতে পারে না। অগত্যা আপাতত আমার কলকাতার প্র্যাক্‌টিস বন্ধ রাখতেই হলো। ডাক্তারখানাতে আমার জায়গাতে অন্য একটি বন্ধুকে বসিয়ে দিয়ে আমি তল্পিতল্পা বেঁধে ঝাড়গ্রাম যাত্রা করলাম।

ঝাড়গ্রাম তখন খুব জঙ্গল জায়গা। সবেমাত্র একটি নতুন মহকুমায় পরিণত হয়েছে। চারিদিকে বিরাট বিরাট শালবন. একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত

বিস্তৃত। স্টেশনের কাছাকাছি কতকটা দূর পর্যন্ত স্থান পরিষ্কৃত করা হয়েছে, তার মধ্যেই আছে আদালত, পোস্ট-অফিস, হাকিম মুন্সেফ ও ডাক্তারের বাংলো, খানিক দূরে ছোটো একটি হাসপাতাল, এবং ওরই মধ্যে যা কিছু লোকালয় ও দোকানপাট। হাসপাতালের পর থেকে শুরু হয়েছে কেবলই শালবন। তার মধ্যে বহু দূর-দূরান্তর ছোটো ছোটো এক-একটি গ্রাম। ঝাড়গ্রামে সেখানকার রাজার এক বাড়ি আছে, কিন্তু সে হলো স্টেশন থেকে অনেক দূরে। রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি যাতায়াত করে, সাইকেলও চলে। কিন্তু তা ছাড়া সেখানে আর কোনো যানবাহন তখন হয় নি।

আমি যাবার সময় ভেবেছিলাম যে, না-জানি সেখানে আমাকে কতই পরিশ্রমের কাজ করতে হবে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, যা মনে করেছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজ বলতে কিছুই নেই। দাতব্য ডাক্তারখানা একটি অবশ্য আছে। একজন কম্পাউণ্ডার আছে, কিন্তু তারও বিশেষ কোনো কাজ নেই। দূর দূর গ্রাম থেকে দুই-চারজন রোগী আসে, সামান্য সামান্য রোগের ওষুধ নিয়ে চলে যায়। জায়গাটা বেশ স্বাস্থ্যকর, এমন কি ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সেখানে নেই। যে ডাক্তারবাবুটি সেখানে ছিলেন তিনি আমাকে সব কিছুর চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—"কাজ কিছুই এখানে নেই, আসর জাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকা। আর অফিসারদের বাড়িতে কারও অসুখ হলে সেখানে একটু দেখাশোনা করা। একটা মাস এখানে এইভাবেই থেকে যান, মনে করুন চেঞ্জে বেড়াতে এসেছেন। এখানে দুধ-ঘি খুব সস্তা। আর অল্প দামে প্রচুর মুরগি মিলবে, যদি আপনার তাতে কোনো আপত্তি না থাকে। আর আমি একটু বাগান করেছি, সেটুকু দেখবেন, যেন জলের অভাবে নষ্ট হয়ে না যায়। অফিসারদের সঙ্গে একটু ভাবসাব করে নেবেন, সন্ধ্যার পরে তাঁদের ওখানে গিয়ে আড্ডা দেবেন। আমিও তাই করতাম।"

কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম! একমাস এই ভাবে এই জঙ্গলের মধ্যে থাকলে শেষ পর্যন্ত ডাক্তারিই ভুলে যাবো। কিন্তু কোনো উপায় নেই, সরকারী চাকরি যখন নিয়েছি তখন সবরকমই সয়ে যেতে হবে।

দিন আর কোনোমতে কাটতে চায় না। পাখির ডাক শুনে, আর জানালা দিয়ে সূর্যোদয়ের প্রথম আলো চোখে লেগে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায়। বাংলো থেকে বেরিয়ে স্টেশন পর্যন্ত হেঁটে যাই। কলকাতা-যাত্রী বোম্বে মেল ঐ সময় ওখানে কয়েক মিনিটের জন্তে দাঁড়াতো। কলকাতায় কোনো চিঠি দেবার থাকলে গাড়ির ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আসি। তার পর চেয়ে চেয়ে দেখি

সদ্য-ঘুমভাঙা যাত্রীরা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। মুখে তাদের আসন্ন মিলনানন্দের ঔৎসুক্য। কেউ কেউ হয়তো আসছে বিলেত থেকে, কেউ বা বোম্বাই থেকে, কেউ বা নাগপুর-অঞ্চল থেকে। সকলেই যাচ্ছে কলকাতায়। সেখানে রয়েছে ওদের প্রিয়জনেরা, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ওরা তাদের কাছে পৌঁছে যাবে, তখন তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আনন্দের অন্ত থাকবে না। কিন্তু আমার ঐ-ট্রেনে ওঠবার কোনো উপায় নেই, কলকাতায় আমার যাবার কোনো রাস্তাই নেই। এখানকার এই ঘাঁটি আগ্‌লে আমাকে একমাস কাল এখানেই কাটাতে হবে। দুঃখের একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাড়ির ভেণ্ডারের কাছ থেকে একখানা পাঁউরুটি কিনে নিয়ে আমি বাসায় ফিরি।

বাসায় আছে একজন চাকর আর রাঁধুনি। তারা তখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের না জাগিয়ে আমি নিজেই স্টোভ জ্বেলে চা তৈরি করে খাই।

বেলা হলে ধড়াচূড়া এঁটে একবার ডাক্তারখানায় যাই। ধড়াচূড়ার যদিও এখানে কোনোই দরকার নেই, আগেকার ডাক্তারবাবু ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই কাজে যেতেন, কিন্তু অভ্যাসটা আমি বজায় রাখতে চাই, সকালে প্যাণ্ট-কোট চড়িয়ে প্রত্যহ বেরোনোর সেই বহুদিনের অভ্যাসটা। সেখানে গিয়ে চেয়ারে বসে শুধু কাগজ পড়ি। দুটি-একটি রোগী যারা আসে, তাদের সঙ্গে দু-একটি কথা বলে ওষুধ লিখে দিই। আবার কাগজ পড়ি। বেলা এগারোটার মধ্যে কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত সমস্তই আগাগোড়া পড়া হয়ে যায়, কিছুই আর বাকী থাকে না। তখন অগত্যা উঠে পড়ি, ধীরে-সুস্থে বাসায় ফিরে আসি।

অতঃপর নাওয়া খাওয়া এবং ঘুম। কিন্তু কতই-বা ঘুমোনো যাবে। কিছুক্ষণ বইটই দিয়ে নাড়াচাড়া করি। বিকেল হলে চা খেয়ে আর-একবার যাই ডাক্তারখানায়। কিন্তু বিকেলের দিকে জনপ্রাণীও সেখানে আসে না। কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাঘুরি করে আবার বাসায় ফিরে আসি। আবার এক কাপ চা খাই। এও তখন একটা কাজ।

কিন্তু তার পরে কি-বা করা যায়! সময় যে কিছুতেই কাটতে চায় না। বারে বারে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, কখন সাতটা বাজবে। সাতটা বাজলে অফিসার বাবুরা নিশ্চয় আড্ডা জমাবার মতো অবসর পাবেন, তখন তাঁদের ওখানে গিয়ে হাজির হবো।

একদিন গেলাম হাকিম-সাহেবের বাংলোতে। নিতান্ত অল্পবয়সী একজন আই. সি. এস., বোধ করি এই প্রথম একটি মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। বাঙালীরই ছেলে, কিন্তু বাংলা বলেন খুবই কম, যেটুকু বলেন সেটুকু বাঁকা-

বাঁকা। মুখে সর্বদাই পাইপ লাগানো থাকে, তারই পাশ থেকে দাঁত ফাঁক করে ঠোঁট বেঁকিয়ে তিনি সামান্য কিছু বলেন, কি বলছেন তারও অনেকখানি বোঝা যায় না। হাকিমী চালটুকু বজায় রাখতে সব সময়েই সন্ত্রস্ত, পাছে কিছু বেচাল হয়ে যায় সেদিকে সর্বদা নজর থাকে। তাঁর স্ত্রী আছেন সঙ্গে। তিনি অভিজাতগর্বিতা, নিজেকে ভাবেন অতুলনীয়া, কোঁচানো শাড়ি আর হিল্-তোলা জুতো পরে যথেষ্ট ঘষেমেজে সর্বক্ষণই ফিট্‌ফাট্ থাকেন। স্বামী ছাড়া দ্বিতীয় কারও সঙ্গে তিনি মেশেন না বা কথা বলেন না। বিকেলে রোজ স্বামীর সঙ্গে একটু বেড়াতে বেরোন, শালবনের ধার দিয়ে, ডাক্তারখানার আশপাশ দিয়ে। রোজই দেখতে পাই নিঃশব্দে তাঁরা একজোড়ে চলেছেন। মনে মনে ভাবি, নিশ্চয় এঁদের মনের খুব মিল আছে, কথা বলার দরকারই হয় না, কথার আলাপ দিয়ে বুঝি ফাঁক ভরাতে হয় না।

সাহেবের বাংলোতে উপস্থিত হয়ে দূর থেকেই শুনতে পেলাম, ভিতরে পিয়ানো বাজছে। হাকিম-গৃহিণী একা একা পিয়ানো বাজিয়ে চলেছেন, বেসুরো বেতালা। বোধ করি নিজের টুং-টাং ও যথেচ্ছ সুরবিন্যাস শুনে নিজেই তিনি পরিতৃপ্ত হচ্ছেন। এদিকে সাহেব বসে আছেন বাইরের বারান্দায়, মস্ত ডুম্-দেওয়া ডবল-বাতি আলো জেলে বসে তিনি কি একটা বই পড়ছেন। মুখে রয়েছে সেই টোব্যাকো পাইপ।

আমাকে সেখানে উপস্থিত হতে দেখেই তিনি বইখানি মুড়ে রাখলেন। তাঁর স্বকীয় বাংলায় বললেন—"আসুন ডক্টর, কোনো জরুরী কেস্?"

আমি বললাম—"তা কিছু নয়, আমি এমনিই আপনার সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপ করতে এসেছিলাম।—এ সময়টাতে কাজ তো কিছু নেই—"

"বসুন বসুন! আজকের স্টেটস্‌ম্যান পেপার পড়বেন?"—বলে তিনি কাগজখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

অগত্যা সেখানে বসে কাগজ পড়তে থাকলাম। তিনিও তাঁর বইখানি খুলে আবার পড়তে শুরু করলেন। খানিক বাদে মুখ তুলে বললেন—"এক কাপ চা আনতে বলি?"

আমি বললাম—"মাপ করবেন, এইমাত্র বাসা থেকে খেয়ে আসছি।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার তিনি একটি কথা বললেন—"আপনার বুঝি কলকাতাতেই থাকা হয়?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ।" আবার তার পর চুপচাপ।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তিনিও কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না, আর আমিও

কি আলাপ করবো বুঝতে পারছি না। কাজেই কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম—"আজ তাহলে আসি।"

"আচ্ছা, আসুন আসুন।"

এর পরে আর সেখানে কোনো আকর্ষণেই যাওয়া চলে না।

আর একদিন গেলাম প্রথম মুন্সেফের বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি খুব জমাটী দাবার আড্ডা বসেছে। দুজন মানুষ খেলছে, আর চারজন চারিপাশে ঝুঁকে বসে পরম আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। আমি যেতেই সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। অভ্যর্থনা করে মুন্সেফবাবু বললেন—"এই যে ডাক্তার সায়েব, আসুন আসুন! দাবা খেলা একটু-আধটু আসে তো?"

আমি বললাম—"না, ওটা এখনও শিখতে পারি নি।"

"তা হোক, বসে যান এইখানে। দু-চারদিন দেখতে-দেখতেই শেখা হয়ে যাবে, তখন আমরাই আপনার কাছে হার মানবো। কিছুই না, একটু মনোযোগ দিলেই বেশ বুঝতে পারবেন। ওরে, আরো এক কাপ চা নিয়ে আয়—"

সেদিন দুই ঘণ্টা যাবৎ বসে বসে খেলাই দেখলাম। কিন্তু ওতে আমার একটুও মন লাগল না। পরের দিন আর গেলাম না।

একদিন গেলাম দ্বিতীয় মুন্সেফের বাসায়। তাঁর এক বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। সে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কসরত করে, সম্ভবত পণের দর কমাতে। মেয়েটির গলা কর্কশ, তার উপর গানের সুর-তালেও অনেক ভুল থাকে। কিন্তু তার সঙ্গীতরসজ্ঞ পিতা তাই শোনেন মুগ্ধ হয়ে, চোখ বুজে বসে। গানটি শেষ হলে তিনি চোখ আবার খোলেন; বলেন, "আজ খুব ভালো গেয়েছিস, আর একখানা গা শুনি।" আবার তিনি চোখ বুজে বসেন।

আমি যেতেই ভদ্রলোক খুব অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন—"এসেছেন—ভালোই হয়েছে, আমার মেয়ের দুখানা গান শুনুন। গা তো সেই গানটা। রবীন্দ্রসঙ্গীত বোঝেন তো? শুনুন আমার মেয়ের মুখে।"

গান শুনতে বসলাম। হার্মোনিয়মের উপর স্বরলিপির বইখানি খোলা রয়েছে, সেই দিকে চোখ রেখে মুন্সেফ-কন্যা সচিৎকারে পাড়া মাৎ করে গানের কথাগুলিকে নির্মমভাবে আবৃত্তি করে চলেছে—"কোন নব চঞ্চল ছন্দে মোর বীণা—।" তার মধ্যে দরদের কোনো নামগন্ধ নেই। গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছে, তখন সে স্বরলিপিতে একবার চোখ ফিরিয়ে

দেখে নিচ্ছে। আর হার্মোনিয়মে যদি-বা কখনো ঠিক সুরটি বাজছে, কিন্তু গলায় যা ধ্বনিত হচ্ছে সে তার থেকে অন্যরকম। গান কিন্তু তাতে ব্যাহত হচ্ছে না, সপ্রতিভ ভাবেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

গানটি শেষ হলে মুন্সেফবাবু চোখ খুলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন শুনলেন বলুন!"

আমি বললাম—"চমৎকার।"

"দেখলি তো, গলা তোর আজ উৎরে গেছে। আর একখানা গা।"

মেয়েটি তার ঝাঁজালো কণ্ঠে আরো ঝংকার দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করলে—"আজি দখিন দুয়ার খোলা, এস হে এস হে আমার বসন্ত এস।" প্রাণ আমার পরিত্রাহি করতে লাগল, ডাক্তারদের অতি-পরিচিত অন্য একরকমের দখিন-দুয়ারের কথা আর অন্য একরকম বসন্তের কথা স্মরণ হতে লাগল। তার পরে যখন "পিয়াল ফুলের রেণু"—লাইনটা এলো, তখন একেবারে দম বন্ধ হবার উপক্রম, কেউ যেন আমারই টুঁটি টিপে ধরছে। তথাপি আশ্চর্য কথা এই যে, নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখটি করে আমি নির্বিকার হয়ে বসেই রইলাম। মানুষ কতদূর পর্যন্ত কী না সহ্য করতে পারে!

আবার যখন একটি শুরু করতে যাচ্ছে তখন কিন্তু উঠে পড়লাম।

আমি যখন উঠে আসি তখন মুন্সেফবাবু বিশেষ করে বলে দিলেন—"কাল আবার আসা চাই। ও-সব দাবার আড্ডায় খবরদার যাবেন না, ওতে মানুষের মনের রসকষ শুকিয়ে যায়, যত কূটবুদ্ধি এসে যায়। একা একা বাসায় থেকেই বা কি করবেন, এখানে এলে বরং দুটো ভালো ভালো গান শুনতে পাবেন। আর মেয়েটাও স্ফূর্তি করে গাইবে, শ্রোতা দু-একজন থাকলে গান জিনিসটা জমে ভালো।"

মুন্সেফবাবু প্রত্যহই অনুরোধ করে পাঠাতেন, সুতরাং বাধ্য হয়ে প্রত্যহই আমাকে ঐ গানই শুনতে যেতে হতো। যেমন করে হোক, সময়টা তবু তো একভাবে কেটে যায়।

এমনি ভাবেই হয়তো সেখানকার মেয়াদ আমার কেটে যেতো। কিন্তু কিছুদিন পরে এক উপযুক্ত রকমের কাজ হাতে পেয়ে গেলাম। ঠিক আমার মনের মতো এক কঠিন কাজ।

একদিন সকালে অনেক দূরের গ্রাম থেকে গরুর গাড়িতে এক আশ্চর্য অবস্থায় রোগী এসে হাজির হলো। তার একখানা ঠ্যাং আগাগোড়া ক্ষত-বিক্ষত। বন্য ভালুকে তার গোটা ঠ্যাং-খানাকেই চিবিয়ে থেঁতলে দিয়েছে।

অসংখ্য দগ্‌দগে ঘা ফাঁক হয়ে আছে, সেগুলি ফুলে রীতিমতো সেপ্‌টিক হয়েছে। উপরন্তু ভালুকে তার গালেও দিয়েছে একটা আঁচড়, গালের মাংস খানিকটা ঝুলছে। এই অবস্থার সঙ্গে রয়েছে প্রবল জ্বর। রোগী জ্বরে ও বিষ-ক্রিয়াতে বেহুঁশ হয়ে আছে। তিন-চারদিন পূর্বে এই ঘটনা ঘটেছিল, অবস্থা সাংঘাতিক হওয়াতে তখন তাকে এখানে এনে হাজির করেছে।

ব্যাপার খুবই কঠিন। কিন্তু তবু সত্য বলছি, এমন একটি রোগী পেয়ে মন আমার স্বার্থপরের মতো আনন্দে লাফিয়ে উঠল। ঘরে শুয়ে বই পড়ে আর মুন্সেফ-কন্যার গান শুনে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, এই শক্ত রোগীটিকে হাতে পেয়ে মনে হলো এবার অন্তত আমি বেঁচে গেলাম। মনে বেজায় পুলক এসে গেল।

এমন সাংঘাতিক রোগীকে শুধু ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, হাসপাতালেই তাকে স্থান দিতে হয়। চোখে চোখে রেখে চিকিৎসা করতে হয়। অথচ রোগীকে রাখবার মতো কোনো বেড্‌ পর্যন্ত সেখানে নেই। নতুন হাসপাতাল খোলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত তেমন কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি। তাহলে কি করা যায়! কম্পাউণ্ডারকে বললাম, কোথা থেকে একটা খাটিয়া যোগাড় করে আনো, ওকে আমি এখানেই রাখবো। ওর এখনই অপারেশন করা দরকার, নইলে ও বাঁচবে না। আর অপারেশনের পরেও ওকে আমাদের নজরে রাখতে হবে। এখানে ওকে না রাখলে কোনোমতে চলবে না। তার ব্যবস্থা যাহোক করে করতেই হবে।

কম্পাউণ্ডারও ছিল উৎসাহী। সে তখনই কোথা থেকে এক খাটিয়া এনে হাজির করলে। সেও করার মতো কিছু কাজ পেয়ে গেল।

আমি বললাম—"আগে ওকে অপারেশন-টেবিলে নিয়ে চলো। যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে সমস্ত স্টোভ জেলে স্টেরিলাইজ করতে দাও। তার পর দেখা যাক কতদূর কি করা যেতে পারে। ক্লোরোফর্ম আছে তো?"

সে চার আউন্সের একটি বোতল বের করলে। তার থেকে আধখানা জিনিস উবে গেছে, আধখানা মাত্র ভরা আছে। আমি বললাম—"ওতেই হবে।"

তার পর যন্ত্রপাতির খোঁজ নিলাম। তা মোটামুটি সব রকমের যন্ত্রই রয়েছে। আর সবই নতুন, কোনোদিন তার ব্যবহার হয় নি। আমি সেগুলিকে ভালো করে ফোটাতে দিলাম।

জোড়জোড় করতেই প্রায় দুঘণ্টা সময় কেটে গেল।

সমস্ত প্রস্তুত করে নিয়ে কম্পাউণ্ডারকে বললাম—"এবার তুমি ক্লোরোফর্ম দিতে শুরু করো।" কিন্তু ক্লোরোফরম দেবার কোনো যন্ত্রও সেখানে নেই, আর কেমন করে ক্লোরোফরম দিতে হয় তাও সে জানে না। তখন আমি মোটা খাম ছিঁড়ে কাগজের এক ঠোঙা বানালাম, তার মধ্যে খানিকটা তুলো ভরে দিলাম, তারই মধ্যে একটু একটু ক্লোরোফরম ঢেলে তুলো ভিজিয়ে সেই ঠোঙা সমেত নাকের উপর ধরে থাকতে বললাম। তাকে এটুকু বলে দিলাম যে, তুলোর ক্লোরোফরম শুকিয়ে এলেই আবার তা ভিজিয়ে নিতে হবে, যাতে গ্যাসটা বরাবরই নাকে ঢুকতে থাকে। তাহলেই রোগী বরাবর অজ্ঞান হয়ে থাকবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তখন আমি একে একে ক্ষতস্থানগুলিকে চিরতে শুরু করলাম। মনে করেছিলাম যে, খানিকটা করে চিরে দিলেই ক্ষতের ভিতর থেকে পুঁজরক্তগুলো ড্রেন হয়ে বেরিয়ে যাবে, তার পরে ওষুধ দিয়ে গজ ভরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেই চলবে। কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

যেখানেই চিরি, তারও উপর দিক থেকে গল্‌গল্‌ করে পুঁজরক্ত গড়িয়ে আসতে থাকে। আবার যদি তার উপরে চিরি, তবে তারও উপর দিক থেকে ঐভাবে গড়াতে শুরু করে। টেবিলের নীচেকার বালতি সেই পুঁজ-রক্তে প্রায় ভরে উঠল, কিন্তু তবু তার ফুরোবার কোনো লক্ষণ নেই। যেন কোথায় একটা ওর উৎস লুকিয়ে রয়েছে, সেখান থেকেই অবিরল ধারে স্রোত ঝরছে। সেই উৎস পর্যন্ত না পৌছতে পারলে কিছুই লাভ হবে না। আমি লম্বা এক লৌহশলাকা ভিতরে চালিয়ে দিয়ে সেই উৎসের প্রান্তসীমা অনুসন্ধান করতে লাগলাম।

শলাকা হাঁটুর উপরদিক পর্যন্ত পার হয়ে গেল। অগত্যা সেখানেও আমি খানিকটা চিরে ফেললাম। তখন তার ভিতর থেকে টুকরো টুকরো হাড় বেরিয়ে আসতে লাগল। বুঝলাম যে, ভালুকে হাঁটুর হাড়গুলোকেও চিবিয়েছে, সেখান থেকেই টুকরোগুলো আসছে। তাহলে এখন কি করা যায়!

এ অবস্থায় ঠ্যাংটিকে বজায় রাখা চলবে না, কেটে বাদ দিতে হবে। হাঁটুর উপরে অ্যাম্পুটেশন করতে হবে। তাছাড়া উপায় নেই।

এইবার আমার মনে ভয় হতে লাগল। অ্যাম্পুটেশন করতে গিয়ে যদি কোনো বড়ো শিরা কেটে ফেলি এবং তা খুঁজে না পাই! মনে পড়ে গেল

কর্নেল চ্যাটার্জীর কথা। খুব মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে, কারণ এখানে এমন কেউই নেই যে আমাকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে।

আমি মনে করলাম, হাঁটুর উপর রবার-টুর্নিকেট দিয়ে বেঁধে মাংসগুলো আগে একটু একটু ফাঁক করে কেটে শিরা প্রভৃতি খুঁজে বের করি, সেগুলোকে একে একে সমস্তই বেঁধে ফেলি। অতঃপর তাই করতে শুরু করলাম। তাতে অনেকটাই সময় লেগে গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখি রোগী হঠাৎ হাত-পা নাড়তে শুরু করেছে, মুখে গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।

কম্পাউণ্ডারের দিকে চেয়ে বললাম—"একি হচ্ছে, ওর যে জ্ঞান ফিরে আসছে, ক্লোরোফর্ম আর ঢালো নি বুঝি ?"

"ক্লোরোফর্ম আর কিছু বাকী নেই, সব তো ফুরিয়ে গেল।"

কি সর্বনাশ! ও যত পেরেছে ক্রমাগত ঢেলেই গেছে, মনে ভেবেছে যত বেশী ক্লোরোফর্ম ঢালা যাবে তত বেশী অজ্ঞান হবে। একটু একটু করে চালালে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চলতে পারতো, কিন্তু তা ওকে বলে দেওয়া হয় নি।

এখন কি করা যায়! এখনও আসল কাজ-ই বাকী। হাড়খানা করাত দিয়ে কাটতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় তা করতে গেলে ওর পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে আসবে, হয়তো টেবিল ছেড়ে লাফ দিয়ে পড়বে। অথচ ইতিমধ্যে মাংসগুলো কেটে ফাঁক করে দেওয়া হয়েছে, চিড়-খাওয়া হাড়খানা বেরিয়ে পড়েছে—এখন তাকে কেটে ফেলতেই হবে, যেমন করে হোক।

তৎক্ষণাৎ ভেবেচিন্তে এক উপায় আবিষ্কার করলাম। তাড়াতাড়ি ডবল মাত্রায় মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম। ক্লোরোফর্মের নেশার উপরে মর্ফিয়ার নেশাতে নিশ্চয় খানিকটা ঘুমের ভাব এসে পড়বে। তার পর হাসপাতালের চাকর ও মেথরকে দুদিক থেকে রোগীকে চেপে ধরতে বলে আমি হাড়ের উপর বেপরোয়া করাত চালাতে শুরু করে দিলাম।

তখন দেখলাম চেপে ধরার কোনো দরকার ছিল না। রোগী বিশেষ কিছু গণ্ডগোল করলে না। সে চুপচাপ শুয়ে রইল, যদিও মাঝে মাঝে চোখ মেলে এক-আধবার চাইতে লাগল। হাড়ে তেমন কোনো অনুভব-শক্তি ছিল না বলেই হোক, কিংবা স্থানীয় নার্ভগুলো থেঁতলে অসাড় হয়েছিল বলেই হোক, কিংবা নেশার ঘোরেই হোক—সে যেন বুঝতেই পারলে না যে তার পায়ের হাড় কেটে ফেলা হচ্ছে।

বিনা বাধায় অ্যাম্পুটেশন শেষ করে আমি হাড়ের ভাঙা প্রান্তটা মাংস

দিয়ে ঢেকে দিলাম, আর ক্ষতস্থানটা আধাআধি সেলাই করে দিলাম। ভিতর থেকে রস রক্ত প্রভৃতি বেরিয়ে যাবার জন্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে দিলাম। শেষকালে তার উপর তুলো-ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে দিলাম।

এতক্ষণ পর্যন্ত রোগী কোনই আপত্তি প্রকাশ করে নি। কিন্তু যেমনি পায়ের দিক ছেড়ে তার ঝুলে-পড়া গালের মাংসটা সেলাই করতে গেলাম, অমনি সে প্রবলভাবে আপত্তি প্রকাশ করতে লাগল, সজোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকল। অগত্যা জোর করে চেপে ধরে আঁকাকে কোনোরকমে সে কাজ সারতে হলো। তা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

কিন্তু এতখানি ধকলের পরে রোগী একেবারে নির্জীবের মত হয়ে পড়ল। মর্ফিয়ার প্রভাবে সে অচেতনের মতো পড়ে রইল বটে, কিন্তু নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে এলো। আগে জ্বর ছিল, নাড়ির গতি দ্রুত ছিল, কিন্তু এখন আর জ্বর নেই, সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে ঘেমে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ ইন্‌জেকশন দেওয়া দরকার, কিন্তু কোথায় পাবো গ্লুকোজ! আমি এক বোতল সেলাইন প্রস্তুত করলাম, এবং তার সঙ্গে কিছু উত্তেজক ওষুধ মিশিয়ে শিরার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে তাই প্রয়োগ করতে থাকলাম। একঘণ্টা যাবৎ সেলাইন দিতে থাকার পরে রোগীর নাড়ী বেশ সবল হয়ে উঠল।

যখন সেলাইন দেওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছি তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে, অপরাহ্ণ পার হয়ে গেছে। তখন মনে পড়ল সারা দিন কিছু খাওয়া হয় নি, আমারও না, কম্পাউণ্ডারেরও না। কিন্তু তবুও এমন অবস্থায় রোগীকে ফেলে সবাই চলে যাওয়া যায় না। রাত্রেই বা কে ওকে দেখবে! তখন সেই ভাবনাটাই সব চেয়ে বড়ো।

রোগী একজন জোয়ান মানুষ, ওর বুড়ো বাপ এসেছিল সঙ্গে। সে এতক্ষণ পর্যন্ত হাসপাতালের সামনে গাছতলায় বসে ছিল। তাকে এখন কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে থাকতে রাজী আছে কিনা। সে বললে, রাত্রে সে রোগীর কাছেই থাকবে। আমার কম্পাউণ্ডারও বললে যে সেও ওখানে থাকবে, দরকার হলে আমাকে তখনই খবর দেবে।

সেদিন সারা দিন খাওয়াও হয় নি, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিশ্রমও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তাতেও আমি কিছুমাত্র ক্লান্ত হই নি। মনের মধ্যে খুব একটা আনন্দের ভাব নিয়ে শিষ দিতে দিতে বাসায় ফিরলাম। এতদিনে কিছু কাজের মতো কাজ পেয়ে গেছি, এবং তা সার্থকভাবে সম্পন্নও করেছি। কিন্তু মনের মধ্যে কোনো অহংকার নেই, শুধুই সাফল্যের সার্থকতা। এমন

সাফল্যের বদলে আরো অনেক কিছুই হতে পারতো। রোগী যেমন মারাত্মক অবস্থাতে এসেছিল, অপারেশনের সময় টেবিলের উপরেই সে মারা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয় নি। কোনো শিরা কেটে প্রচুর রক্তপাত হতে পারতো, কিন্তু তাও হয়নি। ক্লোরোফর্ম ফুরিয়ে যাবার পরে বাকী কাজটুকু শেষ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারতো, কিন্তু তাও হয় নি। যা কিছু আমার করণীয় ছিল তা সৌভাগ্যবশত পুরোপুরিই করতে পারা গেছে। অপারেশন সাক্সেসফুল। এতেই মন আমার আনন্দে ভরে উঠল। সাধ্যের অতিরিক্ত একটা কাজ আমার দ্বারা আজ হতে পেরেছে, এতেই আনন্দ। এখনও বেশ মনে আছে, বাসায় ফেরার পথের পাশে ছিল কুরচির বন—আসন্ন সন্ধ্যার দক্ষিণা-বাতাসে সেখান থেকে ভেসে আসছিল কুরচি-ফুলের ভারি মিষ্টি রকমের একটা উতলা সুবাস। আমার মনের আনন্দ তাতে আরো বেশী ভরপুর হয়ে উঠল। সারাটা দিন বিকটগন্ধ নানারকম ওষুধের আবহাওয়া ভোগ করার পরে অন্তরীক্ষ থেকে কেউ যেন আমাকে এই অপরূপ ফুলগন্ধবহা আশীর্বাদ পাঠাচ্ছে! যেন জানিয়ে দিচ্ছে যে, আমার দ্বারাও জগতের কিছু ভালো কাজ হতে পারে। সে যে কি আনন্দ তা কেবল নিজে নিজে টের পাওয়া যায়, অপর কাউকে কথায় বলে বোঝানো যায় না।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি, আবার তার জ্বর এসে গেছে। জ্বরের ঘোরে সে আন্‌চান করছে। তা তো হবেই। একে সেই অস্ত্রোপচারের প্রতিক্রিয়া, তার উপর রক্তের মধ্যে বিষাক্ত জীবাণুদের সেপ্‌টিক প্রক্রিয়া। এখন এগুলির হাত থেকেই রোগীকে রক্ষা করতে হবে। সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি। রোগী আর ডাক্তার দুজনেরই।

তখনকার দিনে সেপ্‌টিক জীবাণুদের বিরুদ্ধে সাল্‌ফা প্রমুখ ওষুধগুলির আবিষ্কারই হয় নি। আমাদের সম্বল ছিল কেবল অ্যান্টি-সিরামের দ্বারা চিকিৎসা করা, আর জীবাণুনাশক হিসাবে কতকগুলি অ্যান্টিসেপ্‌টিক ওষুধ প্রয়োগ করা। ভাগ্যক্রমে ওখানকার স্টকে কয়েকপ্রকার অ্যান্টি-সিরাম সঞ্চয় করা ছিল। আমি সেগুলি পুরা মাত্রাতেই প্রয়োগ করতে থাকলাম। আর সেই সঙ্গে শিরার মধ্যে প্রত্যহ দুবার ক'রে অল্পমাত্রাতে আইওডিন ইন্‌জেকশন দিতে থাকলাম। এ ছাড়া ড্রেস করা প্রভৃতি সমস্ত কিছু নিজের হাতেই করতাম। আমি দেখলাম যে ওখানে মাছির খুব উপদ্রব। ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করা থাকলেও, তার উপর মাছি বসলে নতুন কিছু বিপজ্জনক সংক্রমণ ঘটতে পারে। আমি তাই নিজের বিছানা থেকে মস্ত একখানা

চাদর এনে তার আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে রাখলাম, আর তার বাপকে বলে দিলাম তালের পাখা দিয়ে যেন সর্বদাই মাছি তাড়াতে থাকে।

পথ্যের ব্যবস্থাও আমাকেই করতে হলো। নইলে ওরা আর ওখানে কোথায় কি পাবে? নিজের বাসা থেকে দুই বেলা প্রচুর দুধ-বার্লি প্রস্তুত করে পাঠাতাম। মুরগির শুরুয়া তৈরি করে পাঠাতাম। স্টেশন থেকে সরবতি লেবু সংগ্রহ করে তার রস প্রস্তুত করে পাঠাতাম। তখনও ওর কিছু চিবিয়ে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না।

এই একটিমাত্র রোগীকে নিয়ে আমাকে সারাক্ষণই ব্যস্ত থাকতে হতো। কেবল ওরই কথা চিন্তা করছি—কিসে ওকে চাঙ্গা করে তোলা যায়, কিসে শীঘ্র আরাম করা যায়, ক্ষতের মধ্যে কোন্ কোন্ ওষুধ প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি ঘা শুকিয়ে আসতে পারে, কিসে ওর জীবনীশক্তি ফিরে আসে।

কিন্তু আশ্চর্য ঐ স্থানীয় আদিবাসী যুবকের নিজেরই স্বাভাবিক জীবনী-শক্তি! সে যেন আপনা থেকেই শীঘ্র সেরে উঠতে লাগল। আমি যেটুকু সাহায্য তাকে দিতে পারছিলাম তাতেই তার পক্ষে যথেষ্ট হলো। দিনে দিনে বেশ সে সুস্থ হয়ে উঠতে লাগল। তিন-চারদিনেই জ্বর ছেড়ে গেল ক্ষতগুলিও ক্রমশ লাল হয়ে শুকিয়ে আসতে লাগল। কলকাতার হাসপাতালে কখনই এত শীঘ্র কারো ঘা শুকোতে দেখি নি।

কয়েকদিন পরে তাকে ভাত খেতে দিলাম। ভাত খাবার জন্যে সে খুব জোর তাগাদা লাগিয়েছিল। তার বুড়ো বাপটাও বলছিল যে—ভাতই ওদের সকল ব্যারামের পথ্য, ভাত না খেলে ওদের কোনো রোগই সারে না। ভাত দেখে তার কী আনন্দ! শুয়ে শুয়ে নয়, উঠে বসেই সমস্ত ভাত সে খেয়ে ফেললে, একটি দানাও ফেলে রাখলে না।

ঘা শুকিয়েছে দেখে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষতস্থানের সেলাই কেটে দিলাম। আরো কিছুদিন ওখানে রেখে তাকে লৌহঘটিত তেজো. টনিক খাওয়াতে লাগলাম।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমার চাকরির মেয়াদ ফুরোলো। যেদিন আগেকার ডাক্তারবাবু ফিরে এসে আমার কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিলেন, সেদিন তাকেও ছুটি দিয়ে দিলাম।

তার দেহের কয়েকটি মাপ নিয়ে রেখেছিলাম। কলকাতায় ফিরে এসে তার জন্যে একটি কাঠের পা আর একটি ক্রাচ তৈরী করিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

॥ এগারো ॥

কলকাতায় ফিরে এসে দেখি আবার আমাকে মফস্বলে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এবার বর্ধমান। কলকাতায় আমাকে রাখতে কর্তৃপক্ষ আর রাজী নয়। কলকাতা ছেড়ে আমি যে অন্য কোথাও যেতে চাই না, এটাই তাদের কাছে বিশেষ আপত্তির কথা। ওরা বনে জঙ্গলে যেখানেই পাঠাবে সেখানেই বিনা ওজরে আমার যাওয়া উচিত, এই হলো সরকারী চাকরির শর্ত।

কিন্তু স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করার যা আস্বাদ তা আমি পেয়ে গেছি। বরং চাকরি ছাড়তে পারি, কিন্তু প্র্যাক্টিস ছাড়তে পারি না। যেখানে প্র্যাকটিস স্থাপিত হয়েছে, লোকের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেছে, সেখানে তারাও আমাকে চায় আর আমিও তাদের চাই। তারাও আমাকে বিশ্বাস করে যে, রোগপীড়া হলে আমি তাদের রক্ষা করবো—আমার হাতে চিকিৎসার ভার দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। আর আমিও বিশ্বাস করি যে, তাদের উপর নির্ভর করে থাকলে আমার যেমন করে হোক চলে যাবে। পরিচিতদের মধ্যে যারাই শোনে যে আমাকে কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে তারাই বলে যে চাকরি ছেড়ে দিন, এখানে বসে মন দিয়ে প্র্যাক্টিস করুন, কোনো ভাবনা নেই। প্র্যাক্টিসের এই এক গুণ, ডাক্তারদের মধ্যে যে যাকে বিশ্বাস করে সে তাকে ছাড়া আর কাউকে চায় না। সুতরাং যারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না।

সবই বুঝি, কিন্তু এতদিনের চাকরিটা হঠাৎ ছেড়ে দেবো? এ-চাকরির আলাদা একটা মর্যাদা আছে, এর কিছু পেনসন আছে। তা ছাড়া মাসে মাসে বাঁধা বেতনটি মেলে। সে লোভ সহজে ত্যাগ করা যায় না।

আমি তখন ভেবেচিন্তে এক মতলব করলাম। চাকরিতে নিযুক্ত থেকেই ডাক্তারি বিষয়ে আমি আরো কিছু উচ্চশিক্ষা নিতে চাইবো। সরকারী চাকরির নিয়ম এই যে, কেউ যদি উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাহলে তাকে সেই সুযোগ নিশ্চয় দেওয়া হবে। আমি ট্রপিক্যালে শিক্ষা নেবার জন্যে আবেদন করলাম। পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা নেবার জন্যে ওখানে ভর্তি হতে পারলে আমার আপাতত কলকাতাতেই থাকা হবে।

তখন ট্রপিক্যাল মেডিসিন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠানটি সবেমাত্র খুলেছে। খ্যাতনামা রজার্স-ই এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ও ঁরা ঞক

নতুন রকমের বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগগুলি সম্বন্ধে এতে বিস্তারিত রকমের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্যে নানা দেশ থেকে কতই আবেদন আসছে। কিন্তু স্থান সংকীর্ণ, নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশী ছাত্র এখানে নেওয়া যেতে পারে না। তাই আবেদনকারীদের মধ্যে অনেক বাছাই করে ছাত্র নেওয়া হয়। ওখানকার নিয়ম এই যে, ভারতের সবগুলি আলাদা প্রদেশ থেকে কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র নেওয়া হবে, তা ছাড়া ভারতের বাইরে থেকে যারা আসতে চায় তাদের জন্যেও কয়েকটি স্থান রাখা হবে। এই হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে তিন চারটির বেশী ছাত্র নেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব সেখানে আমার ঢুকতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। বাংলাদেশের অনেকেই আবেদন করেছে।

এই ব্যাপার দেখে আমি এক কাজ করলাম। রজার্সের নিজের হাতে লেখা সার্টিফিকেটখানি আমার আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলাম। পূর্বে বলেছি যে কিছুকাল আমি তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলাম, তাতে খুশি হয়ে তিনি আমাকে এক সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। নির্বাচনের সময় নিশ্চয়ই তার একটা কিছু বিশেষ মূল্য আছে বলে ধরা হবে।

এই আবেদনপত্র পেয়ে হেড-অফিস থেকে আমাকে ডেকে পাঠালে। হেড অফিসের কর্তা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন—"যতই চালাকি করো, এ কৌশল তোমার খাটবে না। তোমার মত লোককে ওখানে নেওয়া হতেই পারে না। ওখানে ঢুকতে গেলে বিশেষ বিদ্যার ও কৃতিত্বের পরিচয় দেখাতে হয়। তোমার সে পরিচয় কোথায় ?"

আমি বললাম—"শিক্ষা পেতে চাই বলেই আমি আবেদন করেছি। এখন নির্বাচিত হই কিংবা না হই, সে আমার ভাগ্য। কিন্তু আপনি আমার আবেদনটি যথাস্থানে পাঠিয়ে দিন। যদি ফেরত আসে তাহলে তখন যা হয় করা যাবে।"

তিনি বললেন—"পাঠিয়ে দিতে অবশ্যই আমরা বাধ্য, কিন্তু আমি নিজে তোমাকে কোনোরকম রেকমেণ্ড করবো না।"

আমি বললাম—"বেশ, আপনি এমনিই পাঠিয়ে দিন।"

কিন্তু তবুও দেখা গেল যে, সেখান থেকে আমি নির্বাচিত হয়েছি। ভর্তি হবার জন্যে আমার উপর আদেশপত্র এসে গেল। ওখানে শিক্ষা নেবার জন্যে অনেক ফী দিতে হয়, কিন্তু আমি সরকারী চাকরিতে আছি বলে তাও আমাকে দিতে হবে না। বুঝতে পারলাম, রজার্সের প্রশংসাপত্রই আমাকে তরিয়ে দিয়েছে।

নতুন উদ্যম নিয়ে ট্রপিক্যালে যাতায়াত করতে লাগলাম। যেতে হয় সকাল ন'টায়, ফিরি সন্ধ্যা ছ'টায়। তারপর বাড়ীতেও রীতিমতো পড়াশোনা করতে হয়। প্র্যাক্‌টিস নামমাত্র বজায় রইল, আবার শুরু হলো পুরোপুরি ছাত্রজীবন। নতুন বিদ্যা শিখতে যাচ্ছি, এর একটা আলাদা রকম আনন্দও আছে। প্র্যাকটিস এখন মাথায় থাক।

কিন্তু এবারকার ছাত্রজীবন আরো বেশী কঠোর। যে যে বিষয়ে শিক্ষা নিতে হবে তার অধিকাংশের সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানি না। প্রোটোজুলজি, হেল্‌মিন্থোলজি, ব্যাক্‌টিরিওলজি, এন্‌টমোলজি, সিরোলজি—আরো কত কি। এসকল বিভাগের সম্বন্ধে কোনো খবরই জানা নেই। সমস্তই নতুন করে শিখতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করতে হবে।

ছাত্র প্রায় সত্তর আশী জন। প্রায় সকলেই আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, দু-চারজন হবে আমার সমবয়সী। প্রায় সকলেই আমার চেয়ে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, মেধাবী। দু-একজন সিভিল-সার্জনও তার মধ্যে আছেন। মাইক্রস্কোপ যন্ত্র-ব্যবহারে প্রায় সকলেই আগের থেকে ধুরন্ধর, আমি ও-বিষয়ে একেবারে কাঁচা। সকলেরই মুখ-চোখের ভাব দেখে ও কথাবার্তা শুনে মনে হয় তারা লেক্‌চারের সব কথাই বুঝতে পারছে, কিছুমাত্র তাদের কঠিন ঠেকছে না। অবলীলাক্রমে এ বিদ্যায় পাস করে যেতে পারবে, এমনি তাদের ভাবখানা। দেখেশুনে প্রথমটায় আমি হক্‌চকিয়ে গেলাম। এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কেমন করে! শেষে কি আমাকে হাস্যাস্পদ হতে হবে!

কিন্তু যখন শিখতে এসেছি তখন যেমন করে হোক এগুলি শিখতেই হবে। ওদের সঙ্গে নিজের বিদ্যার দৌড়ের তুলনা করে কোনো লাভ নেই। ওরা যেমন করেই শিখুক, আমি আমার মতো করে শিখবো, নিজের যতটুকু বুদ্ধি তাই দিয়ে যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করবো। ওরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করতো, লেকচারের পরেই লাইব্রেরি-ঘরে একত্রে জড়ো হয়ে তাই নিয়ে তর্কাতর্কি করতে বসে যেতো। কিন্তু আমি সেখানে ঘেঁষতাম না। যদি কিছু বুঝতে না পারতাম তাহলে সরাসরি প্রফেসরদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম। তাঁদের অমায়িক সরল ব্যবহার দেখে সেই বিশেষ সাহসটুকু আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল।

এখানে কয়েকজন প্রফেসরের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। এমন ধরণের একান্ত বিজ্ঞানসেবী নিঃস্বার্থ সাধকদের আমি ইতিপূর্বে কখনো

দেখি নি। চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের সাধারণত আমরা ডাক্তার বলে থাকি, এঁরা কিন্তু কেউই সেইরকম তথাকথিত ডাক্তার নন। ডাক্তারি করতে যদিও এঁরা ভালোরকমই জানেন, এবং হাসপাতালে আপন আপন নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে সে-কাজ যথারীতি করেও থাকেন, কিন্তু এঁরা কখনো প্র্যাক্‌টিস করেন না, অর্থাৎ পয়সা নিয়ে রোগী দেখেন না। পয়সার দিকে এঁদের লোভ নেই, খ্যাতি যশের দিকে লিপ্সা নেই, অন্য কোনো রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। এঁরা নীরব কর্মী। সত্যের সন্ধানই জীবনের একমাত্র ব্রত, সেই কাজেই নীরব নিষ্ঠার সঙ্গে সারাক্ষণ নিযুক্ত। সেই কাজটি হলো রিসার্চ করা, রোগ সম্বন্ধে যে-সব রহস্য আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি সেগুলিকে আবিষ্কারের চেষ্টা করা। সে কাজে এঁদের কোনো ক্লান্তি নেই, সে কাজের কোনো সমাপ্তিও নেই। যেমনি একটা কিছু আবিষ্কার হয়ে গেল অমনি পরমুহূর্তে অন্য একটা কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় আগ্রহী হলেন। এঁদের বলা যায় প্রকৃত বিজ্ঞানব্রতী। দুনিয়াদারীর সব কিছু ছেড়ে বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করে নিয়েছেন। সত্যাবিষ্কারের আনন্দই একমাত্র কাম্য।

আচার ব্যবহার এবং চরিত্রও এঁদের অদ্ভুত। অন্ততপক্ষে আমি নিজের চোখে যেমন দেখলাম, একেবারে শিশুর মতো সরল। এঁদের কাছে কালো-সাদার কোনো প্রভেদ নেই, ছোটো-বড়োর প্রভেদ নেই, ছাত্র-গুরুর পার্থক্য নেই। সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার, এমন কি অ্যাসিস্টাণ্ট ও বেয়ারাটির সঙ্গে পর্যন্ত। অতো বড়ো মান্যের পদে অধিষ্ঠিত থেকেও, সে সম্বন্ধে কোনো যেন খেয়ালই নেই। বেয়ারাকে কোনো কাজের জন্যে ডাকতে হলে টেবিলের ঘণ্টা বাজিয়ে সকলেই ডেকে থাকে, কিন্তু এঁরা দেখলাম তাও করেন না, নিজেই ব্যস্তসমস্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে কামরার বাইরে গিয়ে অপেক্ষমান বেয়ারাকে খুবই মিনতির স্বরে বলেন, "এই কাজটি তুমি করে দিতে পারবে?" বেয়ারা বেচারা হয়তো টুলে বসে ঢুলতে ঢুলতে সাহেবকে এইভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে বিব্রত হয়ে ধড়মড় করে উঠে পড়ে।

ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারও ঠিক ঐরকমই। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে চেয়ারে বসতে বলেন, নিজের সব কাজ ফেলে রেখে তাকে নিয়েই পড়েন, শেষ পর্যন্ত খুশি না করে ছাড়েন না। যত তুচ্ছ প্রশ্নই হোক, তাতে কোনো বিরক্তি নেই। ছাত্র কিছু জানতে চাইছে এটাই তাঁদের কাছে সব চেয়ে বড়ো কথা।

ওঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাঁর নাম মিগো। তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ

ঘুরেছেন, দূর-প্রাচ্যের বিশিষ্ট রোগগুলি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। কয়েকটি বইও লিখেছেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের যত-কিছু রোগ সম্বন্ধে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা হয়। রোগনির্ণয়ে ও রোগের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি সুদক্ষ। তাঁর কামরাতে দেয়ালের সর্বত্র নানারকম ছবি এবং চার্ট টাঙানো। তিনি এইসব নিয়েই আছেন। প্রায়ই দেখা যায় গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে কক রকমের চার্ট তৈরী করছেন, কোথায় কোন্ রোগে কত মৃত্যুর হার, কত দেশের কোন্ জাতীয় লোকেরা কি কি রোগে বেশী ভোগে, ইত্যাদি। ইনি ক্লাসে যা লেকচার দেন তা শোনবার মতো জিনিস—ছবি দেখিয়ে তাঁর বিষয়বস্তুগুলি অতি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন। বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা তাঁর অতি আশ্চর্য।

একজন ছিলেন নোল্‌স্। প্রোটোজুলজির প্রফেসর। বেঁটেখাটো টাকমাথা মানুষটি, নিজের ল্যাবরেটরিতে একটি উঁচু টুলের উপর বসে প্রায় সর্বদাই মাইক্রস্কোপে চোখ লাগিয়ে আছেন। চেয়ারে আরাম করে বসতে এঁকে ক্বচিৎ দেখা যায়। সামনে টেবিলের উপর জ্বলছে মাইক্রস্কোপ দেখবার তীব্র আলো, তার সুমুখে একটি জলভরা কাচের বীকার। অত্যন্ত গরমের সময়েও তিনি মাথার উপর পাখা চালান না, পাছে মাইক্রস্কোপের পরীক্ষা-বস্তু তাতে নড়ে যায়। সারাদিন এই নিয়েই আছেন। খাবার সময় হলে, কাজ করতে-করতে সেখানে বসেই কিছু খেয়ে নিচ্ছেন। বিকাল পার হয়ে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে সবাই ঘর বন্ধ করে চলে যায়—তখনও তাঁর ঘরে আলো জ্বলছে, রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সেখানে বসেই তিনি কাজ করছেন। আবার পরের দিন সকাল আটটার মধ্যেই এসে হাজির। প্রত্যহই তাঁর গুরুতর কাজের প্রোগ্রাম, একটুও অবসর নেই। সর্বদাই দেখা যায় তিনি মহা ব্যস্ত। কথা বলেন খুবই কম, কারও সঙ্গে বসে দুমিনিট গল্প করতে তাঁকে কখনই দেখা যায় না। যে কাজে যখন লেগে আছেন তা যেন তখন অত্যন্তই জরুরী।

একজন ছিলেন দাশগুপ্ত। তিনিও বড়ো কম যান না। তাঁর গবেষণার খ্যাতি ইণ্টারন্যাশনাল, আমেরিকা-ইউরোপের সকল দেশে এই-বিভাগীয় বৈজ্ঞানী মহলে তাঁর নাম আবিষ্কারক হিসাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশের অনেক জার্নালে তাঁর লেখা মৌলিক প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়, এক জার্নাল থেকে অন্য জার্নালে তা আবার পুনর্মুদ্রিত হয়। ইনি সর্বদাই একটি ময়লা এপ্রন গায়ে চড়িয়ে কাজ করছেন। ইনিও সর্বক্ষণই মহা ব্যস্ত, হয় হাতে দস্তানা এঁটে বাঁদরকে ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন, না হয় গিনিপিগ নিয়ে নাড়াচাড়া

করছেন, না হয় বেড়ালকে অজ্ঞান করে ফেলে তার বুক-পেট চিরে তার মধ্যে নানা-রকম যন্ত্রপাতি লাগিয়ে হার্টের ক্রিয়া সম্বন্ধে কি-সব পরীক্ষা করছেন। বাঁদরের ম্যালেরিয়া ইনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। অথচ মনে কোনো গর্বভাব নেই, সর্বদাই তাঁর হাসিমুখ। ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক। ছাত্ররা কেউ কাছে গেলে কাঁধে হাত দিয়ে 'দাদা' 'ভাই' ছাড়া কথাই বলেন না। অথচ এমনিতে খুবই গম্ভীর, কিন্তু ছাত্রদের কাছে একেবারে অন্য ভাব।

একজন ছিলেন অ্যাক্টন। প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া তাঁর চেহারাখানা, কিন্তু স্বভাবটি বালকের মতো। খুব ধীরে-ধীরে থেমে-থেমে কথা বলেন, তার মধ্যে অনেক হাসির কথাও থাকে, কিন্তু নিজে ইনি কখনো হাসেন না। ইনি জীবাণু-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, আর বিশেষ করে চর্মরোগে অসাধারণ দখল। যে-কোনো চর্মরোগ দেখলেই ইনি নির্ভুলভাবে তা ধরে ফেলতে পারেন, কিসের থেকে তার উৎপত্তি সে-কথাও বলে দিতে পারেন। কত লোক এঁর কাছে শিক্ষা নিয়ে চর্মরোগ সম্বন্ধে ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে, অথচ নিজে ইনি রিসার্চ নিয়েই পড়ে আছেন। এঁর মতো সর্ববিষয়ে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।

একজন ছিলেন ডি'হেরেল। ইনি ফরাসী পণ্ডিত। ব্যাকটিরিওফাজ্ অর্থাৎ জীবাণুভুক্‌দের ইনি প্রথম আবিষ্কারক। ইনিই প্রথম প্রমাণ করে দেখান যে প্রকৃতির মধ্যে যেমন রোগজীবাণু থাকে, তেমনি তাদের মারবার মতো জীবাণুভুক্‌ও থাকে—এমন কি, দুই-ই পাশাপাশি থাকে। সকল নদীর জলে এবং গঙ্গার জলেও প্রচুর ব্যাক্‌টিরিওফাজ্ আছে, এই কথা প্রমাণ করতে তিনি এখানে এসেছেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি সমন্বিত অতিশয় ব্যস্তবাগীশ মানুষটি। গায়ে খুব পাতলা শার্ট, স্থানে স্থানে তার ছেঁড়া, বুকের বোতাম নেই, বুকের চুলগুলো সব দেখা যাচ্ছে। এঁকে বসতে কখনো দেখা যায় না, সর্বদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন। ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সারে সারে টেবিল পাতা, তার উপর গোল গোল কাচের কাল্‌চার-ডিশগুলি পঙ্‌ক্তি করে সাজানো। তাকে বলে পেট্রিডিশ। অসংখ্য পেট্রিডিশে তাঁর ঘর ভর্তি। তাই নিয়ে তিনি সর্বক্ষণ কাজ করছেন, এ প্রান্তের ডিশ থেকে কিছু জিনিস নিয়ে তিনি ও-প্রান্তের ডিশে নিক্ষেপ করছেন। কাজেই তাঁর বসবার ফুরসত কখন! ক্রমাগতই ডিশ পরীক্ষা করছেন আর কাচের পেনসিল দিয়ে দাগ মারছেন। ঘরের চতুর্দিকের কাচের শার্শিগুলি আঁটা, পাছে ডিশের মধ্যে বাইরের ধুলো উড়ে এসে পড়ে। ঘরে পাখা চলার উপায় নেই, তাতেও ঐ

বিপত্তি ঘটতে পারে। গরমের সময় সেই বদ্ধ কাচঘর যেন ইন্‌কিউবেটরের মতো গরম হয়ে উঠেছে, ভদ্রলোক গলদঘর্ম হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করছেন। ভাবখানা দেখলে মনে হয় লোকটা পাগল হবে নাকি! কিন্তু কি সুমিষ্ট তাঁর ব্যবহার, ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে অমায়িক কথাবার্তা। একবার কিছু বুঝিয়ে দিতে বললে আর রক্ষা নেই, অনবরত বকে যেতে থাকবেন।

এখানে কয়েকজনেরই মাত্র পরিচয় দিলাম, কিন্তু আরো অনেকে প্রায় এমনি ধরণের। বিজ্ঞানের সাধনা আর সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াকেই এঁরা জীবনের লক্ষ্য করেছেন। সেই উচ্চতর কর্তব্যের পথই এঁরা বেছে নিয়েছেন।

আদর্শ রকমের কিছু দেখলেই আমাদের মন তার দিকে আকৃষ্ট হয়, আপনা থেকেই তাকে অনুকরণ করবার ঝোঁক আসে। নিজের অজানিতে আমারও সেইরকম খানিকটা ঝোঁক এসে গেল। আগে যেমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতাম তেমনভাবে নয়, এখন নতুন উদ্যম নিয়ে নতুনরকম ভাবে এঁদের কাছে অনেক শিক্ষা নিতে থাকলাম। প্রত্যক্ষ আদর্শের সান্নিধ্যে যে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াগুলি আমার মধ্যে হতে থাকল। ছবি এঁকে বোঝা ও চার্ট প্রস্তুত করার দিকে আমার খুব ঝোঁক এলো। ক্লাসের বোর্ডে প্রফেসররা যে-সব ছবি এঁকে বোঝাতেন, আমি তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে খাতায় নকল করে নিতাম, বাড়িতে এসে সেগুলিকে আরো ভালো করে এঁকে নিতাম। প্রত্যেক রোগের ব্যাপারে আগে চার্ট এঁকে ফেলতাম। তাতে বোঝবার পক্ষে খুবই সুবিধা হতো। বইয়ের চাইতে আমি লেক্‌চারের খাতার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করতাম। এমন কি হাসপাতালে রোগীদের কাছে দাঁড়িয়ে এঁরা যে সকল ক্লিনিক্যাল উপদেশ দিতেন, সেগুলিকে আমি সঙ্গে সঙ্গে নোট করে ফেলতাম, সেগুলিও আমার খুব কাজে লাগতো। আর মাইক্রস্কোপে যে সকল নমুনা দেখানো হতো সেগুলিকেও আমি খাতায় লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিতাম। আমি দেখলাম যে, বই মুখস্থ করার চেয়ে এঁকে রাখলেই বেশি মনে থাকে।

শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই আমার নতুন জ্ঞান-সঞ্চার হতে থাকল ততই দেখতে পেলাম যে আগে অনেক কিছুই আমি জানতাম না, কেবল কতকগুলি নিয়মকে অনুসরণ করে কতকটা অন্ধের মতো চিকিৎসা করে যেতাম। কোন্ রোগে কোন্ ওষুধটি কেন দিচ্ছি তার শেষ পর্যন্ত তলিয়ে দেখার মতো বিদ্যা অনেক স্থলেই ছিল না। তাতে অবশ্য সাধারণ চিকিৎসার দিক দিয়ে বিশেষ ব্যাঘাত হয় না। একজন অশিক্ষিত-পটুত্ব-সম্পন্ন অভিজ্ঞ

কম্পাউণ্ডারেও সাধারণ রোগে তেমন ধরণের অন্ধচিকিৎসা করতে পারে। কিন্তু সব তথ্যটুকু না জেনে তেমন চিকিৎসা করাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলা যায় না। তাতে বিশেষ করে এই দোষটি হয় যে, অনেক সময় ওষুধের নানারকম অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। বাজারে যখন যেমন ধুয়ো ওঠে সেই অনুসারে অনেকেই কার্য-কারণ তলিয়ে না দেখে চোখ বুজে পরম নিশ্চিন্তে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এখনকার দিনের পেনিসিলিন ব্যবহারের কথা। আজকাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অনেকে সর্দিতেও দিচ্ছেন পেনিসিলিন, বাতেও দিচ্ছেন পেনিসিলিন, খোস-পাঁচড়াতেও দিচ্ছেন পেনিসিলিন। সকল রোগেই তাই। একবারও ভেবে দেখছেন না যে পেনিসিলিনের জীবাণুনাশক ক্রিয়া ছাড়া আর কোনো ক্রিয়া নেই, এবং তাও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জীবাণুর উপরেই তার ক্রিয়া আছে, বাকি অন্যান্য জীবাণুর উপর তার কোনোই ক্ষমতা নেই। সুতরাং পেনিসিলিন দিতে হলে আগে জীবাণু বুঝে তবে দিতে হবে, নতুবা ওর প্রয়োগে সাফল্য মিলবে না। এমনি অন্ধ আচরণ অনেক নতুন নতুন ওষুধের বেলাতেই আমরা করে থাকি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকেরা অনেক গবেষণা ও অনেক পরিশ্রম করে এক-একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন এবং আমাদের হাতে সেগুলি তুলে দেন। আর আমরা ভালো-মন্দ কিছু না বুঝে সেগুলির যথেচ্ছা অপপ্রয়োগ করতে থাকি। কিন্তু ঠিকভাবে তলিয়ে বুঝতে গেলে রোগের নিদান ও জীবাণুতত্ত্ব কিছু ভালো করে জেনে রাখা দরকার। তারই অভাবে আমাদের জ্ঞান চিরদিন যেন খাপছাড়া রকমের হয়ে থাকে। এইজন্য ডাক্তারি-বিদ্যা পাশ করার পরেও খানিকটা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারলে সকলের পক্ষেই ভালো হয়। আমি যদিও অন্য কারণে এখানে শিক্ষা নিতে ঢুকেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলাম যে এই শিক্ষাগুলি নেওয়া আমার পক্ষে খুবই দরকার ছিল। নইলে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

ট্রপিক্যাল মেডিসিনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নয় মাসে। তার পরেই পরীক্ষা। এ পরীক্ষা সহজ নয়। লিখে পরীক্ষা, মুখে পরীক্ষা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল পরীক্ষা তিন রকমই আছে। প্রত্যেক বিভাগে তিনজন করে পরীক্ষক।

শুনেছিলাম যে অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে মেডিসিনের অর্থাৎ রোগবিদ্যার পরীক্ষাই সবচেয়ে কঠিন। আমার তাই আগের থেকেই যথেষ্ট উদ্বেগ ও

দুশ্চিন্তা হতে থাকল। অন্যান্য বিষয়ে মুখস্থ-বিদ্যার জোরে উৎরে যাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়টিতে কিছু তীক্ষ্ণ রকমের উপস্থিতবুদ্ধি থাকার দরকার হয়। নতুবা সমস্ত কিছু জানাশোনা থাকলেও কার্যক্ষেত্রে ঘাবড়ে যেতে হয়।

হলোও তাই। খাতায় লেখা পরীক্ষার বেলাতে আমি বেশ ভালোই লিখেছিলাম। কিন্তু গণ্ডগোল হলো প্র্যাকটিক্যালের বেলাতে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই দুটি করে রোগী দেওয়া হয় রোগনির্ণয় করতে, এবং তাদের সমুচিত চিকিৎসা কেমন হওয়া উচিত সে-বিষয়ে মন্তব্যগুলি প্রকাশ করতে। তারপরে রোগী দেখা হয়ে গেলে পরীক্ষকের কাছে মন্তব্যগুলি দাখিল করা হয়, এবং তাঁরা ছাত্রদের একে একে ডেকে ঐ সম্পর্কে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

আমার ভাগে একটি পেলাম চর্মরোগ, সেটি বিশেষ কঠিন নয়। আর একটি রোগী দেখলাম, তার হার্টের দোষ আছে। হার্টের দরজার মুখে কিছু বিকৃতি থাকায়, পাম্প করা সত্ত্বেও তার সমস্তটা রক্ত ধমনীর মধ্যে পরিচালিত হয় না, কিছু রক্ত দরজার ফাঁক দিয়ে আবার হার্টের মধ্যে ফিরে আসে। এতে বুকে একরকম শব্দ পাওয়া যায়। রোগীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এ দোষ তার অনেককাল থেকেই আছে। কিন্তু অপরপক্ষে দেখলাম রোগী খুব শীর্ণ, দেহ প্রায় রক্তশূন্য, আর পেটে প্রকাণ্ড একটি পীলে। লিভারটাও কিছু বেড়েছে। মাঝে মাঝে তার খুব জ্বর হয়। মাসে দু'একবার তাকে শয্যাগত থেকে জ্বরভোগ করতেই হয়।

রোগীকে দেখেই বোঝা যায়, হার্টের দোষ থাকলেও আপাতত ক্রনিক-ম্যালেরিয়াতে তার এই অবস্থা। আমি তার অবস্থাগুলি যথাযথ বর্ণনা করে লিখলাম। শেষে চিকিৎসার সম্পর্কে লিখলাম যে, আগে তার ম্যালেরিয়া আর রক্তশূন্যতা আরোগ্য করবার চেষ্টা করাই খুব দরকার। হার্টের দোষটির সম্বন্ধে যথোচিত বর্ণনা দিলেও, তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই লিখলাম না।

যথাসময়ে পরীক্ষকদের কাছে আমার ডাক পড়ল। কয়েক প্রকার প্রশ্নোত্তর হয়ে যাবার পরে একজন পরীক্ষক আমার লেখা কাগজটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ তুমি কি লিখেছ? এ রোগীর এমন গুরুতর হার্টের দোষ রয়েছে, সে সম্বন্ধে কি চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে তা কিছু লেখ নি কেন?"

আমি বললাম—"আগে ওর ম্যালেরিয়া সারুক, তারপর সে-কথা বিবেচ্য। এখানে এই রোগটিকেই আমি প্রধান বিবেচনা করেছি।"

"ম্যালেরিয়া বেশি মারাত্মক, না হার্টের রোগটি বেশি মারাত্মক? যদি বলি

যে এই দুটি রোগের মধ্যে একটিকে তোমায় বেছে নিতে হবে, তাহলে তুমি কোনটিকে নিজে বেছে নেবে ?"

"ম্যালেরিয়াই অবশ্য বেছে নেব, কারণ এ রোগের ওষুধ জানা আছে, শীঘ্র সারিয়ে ফেলতে পারবো। কিন্তু হার্টের ও-রোগের চিকিৎসা করে সারানো খুব কঠিন। হার্টের ওরূপ একটা দোষ হওয়া কেউই চাইবে না।"

"অথচ ঐ হার্টের রোগটিকেই তুমি এখানে অবহেলা করলে। তোমার প্রেস্‌ক্রুপশনে ও-রোগের কোনো ব্যবস্থাই করলে না। রোগী তোমাকে তো একটিমাত্র রোগের চিকিৎসার জন্যে ডাকছে না, সে চাইছে যে তাকে তুমি সকল রোগ থেকেই সুস্থ করে তোলো।"

"আমি ভেবেছিলাম যে, ম্যালেরিয়া সেরে গেলে এবং গায়ে রক্ত হলে তখন সে আপনা থেকেই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে।"

"তাতে কি ওর হার্টের রোগটিও সেরে যাবে ?"

"তা নয়, তবে আমি এখানে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের পরীক্ষা দিতে এসেছি, তাই—"

"তাই কি অন্য রকমের রোগ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলবে না ?"

আমি এ-কথার আর কিছু জবাব দিতে পারলাম না। পরীক্ষকদের মধ্যে মিগো সাহেব ছিলেন। তিনি এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি, চুপ করে বসে থেকে মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। এবার সেই পরীক্ষকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দুজনেই হাসতে শুরু করলেন।

ওঁদের দুজনের ঐ হাসি দেখে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। আমার উত্তর নিশ্চয় ওঁদের মনঃপূত হয় নি। সেখান থেকে উঠে চলে আসতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত এসে আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, আমি চৌকাঠ ধরে সেখানেই হঠাৎ ধপ্‌ করে বসে পড়লাম।

মিগো তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। কাছেই একটা বেঞ্চের ওপর আমাকে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে ধরলেন। তখনই সুস্থ হয়ে আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললাম—"আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আমি সুস্থ হয়েছি। কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করলাম তো ?"

তিনি বললেন—"না না, তুমি ভালোভাবেই পাস করেছ। এখন ও-কথা ভেবো না, লাইব্রেরিতে গিয়ে বিশ্রাম নাও। পরে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

লাইব্রেরিতে বসে শুনলাম, ছাত্রদের মধ্যে আরো কয়েকজনের ভাগে ঐ

রোগীটি পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ হার্টের রোগকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

উদ্বিগ্ন মনে মিগোর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি হেসে বললেন—"তুমি ঠিকই তো করেছিলে। কিন্তু অমন ঘাবড়ে গেলে কেন? আরো জোরের সঙ্গে তোমার বলা উচিত ছিল যে, দেহে যখন বাইরের একটা রোগজীবাণু এসে নতুন আক্রমণ করেছে, তখন ভিতরে কী পুরোনো বারোমেসে দোষ রয়েছে সেদিকে নজর দেবার দরকার নেই, আগে উপস্থিত শত্রুর নিপাত করা চাই।"

পরীক্ষার ফল যখন বেরোলো তখন দেখলাম যে আমি ভালোভাবেই পাস করেছি। প্রোটোজুলজি ও ফার্মাকোলজিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। সকলেই যে এই পরীক্ষায় পাস করতে পেরেছে তা নয়। অনেকগুলি ছাত্রই একাধিক বিষয়ে ফেল হয়েছে।

ছেলেবেলাকার কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। তখনও এক পরীক্ষাতে ফাষ্ট হয়েছিলাম। সেবার এক ডবল-প্রমোশনেই আমাকে মাটি করেছিল। এবারেও যেন তেমন দুর্ভাগ্য কিছু না হয়।

॥ বারো ॥

ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিদ্যা শিখে যে আমার কত উপকার হয়েছে তা শিক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর কয়েকটি ঘটনা থেকে প্রত্যক্ষ বুঝতে পারলাম।

একটি হলো, আমার নিজেরই ভাইয়ের এক বিচিত্র রকমের অসুখ। প্রথমে দেখা গেল যে তার মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে আর মাঝে মাঝে তা ছেড়ে যাচ্ছে। দুদিন সে ভালো থেকে কাজে যায়, তার পরেই হঠাৎ জ্বরে তিন-চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকে, আবার সেরে উঠে যেমনি দুদিন কাজে যেতে শুরু করে অমনি আবার জ্বরে পড়ে। শুধু জ্বর নয়, জ্বরের সঙ্গে শরীরে নানারকম যন্ত্রণা, চোখ লাল, সর্বাঙ্গে ব্যথা, মাথাধরা ইত্যাদি। ঐ জ্বর এলেই তাকে একেবারে কাবু করে ফেলে। জ্বরের মাত্রাও খুব বেশী, সঙ্গে সঙ্গে তার উপসর্গও অসহ্য।

আমি বললাম, "এ নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া, কুইনিন খাও, সেরে যাবে।" কুইনিন সে যথেষ্টই খেলে, কিন্তু জ্বর যেমন হচ্ছিল তেমনি হতে থাকল।

আমি তখন ট্রপিক্যালের পড়াশোনা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, কুইনিন খেতে বলা ছাড়া ওর এই জ্বরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু গ্রাহ্য করছি না। সেটা বুঝতে পেরে আমার ভাই তার পরিচিত অপর একজন ডাক্তারকে এনে দেখাতে লাগল। কিন্তু সেই ডাক্তারের চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছু ফল হলো না। জ্বর ঐভাবেই চলতে থাকল। যে ওষুধই দেওয়া হোক তাতে জ্বর আসা বন্ধ হয় না।

সেই ডাক্তারটি তখন শহরের একজন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে এনে তাঁর সঙ্গে কন্‌সাল্ট করলে। তিনি বললেন, "মুখে ওষুধ খাইয়ে কিছু হবে না, কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে দেখ।" কিন্তু তাতেও ফল না হওয়াতে তিনি বললেন, "সম্ভবত কোলাই জীবাণুর জ্বর, কোলাই ভ্যাক্সিন প্রভৃতি দাও।" তাতেও কিন্তু কিছুই ইতরবিশেষ হলো না। জ্বরের পালা যথারীতি চলতে থাকল।

তখন দ্বিতীয় একজন বড়ো ডাক্তারকে ডেকে এনে দেখানো হলো। তিনি নানারকম ওষুধ দিয়ে ব্যর্থ হয়ে কয়েকদিন পরে গম্ভীর হয়ে রায় দিলেন যে, হয়তো লুকিয়ে-লুকিয়ে কোথাও টি-বি আক্রমণ করেছে। কিছুদিন অপেক্ষা করে না দেখলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বাড়ির সকলে অত্যন্ত ভাবিত হয়ে উঠল। আমি ততটা গ্রাহ্য করছি না বা খবর নিচ্ছি না দেখে আমাকে কেউ আর কিছু বলে না। তা ছাড়া বড়ো বড়ো ডাক্তার এসেই যখন কিছু করতে পারছে না, তখন সেখানে আমি কি-ই বা করতে পারবো। এদিকে একমাস-দেড়মাস হতে চলল, অথচ জ্বরের কিছু কিনারাই হলো না। এক এক জন এক এক রকম বলে যাচ্ছে, আর সকলেই আরো চিন্তাকুল হয়ে উঠছে। আমি নিজের ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত আছি দেখে আমাকে কেউ কিছুই বলছে না।

সেদিন রবিবার। আমি বাড়িতেই আছি। আমারও মনে মনে একটা দুশ্চিন্তা লেগে রয়েছে, যদিও মুখে কাউকে কিছু বলি না। সেদিন অবসর থাকায় মনে করলাম যে ওর জ্বরের প্রকৃতিটা কেমন তা নিয়ে একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাক। যে যাই বলুক, আমি একবার নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে দেখি ওর কিছু কিনারা করতে পারি কি না।

রোগীর ঘরে গিয়ে বসে ওর জ্বর-লেখার খাতাখানা চেয়ে নিলাম। কোন তারিখে কতটা পর্যন্ত জ্বর উঠেছে নেমেছে আর কেমন ওর গতি, তারই একটা ধারণা করে নিতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম যে জ্বরের গতি খুব এলোমেলো,

দুদিন আছে দুদিন নেই। খাতায় চোখ বুলিয়ে দেখে গেলে তার প্রকৃতি ঠিক বোঝা যাবে না। এ জ্বরের একটা চার্ট প্রস্তুত করা দরকার। তাহলে হয়তো ওর প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

ছক্‌কাটা কাগজ এনে আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত জ্বরের এক লম্বা চার্ট প্রস্তুত করলাম। সেই চার্টখানি যখন চোখের সামনে মেলে ধরলাম, তখন একদৃষ্টিতেই চিনতে পারলাম, এ তো হুবহু রিল্যাপ্সিং ফিভারের চার্টের মতো। যাকে বলে 'পৌনঃপুনিক জ্বর'। এমন চার্ট আমি ক্লাসে নিজে কত এঁকেছি।

কিন্তু পৌনঃপুনিক জ্বরও কয়েক রকমের আছে। এটি তার মধ্যে কোন রকমের বলে মনে হচ্ছে? আমি দেখলাম এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে,—ঠিক তিন দিন জ্বর থাকে, পরের দুদিন থাকে না; আবার তিন দিন ধরে জ্বরটা বাড়তে থাকে, আবার পরের দুদিন জ্বর থাকে না। এমনিই চলে আসছে আগাগোড়া। এমন ধরণের চার্ট দেখলে 'র‍্যাট্‌-বাইট ফিভার' বলেই মনে হওয়া উচিত।

সেটা কি ব্যাপার সংক্ষেপে বলি। আমাদের ঘরে-দোরে যে-সব ইঁদুর ঘুরে বেড়ায়, তাদের কারো কারো শরীরে স্পাইরোকীটা-জাতীয় একরকম বিষাক্ত জীবাণু থাকে। সেই ইঁদুরে মানুষকে কামড়ালে ঐ জীবাণু থেকে এমনি এক পৌনঃপুনিক জ্বরের সৃষ্টি হয়। জাপানে এ-জ্বর খুবই হয়, একে তারা বলে 'সোডোকু'। আমাদের দেশেও পল্লীগ্রামের লোকে একে বলে ছুঁচুরের জ্বর যে ইঁদুরকে সাপে ধরেছিল তাকে বলা হয় 'ছুঁচুর', সেই সাপের বিষ থেকেই জ্বরের সৃষ্টি, তাই লোকের ধারণা। কিন্তু সেটা বাজে কথা, আসল কারণ ঐ জীবাণু। ডাঃ দাশগুপ্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন যে কলকাতার ইঁদুরদের মধ্যে শতকরা কুড়িটি ইঁদুরের দেহে এই জীবাণু প্রায়ই পাওয়া যায়।

চার্ট দেখে আমার সেই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে উঠল, এ নিশ্চয় ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর। আমার ভাইকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম—"তোকে কখনো কোনো ইঁদুরে কামড়েছিল?"

"তার মানে?"

"তার মানে রাত্রে ঘুমের সময় কোনোদিন হাতে কিংবা পায়ে ইঁদুরে কামড়ে দিলো বলে টের পেয়েছিলি?"

"তা হবে।"

"হবে নয়, ঠিক মনে করে বল।"

"তাই যেন মনে পড়ছে। প্রায় দেড়মাস-দুমাস আগে একদিন রাত্রে

ঘুমোতে ঘুমোতে কিসে যেন আমার পায়ের আঙুলে কুট্ করে কামড়ে দিলে। ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি উঠে আলো জেলে দেখলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। আঙুলে একটা কামড়ের দাগ দেখেছিলাম মাত্র, কিন্তু কোনো জ্বালাযন্ত্রণা ছিল না। মনে করলাম হয়তো পিঁপড়ে-টিঁপড়ে হবে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। সেটা ইঁদুরে-কামড়ানোও হতে পারে।"

"সেই ইঁদুরের কামড়েই তোর এই জ্বরটি হয়েছে। এ হলো ইঁদুর-কামড়ানোর জ্বর।"

বাড়ির সকলে আমার কথা শুনে হেসে উঠল। তাই নাকি হয়!

কিন্তু পরের দিন আমি ট্রপিক্যাল থেকে ডাঃ দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। তিনি এসে চার্ট দেখে বললেন—"জ্বরের প্রকৃতি দেখে তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু রক্ত পরীক্ষা করে দেখা উচিত। আমি শিরা থেকে খানিকটা রক্ত নিয়ে যাচ্ছি। এই রক্ত গিনিপিগের শরীরে ইন্‌জেকশন করে দেব। যদি এই রোগই হয় তাহলে পনেরো দিন পরে সেই গিনিপিগের রক্তের মধ্যে প্রচুর স্পাইরোকীটা দেখতে পাওয়া যাবে।"—এই বলে তিনি রক্ত নিয়ে নিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রোগীকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ আছে। তার আগেই কি একটা আর্সেনিক ইন্‌জেকশন দিয়ে দেখা যায় না? যদি ঐ রোগ হয় তাহলে নিশ্চয় তার ফল কিছু পাওয়া যাবে।"

তিনি বললেন—"তা দিয়ে দেখতে পারেন, রক্ত নেবার পরে দিতে দোষ কি।"

সেইদিনই আর্সেনিক ইন্‌জেকশন দেওয়া হলো। তৃতীয় দিনে জ্বরটি ছেড়ে গেল, এবং তারপর আর জ্বরই এলো না। দুটি মাত্র ইন্‌জেকশনে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। আশ্চর্য রকমেই সুস্থ হলো।

এ যে খুব গুরুতর রোগ তা নয়, দুই-তিনটি মাত্র ইন্‌জেকশনেই আরোগ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আগে রোগটিকে ঠিক ধরা চাই। আমি যদি ট্রপিক্যাল মেডিসিন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ না করতাম তাহলে এ রোগ কখনই ধরতে পারতাম না। কলকাতার ভালো ভালো একাধিক ডাক্তারই দেখেছেন, কিন্তু তাঁরাও এ রোগ ধরতে পারেন নি। ওর ঐ পৌনঃপুনিক রকমের জ্বরের চার্ট, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি, আর ইঁদুর-কামড়ানোর ইতিহাস—এগুলি জানা না থাকলে কেউই এ রোগ চিনতে পারে না। আমার যদি এই নতুন রকমের শিক্ষাটি না থাকতো তাহলে আমার ভাইকে আরো বহুকাল পর্যন্ত এই জ্বর ভোগ করতে হতো, এবং শেষ পর্যন্ত কি হতো তা বলা যায় না।

পনেরো দিন পরে ডাঃ দাশগুপ্তর কাছে খবর পেলাম, রক্তে প্রচুর স্পাইরোকীটা পাওয়া গেছে।

আরো একটি রোগীকে আমি ঐভাবে আরোগ্য করতে পেরেছিলাম। তিনি আমার এক বন্ধু, তিনিও একজন কৃতবিদ্য ডাক্তার।

ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছিল তাঁর অনেকদিন থেকে। প্রথমটা জ্বর বলে বুঝতেই পারা যায় নি। শরীরটা যেন খারাপ বোধ হতে থাকে, গা ম্যাজম্যাজ করে। ক্রমশ স্পষ্ট বোঝা গেল যে জ্বর হচ্ছে। ম্যালেরিয়া মনে করে কুইনিন প্রভৃতি খাওয়ানো হলো, কিন্তু তাতে জ্বর না কমে উত্তরোত্তর আরো বাড়তেই থাকল। তখন অন্যান্য ডাক্তারদের ডাকা হলো, তাঁরা বললেন টাইফয়েড কিংবা প্যারাটাইফয়েড। তারই যথারীতি চিকিৎসা হতে থাকল। কিন্তু এক মাস পার হয়ে যাবার পরেও সেই জ্বর কিছু কমল না, সমানেই চলতে থাকল।

জ্বরের সঙ্গে আর কোনো লক্ষণ নেই, কেবল লিভারটি বেড়েছে। তখন সবাই সাব্যস্ত করলেন, কোলাই জ্বর। তদ্রূপ চিকিৎসাতেও যখন সেই জ্বরের কিছু উপশম হলো না, তখন তাঁরা লিভারের জন্যে এমিটিন ইন্‌জেকশন দিতে শুরু করলেন। তাতেও কিছু কাজ হচ্ছে না দেখে হয়তো প্লুরিসি হতে পারে বলে নানারূপ অনিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

এই সময়ে আমি খবর পেয়ে একদিন এমনি তাঁকে দেখতে গেলাম। সেখানে গিয়ে রোগীর মুখেই সব ইতিহাস শুনলাম। তিনি নিজেও খুব ভাবিত হয়ে পড়েছেন, কি রোগ হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমি কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বললাম, আদ্যোপান্ত জ্বরের একটা চার্ট করে ফেলা যাক। তাহলে হয়তো কিছু হদিস মিলতে পারে। আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটা চার্ট প্রস্তুত করতে বসে গেলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল চার্ট তৈরী করতে। সেই চার্ট দেখে বুঝলাম, এ জ্বরের কোনোই ছন্দ নেই, কোনোদিন বাড়ে, কোনোদিন কমে। টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের চার্ট এমন হতেই পারে না। একটিমাত্র জিনিস লক্ষ্য করলাম এই যে প্রায়ই দৈনিক দুবার করে জ্বরটা বাড়ছে এবং কমছে।

এ জ্বরকে দ্বৈকালীন জ্বর বলা যেতে পারে। এই জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যদিও পীলে বাড়ে নি, কিন্তু লিভারটি ক্রমশ বাড়ছে। কালাজ্বরের কথা আমার আগের থেকেই মনে হচ্ছিল, হঠাৎ মনে পড়ল ট্রপিক্যাল হাসপাতালে এমন কালাজ্বরের রোগী দেখেছি যার পীলে না বেড়ে কেবল লিভারটাই বেড়েছে।

কর্ণেল ম্যিগো তাই দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে কালাজ্বরে কেবল যে পীলেই বড়ো হবে তা নয়, তার ব্যতিক্রমও হতে পারে।

আমি রোগীকে বললাম—"আমার মনে হচ্ছে তোমার এ কালাজ্বর।"

"সে কি? ও-কথা আজ পর্যন্ত কেউই বলে নি, কেবল তুমিই বললে। কেমন করে জানলে কালাজ্বর?"

"এই দীর্ঘকালীন জ্বরের চার্ট দেখে, আর এত বড়ো লিভার দেখে। কালাজ্বরের জীবাণুদের পক্ষে পীলেও যেমন একটি বাসা-বাঁধবার জায়গা, লিভারও তেমনি একটি বাসা-বাঁধবার জায়গা।"

"তুমি এ-কথা অন্য ডাক্তারদের সামনে বলতে পারবে?"

"নিশ্চয় পারবো।"

পরের দিন আবার গেলাম ডাক্তারদের আসবার নির্দিষ্ট সময়ে। আমার বক্তব্য তাঁদের কাছে বললাম।

তাঁরা গম্ভীর হয়ে বললেন—"বেশ তো, রক্ত পরীক্ষা করে দেখা হোক।"

আমি বললাম—"এক মাসের জ্বরে রক্ত পরীক্ষায় কালাজ্বরের চিহ্ন না মিলতে পারে। দুই-তিন মাসের কমে সেই বিশেষ চিহ্ন প্রকাশ পায় না। তবে রক্তের কাল্‌চার করা যেতে পারে। কিন্তু তারও ফল জানতে পনেরো-কুড়ি দিনের কমে হবে না। ততদিন পর্যন্ত কি রোগীকে এমনিভাবে ভুগতেই দেওয়া হবে? রক্তপরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত?"

"আপনি তাহলে কি করতে বলেন?"

"আমি বলি কালাজ্বরেরই ইন্‌জেকশন দু-একটি দিয়ে দেখতে। তাতে কোনো ক্ষতি হবে বলে আমার মনে হয় না।"

"আমরা কেউই সে দায়িত্ব নিতে রাজী নই। যদি আপনি নিজে সেই দায়িত্ব নিতে চান, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।"

"আমি সে দায়িত্ব নিতে সম্মত আছি।"

"কিন্তু দুটি মাত্র ইন্‌জেকশন আপনি দিতে পারেন, তাতে যদি কোনো ফল না হয় তাহলে আর দিতে পাবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তাই হবে।"

রক্তপরীক্ষা না করে কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন দেওয়া নিয়ম নয়। কিন্তু এখানে সে নিয়ম রক্ষা করতে গেলে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস এসে গিয়েছিল যে এটি নিশ্চয়ই কালাজ্বর। তাই আর অপেক্ষা না করে সেইদিনেই একটি কালাজ্বরের ইন্‌জেকশনের ওষুধ

আনিয়ে নিলাম। ডাঃ ব্রহ্মচারীর আবিষ্কৃত 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' তখন এ-রোগে ব্যবহৃত হচ্ছে, আর ওতে সুনিশ্চিত ফল হতে দেখা যাচ্ছে। তারই প্রথম মাত্রাটি আমি নিজেই ইন্‌জেকশন দিলাম।

পরের দিন থেকেই দেখা গেল জ্বর কিছু কম হচ্ছে। দুদিন পরে আরো একটি ইন্‌জেকশন দিলাম। দ্বিতীয় ইন্‌জেকশনের পরে জ্বর একেবারে ছেড়ে গেল। সবাই তখন স্বীকার করলে, এ রোগ কালাজ্বরই বটে।

কালাজ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভালোরকম শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে আমি এতটা সাহস কখনই করতে পারতাম না।

॥ তেরো ॥

ট্রপিক্যাল মেডিসিনে পাস করতে পারায় আমাকে আর মফঃস্বলে বদলি করা হলো না। কলকাতারই পুলিস-হাসপাতালে বিশেষ এক কাজের ভার পেয়ে গেলাম।

তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি-পরীক্ষার নবপ্রতিষ্ঠা চলেছে। প্রত্যেক হাসপাতালেই ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে, রোগীদের রক্ত প্রভৃতি সেখানেই যথাসম্ভব পরীক্ষা করা হয়। জটিল রকমের পরীক্ষার প্রয়োজন না হলে কলেজে বা অন্য বৃহৎ ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয় না। সাধারণ রকমের পরীক্ষাগুলি স্থানীয় ল্যাবরেটরিতেই সেরে নেওয়া হয়, এবং তার জন্যে আলাদা একজন প্যাথলজিস্ট বা ল্যাবরেটরি-পরীক্ষক নিযুক্ত থাকেন। কলকাতা পুলিসের হাসপাতালে কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো ল্যাবরেটরি ছিল না। কর্তৃপক্ষ তাই তখন একজন শিক্ষিত ল্যাবরেটরি-পরীক্ষকের সন্ধান করছিল। আমি পাস করে বেরিয়ে আসতেই আমাকে সেই কাজের জন্যে মনোনীত করা হলো।

আমার খুবই সুবিধা হয়ে গেল। অতঃপর কলকাতাতেই আমি থাকতে পাবো, প্র্যাক্‌টিসের দিক থেকেও কিছু বিঘ্ন হবে না। প্রত্যহ কেবল দুপুরের সময়টিতে কাজ করতে হবে হাসপাতালে, সকালে সন্ধ্যায় প্র্যাক্‌টিস করবার যথেষ্ট অবসর পাবো। হাসপাতাল অনেক দূর হলেও একটি মোটরগাড়ি থাকলে কোনোই চিন্তা নেই। আর প্র্যাক্‌টিসের মর্যাদা বাড়াবার জন্যেও মোটরগাড়ি রাখা এখন খুব দরকার। অতএব সেই ব্যবস্থাই করা হলো। দুপুর বারোটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আমি হাসপাতালে কাজ করতাম, তারপর ফিরে এসে নিজের ডাক্তারখানায় বসতাম। কিন্তু এই সময় থেকে

ডাক্তার রায়ের চেম্বারে যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। তার আর ফুরসত রইল না।

প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে হাসপাতালে নতুন ল্যাবরেটরি সাজিয়ে বসলাম। তখন ঐ হাসপাতালের বড়কর্তা ছিলেন কর্নেল দে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তি, তেমনি তাঁর নিখুঁত নির্মল চরিত্র। আর সকল বিষয়েই তেমনি উৎসাহী। ল্যাবরেটরির জন্যে যখন যেটি দরকার বলতাম তৎক্ষণাৎ তাই আনিয়ে দিতেন। দামী মাইক্রস্কোপ থেকে শুরু করে ইনকিউবেটর, স্টেরিলাইজার, ইলেকট্রিক সেন্ট্রিফিউজ প্রভৃতি একটি ভাল ল্যাবরেটরির পক্ষে আধুনিক যা যা সরঞ্জাম থাকা দরকার সমস্তই আনিয়ে নিলাম। নতুন উদ্যম নি:য় আমি নিজের কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করলাম।

শুধু নিজের কাজেই নয়, হাসপাতালের চিকিৎসার কাজেও আমি স্বতঃ-প্রণোদিত হয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতাম। কর্নেল দে যখন রোগী দেখতেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতাম। তিনিও এতে খুব খুশি হতেন, প্রত্যেক বিষয়ে আমার মতামত নিতেন, কোন রোগ সম্বন্ধে নতুন কি শিখে এসেছি জানতে চাইতেন। তিনি শুনেছিলেন যে আমি ভালোভাবে পাস করেছি, কোনো কোনো বিষয়ে ফার্ষ্ট হয়েছি, কাজেই তিনি আমার মতামতের একটা বিশেষ মূল্য দিতেন।

আর আমি? তাঁর এই সারল্যে আমার ভিতরে ভিতরে একটা গর্বভাবই এসে গিয়েছিল। সেই ছেলেবেলাকার সেই ডবল-প্রমোশনের মনোভাব। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো যে আমি তাঁকে নতুন কিছু শিখিয়ে দিলাম। তাঁর সেই কবেকার আমলের সেকেলে শিক্ষা, এইসব আধুনিক খবর তিনি কিছুই জানেন না। আমার এই গর্বের ভাবটি তিনি বুঝতে পারতেন কিনা, আর বুঝতে পেরে মনে মনে হাসতেন কিনা, সে কথা আমি বলতে পারি না। অন্ততপক্ষে বাহ্য আচরণে তা কিছুই দেখতে পাই নি। তিনি খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন।

কর্নেল দে যে আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী আর অনেক অভিজ্ঞ এ-কথা অনেক সময়েই আমার স্মরণ থাকতো না। যেন তিনি ভুল কাজ করছেন, আমি তাঁকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এই ভাবটাই কোনো কোনো সময় আমার ব্যবহারে এসে যেতো।

একবার একটি মেনিঞ্জাইটিস রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার রক্তপরীক্ষায় মেনিঞ্জাইটিস বলেই রোগ-নির্ণয় করা হয়েছে। ঐ রোগের

লক্ষণগুলিও বেশ পরিস্ফুট। রোগীর চোখদুটি রক্তবর্ণ, ঘাড় সর্বদা শক্ত হয়ে আছে, মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার করছে, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে যেখানে সেখানে থু থু করে থুতু ফেলছে, মাঝে মাঝে খাট থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইছে। খাটের সঙ্গে কাপড় দিয়ে তার হাত-পা বেঁধে রাখতে হয়েছে। এদিকে কোনো বাহ্যজ্ঞান নেই, ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দিচ্ছে না।

কর্নেল দে সেই রোগীকে দেখে মাথায় বরফ দিতে বললেন, কড়া মাত্রায় ঘুমের ওষুধ দিতে বললেন, নতুবা ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুমের ব্যবস্থা করতে বললেন, সিরাম ইন্‌জেকশন এবং আরো কয়েকরকম ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করলেন। এইসব মামুলী নির্দেশ দিয়ে তিনি অন্য রোগী দেখতে অগ্রসর হলেন।

আমি তখন তাঁকে বললাম—"এ রোগীর লাম্বার পাংচার করে মেরুদণ্ডের ভিতর থেকে জল বের করে দেওয়া উচিত।"

তিনি হেসে বললেন—"তাতে কোনো ফল হতে তুমি নিজের চোখে কখনো দেখেছ?"

আমি বললাম—"নিজের চোখে দেখি নি বটে, কিন্তু কেতাবে সকলেই তাই বলে। রোগী তাতে আরাম পায়, ঘুমিয়ে পড়ে, আর কখনো কখনো রোগটা ক্রমে সেরেও যায়।"

"আমি তো কখনো ওতে সারতে দেখি নি।"

"তবু চেষ্টা যতখানি পর্যন্ত করা সম্ভব তা আমাদের করা উচিত।"

কর্নেল দে তাই শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"আচ্ছা, তোমার উপরেই আমি এর চিকিৎসার ভার দিলাম। যা যা তোমার করা উচিত মনে হয় সব কিছুই করো।"

আমার খুব আনন্দ হলো। লাম্বার পাংচার করা অনেক দেখেছি, কিন্তু নিজের হাতে কখনো করি নি। এখানে সেই সুযোগটি পেয়ে গেলাম তাও বটে, আর আমার মনে মনে ধারণা ছিল যে রোগী ওতে সেরেও উঠতে পারে। চেষ্টা করতে দোষ কি।

প্রথমবারের লাম্বার-পাংচারে বেশ কৃতকার্যই হলাম। মেরুদণ্ডের মধ্যে জলের চাপ বেশি ছিল, পাংচারের মোটা ছুঁচটি ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়তেই ঝর্‌ঝর্ করে অনেকখানি জল নির্গত হয়ে গেল। তার ফলে দেখা গেল যে রোগীর মাথার যন্ত্রণা ও উত্তেজনার মাত্রা বেশ কমে গেল। আমার এই কৃতকার্যতায় বেশ খুশি হয়ে উঠলাম।

পরের দিন কিন্তু অত সহজে কিছু হলো না। দুই-তিন বার দুই তিন স্থানে ছুঁচ ঢুকিয়ে ব্যর্থ হয়ে যদি বা শেষে কিছু জল নির্গত হলো, তা রক্ত-মিশ্রিত। আর তাতে এবার রোগীর কষ্টের কিছু উপশম হলো না।

তৃতীয় দিনেও একই ব্যাপার। অনেক খোঁচাখুঁচির পরে তবে একটু জল বাহির হয়, কিন্তু তাতে কিছুক্ষণের জন্যে রোগী অসাড় হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো রকমের উপকার দেখা যায় না।

তবে এই ব্যবস্থায় দেখা গেল যে রোগী সাত-আটদিন পর্যন্ত বেঁচে রইল। তারপরে সে মারা গেল। অবশ্য এ কথা এখানে বলাই বাহুল্য যে, মেনিঞ্জাইটিসের ভালো ভালো আধুনিক ওষুধগুলি তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।

কর্নেল দে একটু হেসে আমাকে বললেন—"তোমার চিকিৎসায় কিছু ফল নিশ্চয়ই হয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি। লাম্বার পাংচার না করলে হয়তো দুই-একদিনের মধ্যেই লোকটি মারা যেতো, এতে সে সাত-আটদিন পর্যন্ত বেঁচে রইল। তাই বা মন্দ কি, চেষ্টা যথেষ্টই করা হলো, কিন্তু যে বাঁচবে না তার আর কি করা যাবে।"

আমি বুঝলাম, তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

কর্নেল দে এইভাবে আমাকে অনেক বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। শুধু তাই নয়, আমার সব কাজের তিনি সমর্থনও করতেন। পুলিসের লোকে ছুটি নেবার জন্যে কখনো কখনো মিথ্যা রোগের ভান করে থাকে। তাদের তিনি পরীক্ষার জন্যে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। আমি নানারূপ পরীক্ষা করে যাকে সত্যই অসুস্থ বলতাম তাকে তিনি ছুটি দিয়ে দিতেন, যাকে বলতাম সুস্থ, তার ছুটি নামঞ্জুর করতেন। আমার প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল। কখনো কখনো বাইরের কেসে আমাকে কিছু পাইয়েও দিতেন।

একবার এক জায়গায় তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন, রোগীর আঙুল ফুটিয়ে রক্ত তুলে এনে পরীক্ষা করবার জন্যে। কি রোগ হয়েছে ধরতে পারা যাচ্ছে না, তাই তার রক্ত পরীক্ষা করা দরকার। কাজটি খুবই সামান্য, কিন্তু সেখানে গিয়ে যা ঘটলো তা রূপকথার কাহিনীর মতো অসামান্য। কেমন করে সেই একটি দিনের কয়েক মিনিটের কাহিনীটুকু এখানে বলব বুঝতে পারছি না। কারণ আজ পর্যন্ত তার কোনো আদিও নেই, অন্তও নেই! আদিঅন্ত না থাকলে কোনো কাহিনী জমে না। কিন্তু যতটুকু যা দেখেছি ততটুকুই বলি।

রোগিনী এক নবাব-দুহিতা। তারা মস্ত ধনী। আলিপুর অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূমিতে পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যে রাজপ্রাসাদ। গাড়িতে গেলেও ফটক পার হয়ে বাগানের আঁকাবাঁকা পথগুলি অতিক্রম করে প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়। প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে হঠাৎ দিশাহারা হয়ে যেতে হয়, কোনদিক দিয়ে কোথায় যাবো ঠিক করতে পারা যায় না। চারিদিকেই মোটা মোটা থাম, গোলাকার ভাবে সাজানো। বারান্দা অতিক্রম করেই বিরাট হল্‌ঘর, তার পরেও ঘরের পরে ঘর। সকল ঘরই আসবাবপত্রে ঠাসা।

কর্নেল দে আগের থেকে টেলিফোনে বলে রেখেছিলেন, একজন দারোয়ান আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলল। ঘরের পর ঘর এবং বারান্দার পর বারান্দা অতিক্রম করে আমি চললাম। একে সাত মহলা বাড়ি বলা যেতে পারে, মহলের পর মহল অতিক্রম করে চলেছি। কিন্তু লোকজন কাউকে দেখছি না। ঘরগুলি ফাঁকা, আবছা অন্ধকারময়, রকমারি আসবাবপত্রে সাজানো।

অবশেষে দোতলায় এক প্রকাণ্ড ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। সেই ঘরে এক খাটে তরুণী রোগিণী শুয়ে আছে। তার পাশে একজন নার্স দাঁড়িয়ে আছে। সে-ঘরটিও অন্ধকার, বাইরের থেকে এসে দাঁড়ালে ঘরের মধ্যে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। কিন্তু রক্ত নিতে হলে আমার প্রচুর আলো চাই। আমি নার্সকে বললাম জানলাগুলি খুলে দিতে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি উত্তর দিকের জানলা খুলে দিতেই সমস্ত ঘরখানা আলোয় ভরে গেল।

সেই আলোতে এবার রোগিণী'কে ভালো করে দেখতে পেলাম। কিন্তু তার দিকে চেয়েই আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মানুষের দেহে এত রূপ! সে রূপ সম্ভাব্যের অতীত, কল্পনার অতীত, বিশ্বাসের অতীত। এমন রূপ যা উপমারও অতীত। গানের সুর হঠাৎ মূর্তি নিয়ে দেখা দিলে যেমন হয়, ঝরণার জল-তরঙ্গ হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ মেলে চাইলে যেমন হয়—কিন্তু এসব উপমাও একেবারে নিরর্থক। এতে আসল জিনিসের কণামাত্রও বোঝানো যাচ্ছে না। কাঠখোট্টা ডাক্তার মানুষ আমি, ছুরি কাঁচি আর মাইক্রস্কোপ নিয়ে কারবার করি, পোকামাকড় আর রোগ-বীজাণুর বর্ণনা করতে জানি, ভগবানের শ্রেষ্ঠ শিল্প সেই নারীরূপের বর্ণনা কেমন করে করি! পরী-হুরীদের গল্প নিশ্চয় ছেলেবেলাতে সকলেই শুনেছে, আমিও শুনেছি। কখনো চোখে দেখব এমন কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। সেদিন নিজের চর্মচক্ষে তাই আমি দেখলাম।

আমার এই সব কথা শুনে কেউ যেন হাসবেন না। হয়তো আমি এখানে অনধিকার প্রয়াস করে ফেলছি। কিন্তু ডাক্তারও মানুষ। ডাক্তারেরও মনে

কিছু চেতনা থাকে, তারও একটা সৌন্দর্যজ্ঞান থাকে। তবে সৌন্দর্য চেনার মতো হুঁশ থাকা চাই। যার সেই হুঁশ থাকে সে একমুহূর্তের দেখাতেই সুন্দরকে চিনে নিতে পারে, কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। আমার এক মুহূর্তেই ধারণা হলো এ-সৌন্দর্যের তুলনা নেই। এমন কচিৎ হয়। সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ।

মেয়েটি শুয়ে আছে, সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। কেবল তার মুখখানি এবং হাত দুখানি বাইরে বের করা। ঐটুকুই দেখতে পাচ্ছি। গলা পর্যন্ত দেখেই বুঝতে পারছি তার গায়ের রঙে চাঁপার চেয়ে গোলাপের আভাটাই বেশি। স্বচ্ছ চামড়াকে ভেদ করে সেই গোলাপের লালিমা যেন ফেটে বেরোচ্ছে। চোখ দুটি ত্রস্ত হরিণীর মতো। সেই চোখের কচিং পল্লব পড়া, তারই বা কি মনোহারিত্ব! তারও যেন একটা স্বর্গীয় কিছু ভাষা আছে। নাকের মুখের গঠন কি নিখুঁত, যেন পাথর কুঁদে বের করা। দাঁতগুলি মুক্তার পাঁতির মতো নিখুঁতভাবে সাজানো। কিন্তু এসব বর্ণনা থাক। মেয়েটি কুমারী, ষোলো-সতেরোর মতো বয়স। ফুলটি এখনও আধফোটা, তাতেই এত সুন্দর। শরীর অসুস্থ সত্ত্বেও সুন্দর, বোধ করি অসুস্থ হয়েছে বলেই আরো সুন্দর। সে ফুল হাত দিয়ে ধরবার মতো নয়, যেখানে ফুটে আছে সেখানে সেই অবস্থাতেই দূর থেকে ঝুঁকে দেখবার মতো। অসংখ্য রকম ফুলের মধ্যে যেমন অপরূপ গোলাপ মাত্র দু-চারটি ফোটে, অসংখ্য রূপের মধ্যে তেমনি এমন অপরূপ সৌন্দর্য দু-চারটি মাত্রই দেখা যায়। তাই দেখে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিধাতার কথা, তাঁর এ অপরূপ সৃষ্টিকে তারিফ না করে পারা যায় না। কেবল মনে হতে থাকে, বাহবা বাহবা, এ কী সামগ্রী আজ দেখলাম!

এই সুন্দরী মেয়েটির সেই পুষ্পকলির মতো কোমল আঙুল ফুটিয়ে আমাকে রক্ত নিতে হবে! আমি বিব্রত বোধ করে কিছুক্ষণ ইতস্তত করতে থাকলাম। কি করা যায়! খুব কম আঘাত দিয়ে কেমন করে এর রক্ত নেওয়া সম্ভব হতে পারে!

ট্রপিক্যালে থাকতে দেখেছিলাম, রক্তের স্লাইড কেমন করে টানতে হয় তাই দেখাবার জন্যে নোল্‌স সাহেব ছুঁচ দিয়ে যখন-তখন নিজের আঙুল ফুটিয়ে রক্ত বের করতেন। প্রত্যেকবারেই তিনি ছুঁচ ফোটাতেন নখের কোলে, বলতেন যে ঐখানে ফোটালে নাকি সবচেয়ে কম ব্যথা লাগে। আমরা দেখতাম তিনি অম্লানবদনে নিজের হাতের ঐখানে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিতেন। সেই কথা স্মরণ হওয়াতে আমি মনে করলাম যে, আঙুলের ডগাতে না ফুটিয়ে ওর নখের কোলেই ছুঁচটা ফোটাই, তাহলে হয়তো কিছু কম ব্যথা লাগবে।

প্রথমে তোড়জোড় করে নিতে কিছু সময় লাগল। ছুঁচটি একটু আগুনে পুড়িয়ে নিলাম, আঙুলটি অ্যালকোহল ঈথর দিয়ে বার বার শোধন করে নিলাম। তার পর মনের মধ্যে একটু কাঠিন্য এনে দিলাম সেখানে ছুঁচ ফুটিয়ে। বোধ করি ছুঁচটা কিছু ভোঁতা ছিল, কিংবা হয়তো যতটা জোরে ফোটানো উচিত ছিল মমতাবশত ততটা জোর দেওয়া হয় নি—যে কারণেই হোক, সেখান থেকে এত সামান্য একটুখানি রক্ত বেরিয়ে এলো যা নিয়ে কোনো কাজ হয় না। ওর চেয়ে আমার আরো অনেকটুকুই রক্ত চাই। অথচ দেখলাম ওই খোঁচাতে বেচারার বিলক্ষণ আঘাত লেগেছে। হঠাৎ ছুঁচের খোঁচা খেয়ে সে আপাদমস্তক চমকে উঠল, তারপর আমার দিকে চেয়ে আতঙ্কমিশ্রিত ভাবে একরকম করুণ হাসি হাসলে। যদিও মুখে কিছু বললে না, কিন্তু চোখ দেখেই বোঝা গেল, বড্ড লেগেছে।

কিন্তু এ কি হলো! অতি তুচ্ছ একটা কাজ, ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত একফোঁটা বের করা, তাই আমি পারলাম না! এ কি হলো আমার! দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে আমি গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম। আবার তো একবার ছুঁচটা ওর হাতে ফোটাতেই হবে, নইলে রক্ত নেওয়া যাবে না। বুদ্ধির দোষে আমায় একবারের জায়গাতে দুবার কষ্ট দিতে হবে। কোনো উপায় নেই, যা করবার তা করতেই হবে। কিন্তু কি বলে সেটা প্রস্তাব করা যায়!

অনন্যোপায় হয়ে আমি তখন একটা ভান করলাম। যেটুকু রক্ত বেরিয়েছে সেইটুকুই স্লাইডে মাখিয়ে নিয়ে আমি বললাম—"আরো একবার কষ্ট দেবো, এবার অন্য হাত থেকেও একটু রক্ত নিতে হবে। পরীক্ষার জন্যে দুই হাতেরই রক্ত নেওয়া দরকার কিনা!"

মেয়েটির মুখখানি ভয়ে উদ্বেগে অত্যন্ত ম্লান হয়ে এলো। তার চোখের সেই অপরূপ পল্লবগুলি জলে ভিজে এলো, চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে বুঝি। সে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নার্সের দিকে বড়ো কাতরভাবে চাইলে। কিন্তু নার্সের মনে কোনো দয়ামায়া নেই, সে অন্যদিকের হাতখানি ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—"কিচ্ছু লাগবে না, এক সেকেণ্ডের তো কাজ, আমি জোর করে চেপে ধরছি। তুমি বরং একটু চোখ বুজে থাকো, এক্ষুণি হয়ে যাবে।"

আর আমিও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এবারেও ব্যর্থ হলে আর রক্ষা নেই। মায়া-মমতাকে দূরে হাটিয়ে দিয়ে আমি এবার অন্য হাতের আঙুলের ডগাতেই সজোরে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিলাম। এবারে আশানুরূপ ভাবেই রক্ত ছুটে

বেরোলো বটে, কিন্তু মেয়েটি দ্বিগুণ জোরে চমকে উঠল। তার চোখের কোল দিয়ে এবার জল ঝরে পড়তে লাগল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছে ফেললে। হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—"আরো দরকার হবে নাকি ?"

আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললাম—"না, এতেই যথেষ্ট হবে।"

যথারীতি রক্তের স্লাইড প্রভৃতি নিয়ে আমি চলে এলাম।

এইটুকুই মাত্র আমার রূপকথার কাহিনী। অনেক বড়ো বড়ো অপারেশন করেছি, তাতে অনেক উদ্বেগ আর অনেক দায়িত্ব, কিন্তু সেই সকল ক্ষেত্রেও কখনো আমি কিছুমাত্র কাতর হই নি। আর সেদিন সামান্য আঙুল ফুটিয়ে এক-ফোঁটা রক্ত নিতে গিয়ে এতই বিচলিত হয়ে পড়লাম, সে কথা বলবার নয়। বহুদিন পর্যন্ত আমার স্মরণ হতে থাকল ঐ ফুলের মতো মেয়েটিকে অনর্থক অমন ব্যথা দেওয়ার কথা। সেই ব্যথা বহুদিন পর্যন্ত বাজতে থাকল আমার অন্তরে। যাকে ব্যথা দিয়েছি, জীবনে তাকে একবার মাত্রই দেখেছি। মনে হয়েছিল যে, বিশ্বশিল্পীর সৌন্দর্যসৃষ্টির সে বুঝি এক পরাকাষ্ঠা। ভাগ্য-ক্রমে দৈবাৎ আমার নজরে সে পড়েছিল। আর ঐভাবে তাকে কষ্ট দিয়েছি।

কিন্তু সেই সুন্দরী মেয়েটির কোনো খবরই আর জানি না। সে এখন কোথায়? সে কি আজও বেঁচে আছে? কিছুই বলতে পারবো না। রক্তপরীক্ষায় তার রোগ ধরা পড়ে নি। কর্নেল দে'র কাছে পরে শুনেছিলাম, তিনি নাকি টি-বি বলে সন্দেহ করছেন। তার পরেই তিনি ওখান থেকে উচ্চতর পদে বদলি হয়ে গেলেন।

কেমন করে সেই নবাব-কন্যার খবর আর আমি পেতে পারি? কিন্তু, সে খবর না পাওয়াই ভালো হয়েছে—তাতে হয়তো আমার এই রূপকথার মোহটুকু ভেঙে চুরমার হয়ে যেতো।

॥ চোদ্দ ॥

বাইরের চেহারা দেখে ভুলতে নেই, এ শিক্ষা জীবনে আমি অনেকবারই পেয়েছি। বাজারে বেশ লাল-লাল আম দেখে লুব্ধ হয়ে কিনে আনলাম, কিন্তু বাড়িতে এসে খেয়ে দেখি তা জোঁদা টক, অখাদ্য। কিন্তু সে কথা যাক, আমি এখানে বলছি সুন্দর চেহারার কোনো কোনো মানুষের সম্বন্ধে।

বাহ্য সৌন্দর্যের মধ্যে মারাত্মক বিষও থাকতে পারে, তাতে অপরের

সর্বনাশও হয়ে যেতে পারে। আমার ডাক্তারি জীবনের মধ্যে এ আমি অনেকবারই দেখেছি। প্রায় এটাই অধিকাংশ স্থলে দেখেছি যে বাইরে যত সুন্দর ভিতরে তত অসুন্দর, ভিতর-বাহির দুই-ই সুন্দর এমন খুব কমই মানুষ হয়। তা ছাড়া আরো দেখেছি যে, সুন্দরের নেশাও একরকমের আছে, অর্থাৎ সুন্দর চেহারা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এ নেশা যাকে একবার ধরে তার আর মনুষ্যত্ব বলে কিছুই থাকে না, বুদ্ধি-বিবেচনা সব-কিছু তার লোপ পেয়ে যায়। এমন ঘটনার কথা আমি অনেক জানি, কিন্তু সে-সব গল্প খুলে বলা যায় না। একটিমাত্র ট্রাজেডির কথা এখানে বলছি।

সুধীর ঘোষাল সুন্দর দেখতে হলেও নিজের শরীর সম্বন্ধে বেজায় খুঁতখুঁতে। সামান্য যদি একটু নাকে সর্দি হলো, কি গায়ে ফুস্‌কুড়ি হলো, কি গালে ব্রণ বা মাথায় খুস্‌কি হলো, কি ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে হাত-পা একটু ছড়ে গেল, তাহলে আর রক্ষা নেই। ডাক্তারখানাতে দুবেলাই এসে আমাকে জ্বালাতন করবে, একটু কিছু ওষুধ লাগিয়ে দিতে হবে, তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হবে 'সেরে যাবে, সেরে যাবে', যদি তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দিতে যাই তাহলেই দারুণ অভিমান করে বসবে। তাকে আমি একটু ভালোবাসতাম, কাজেই সেটুকু পারতাম না। স্নেহের আবদার সইতেই হতো।

তার এমনি খুঁতখুঁতে হবার কিছু কারণও ছিল। সে দেখতে বেশ সুপুরুষ। সেইটুকুই তার পরম শ্লাঘার বিষয়। চেহারাটিকে সে তেমনি নিখুঁত সুন্দর করে রাখতে চায়, একটু কিছু ত্রুটি হবার সম্ভাবনা দেখলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পাছে তার চেহারা খারাপ হয়ে যায় এই ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। তা ওর চেহারাটি সত্যই দেখবার মতো। লম্বা ঋজু সুঠাম দেহ, গায়ের রঙ গৌরবর্ণ, তার মধ্যে বেশ একটু দীপ্তিও আছে। বুক প্রশস্ত, কোমর তার তুলনায় সরু, বাহু আজানুলম্বিত। মুখের ভাবটি সর্বদাই হাসি-হাসি, চোখের চাহনি স্নিগ্ধ ও বুদ্ধিব্যঞ্জক। দেখলেই মনে হয় যে, সাধারণ পাঁচজনের মধ্যে এ-লোকটি নিশ্চয় বিশিষ্ট কেউ একজন। সত্য কথা বলতে কি, আমিও তাকে ভালোবেসেছিলাম ঠিক ঐ কারণেই। ভালো চেহারার মানুষ আজকাল আর প্রায় চোখে দেখা যায় না। দেহসৌন্দর্যের একটা বিশেষ মর্যাদা নিশ্চয়ই দিতে হয়।

কিন্তু চেহারার যথেষ্ট চেক্‌নাই থাকলেও পুরুষোচিত দৃঢ়তার লক্ষণ তার ছিল না। গায়ের মাংসপেশীগুলি সবই নরম, পুরুষের কঠিনতা নেই। মুখের ভাবও নরম, দৃপ্ত তেজস্বিতা নেই। বোধ করি এই নারীসুলভ কোমল

কমনীয়তাকে ঢাকা দেবার জন্যই সে একটু গোঁফ রেখেছিল। প্রত্যহই দাড়ি কামাতো, আর গোঁফটি সযত্নে ছেঁটে রাখতো। সেই অল্প গোঁফে তাকে মানাতোও ভালো।

বেশভূষাতেও ছিল যথেষ্ট পারিপাট্য। শৌখিন মানুষ, কাজেই সব-কিছুই তার নিখুঁত হওয়া চাই। বাহান্ন ইঞ্চি বহরের মিহি ধুতির পাড়টি পায়ের গোছ পর্যন্ত লুটোতে থাকবে, পিছনে আল্‌গাভাবে মালকোছা দেওয়া, বাতাসে পরনের কাপড়টা কাবুলীদের পা-জামার মতো ফুলে উঠবে। গায়ে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবি, কাঁধে সোনার বোতাম লাগানো। শীতের দিনেও সেই পাঞ্জাবি চলবে, তার নীচে থাকবে উলেন গেঞ্জি, উপরে থাকবে ধব্‌ধবে সাদা আলোয়ান। পায়ে কাবুলী নাগরা, শৌখিন ধরনের। পকেটে ভুর্‌ভুরে সেণ্ট মাখানো রুমাল, হাতে সোনার রিস্টওয়াচ। অফিস যাবার বেশভূষা আবার অন্যরকম। তখন ক্রীম-রঙের চাইনীজ সিল্কের স্যুট, গলায় রঙ-বেরঙের নেক্‌টাই। মাথায় কিন্তু কোন টেরি নেই। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, সব সময়েই তা অবিন্যস্ত, যেহেতু তাতেই ওকে আরো বেশি সুন্দর দেখায়। প্রত্যহই চুল আঁচড়ায়, তার পরে আবার সেগুলোকে এলোমেলো অবিন্যস্ত ক'রে দেয়।

ওর বাপ-মা কেউ জীবিত নেই। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে তা জানি না। থাকে আমাদের পাড়ায় এক মেস-বাড়িতে, তেতলায় আলাদা একটি ঘর নিয়ে। সে ঘরটি অতি পরিপাটি করে সাজানো, দামী দামী আসবাবপত্র সমস্তই ওর নিজের। অর্থের কোনো অভাব নেই, কারণ সরকারী দপ্তরে কোনো বড়ো অফিসারের নিজস্ব টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফারের কাজ করে, বেশ মোটা বেতন পায়। সাহেব ওকে খুব পছন্দ করেন, মফস্বলে কোথাও গেলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যান, গরমের সময় প্রতিবছর সিমলা পাহাড়ে নিয়ে যান। তখন আরো বেশি অর্থলাভ হয়। একা ব্যাচিলর মানুষ, কাজেই ওর আর্থিক অবস্থা সর্বদাই সচ্ছল। কোনো রকম নেশা কিংবা বদ-খেয়াল নেই, এমন কি পান সিগারেট পর্যন্ত খায় না। অন্য কোনো কারণে নয়, পান খেলে সাদা দাঁতগুলোর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে, আর সিগারেট প্রভৃতি খেতে শুরু করলে ঠোঁট কালো হয়ে যাবে, আঙুলে বিশ্রী দাগ ধরবে।

এই সুধীর ঘোষাল প্রায়ই সন্ধ্যার পরে আমার কাছে এসে বসতো, গল্প-গুজব করে আমাকে খুশি রাখবার চেষ্টা করতো। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলে, চেহারার সৌন্দর্য অটুট রাখতে হলে একজন ডাক্তারের সংস্পর্শে থাকা খুবই

দরকার। সকল বিষয়েই তার কাছ থেকে সাহায্য ও সমুচিত পরামর্শ মিলতে পারে। কোন্ ঋতুতে কোন্ জিনিসটা খাওয়া ভালো, দুধ খাওয়া ভালো না দই খাওয়া ভালো, মোষের দুধ খেলে কেমন হয়, প্রত্যহ দুটো করে ডালিম-বেদানা খেলে গায়ের রঙ আরো খোলে কিনা, রোজ ভোরে উঠে কয়েকটা করে ডন দিলে কেমন হয়, শীতের সময় মুখের চামড়াতে ক্রীম লাগানো ভালো না দুধের সর লাগানো ভালো, মাথার চুলে কি দিয়ে শ্যাম্পু করলে চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে—ইত্যাদি কত কথাই যে তার জানবার আছে, সবই আমার কাছে যতবার খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারে। তা ছাড়া কোনো কিছু অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়লে আমি তো আছিই।

ওর মিষ্ট অমায়িক ব্যবহারে আমারও ওকে ভালো লেগেছিল। কোনো কিছু সাতে পাঁচে নেই, পলিটিক্স বা কমিউনিজ্‌ম নিয়ে কোনো অনধিকার চর্চা করে না, পাড়ার গুজব নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতে যায় না। সে শুধু থাকে তার নিজের তালে। ভালো ভালো বই কিনে পড়ে, বুক-স্টলে নতুন কিছু বই দেখলেই তৎক্ষণাৎ তা কিনে ফেলে। পছন্দসই বই হলেই আমাকে তা পড়তে দেয়। মাঝে মাঝে সে সিনেমা দেখে। সাহেবপাড়ার সিনেমাতে কোনো ভালো বই এলে সাধ্যসাধনা করে আমাকেও সেখানে টেনে নিয়ে যায়।

সম্প্রতি সুধীরের মনে খুবই ইচ্ছা হলো, ও একটা বিয়ে করে ফেলবে। জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে বিয়ে-করাটাই তো বিশেষ দরকার। সংসারে নারীজাতীয়া সঙ্গিনীর কোনো অভাব নেই। কিন্তু তা নয়, ও চায় মনোমতো একজন অর্ধাঙ্গিনী থাকবে, একজন অন্তরঙ্গ পার্টনার ঘরে থাকবে। তাকে নিয়ে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দুজনে মিলেমিশে বাস করবে, পরস্পরে পরস্পরকে সুখ শান্তি আর তৃপ্তি দিতে থাকবে। সেই হলো ওর পরবর্তী বয়স্থ জীবনের পুরোপুরি আদর্শ।

এইসকল গুহ্য মনের কথা সুধীর যে আমার কাছে ইদানীং বলতে আরম্ভ করেছিল, তারও কিছু কারণ ছিল। একটি কলেজে-পড়া মেয়ে মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতো। পশ্চিমে একবার বেড়াতে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল। তিনি বিদেশে-বিদেশেই চাকরি করেন। তাঁর দুই মেয়ে পিঠোপিঠি, বিভা আর প্রভা, তারা দুজনেই কলকাতায় হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। বড়ো মেয়ে বিভা এম. এ. পড়ছে, সে থাকে এক হস্টেলে, আর ছোটো মেয়ে প্রভা বি. এ. পড়ছে, সে থাকে অন্য

হস্টেলে। বিভা থাকে আমার কাছাকাছি, প্রভা থাকে একটু দূরে। ওদের মধ্যে সেই বিভাই কখনো কখনো আসতো আমার কাছে। মেয়েটি বড়ো মিষ্টি ও মিশুক প্রকৃতির। আর তার বাবা আমাকে বলেও দিয়েছিলেন ওদের একটু দেখাশোনা করতে। কিন্তু প্রভা অনেকটা গুমুরে প্রকৃতির, সে কখনো আমার কাছে আসতো না। ঐ বিভাই কেবল আসতো। এমন কি আমার হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতেও সে গিয়ে হাজির হতো। এমনিই বেড়াতে যেতো।

এই বিভার প্রতি সুধীরের নজর পড়েছিল। এলেই বারে বারে ওর দিকে চাইত। বিভা প্রথমটায় এতে বিরক্ত বোধ করত। কিন্তু ক্রমশ দেখলাম সেই বিভাও মাঝে মাঝে ওর দিকে চাইতে শুরু করেছে। এমনি করে ওদের মধ্যে কোন্ সময় একটু ভাবসাব জমে উঠেছিল।

বিভা যে এমন কিছু সুন্দরী তা নয়। বরং প্রভা ওর চেয়ে দেখতে ভালো। বিভার চেহারাতে কতকগুলি খুঁত ছিল। সে একটু বেশি রকমের ঢ্যাঙা, গায়ের রঙ ময়লাই বলতে হয়, চোয়ালের দিকটা চওড়া, নাক একটু চাপা ইত্যাদি। মেয়েরা বিচার করতে বসলে হয়তো তার আরো অনেক খুঁত দেখিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আমার মনে হয় যৌবনকালে সাধারণত কোনো মেয়েই দেখতে খারাপ হয় না, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্যের জৌলুষ তার মধ্যে থাকেই। বিভার মুখের হাসিটি ছিল সরল ও অকৃত্রিম, মনটি যে সাদাসি'ধা তা ওর হাসি দেখেই বুঝতে পারা যায়। অমন উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে হলেও তার কোনো 'চাল' নেই, খুব সাধারণ ভাষাতে সকলের সঙ্গে সোজা কথা বলে, তার মাঝে ইংরেজীর কোনো অনাবশ্যক বুকনি থাকে না। ব্যবহার একেবারেই অনাড়ম্বর ও অমায়িক। শিক্ষিতা মেয়ের এমনি সরল সুমিষ্ট ব্যবহারেরই তো অনেক বেশি দাম। আর তা ছাড়া বিভা মেয়েটির স্বাস্থ্য খুব ভালো, হাত-পায়ের গড়ন একেবারে নিটোল। আমাদের বাংলাদেশে এমন স্বাস্থ্যবতী মেয়ে খুব কমই দেখি, বোধ করি পশ্চিমে ছিল বলেই এমন। প্রভাও স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু তার গায়ের রঙ ফরশা, কাজেই অন্যান্য বিষয়ে কিছু ত্রুটি থাকলেও লোকে দুইবোনের মধ্যে তাকেই সুন্দরী বলবে।

যাই হোক, সুধীরের সঙ্গে বিভার আচরণ দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, দুজনেই অন্যভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। বিভা তো আকৃষ্ট হবেই, সুধীরের অমন সুন্দর চেহারা, তার উপর তার সুসভ্য ধরনধারণ। আর সুধীর আকৃষ্ট হচ্ছে বিভার রূপে নয়, গুণে। বুঝতে পেরে আমি সময় থাকতে সুধীরকে সাবধান

করে দিলাম। বলে দিলাম যে, ব্রাহ্মণে ও বৈদ্যে আমাদের সমাজে বিয়ে হওয়ার রীতি নেই, ওর বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। বললাম যে, তোমারা এখন থেকে সাবধান হও, ঘনিষ্ঠতা আর বেশি বাড়তে দিও না। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হতে পারে না।

কিন্তু তখন কে কার কথা শুনছে! মোহ লাগার কাজ একবার যখন শুরু হয়ে যায় তখন আর কি তাকে কোনো ভয় দেখিয়ে থামানো যায়? আমি অসন্তুষ্ট হচ্ছি দেখে ওরা আমাকে লুকিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করলে।

সুধীর 'ভাই' বলে পরিচয় দিয়ে বিভার হস্টেলে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল। ছুটিছাটার দিনে, শনিবারের বিকেলে ওদের দেখা হতে থাকল ইডেন-গার্ডেনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে, রেস-কোর্সের ধারে, আরো নানা স্থানে। তা আমার নজরেও একদিন পড়ে গেল। এ ছাড়া সিনেমাগুলো তো আছেই, যেদিন খুশি টিকিট কিনে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখায় বাধা কিছু নেই।

আমি দেখতাম যে, আগ্রহের মাত্রাটা সুধীরের চেয়ে যেন বিভারই আরো বেশি। এক এক দিন হঠাৎ গিয়ে সে হাজির হতো আমার ল্যাবরেটরিতে। মুখ-টুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে এসেছে আমার কাছে। আমি তাকে বসাতাম, বেয়ারাকে দিয়ে চা আনিয়ে খাওয়াতাম। বুঝতে পারতাম সবই, কোথাও হয়তো দেখা হবার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি, অপেক্ষা করে ঘুরে ঘুরে শেষে হতাশ হয়ে আমার কাছে দেখতে এসেছে, যদি কোনো সন্ধান মেলে। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছে না। বুঝতাম আমি সবই। কিন্তু ওকে এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই বলতাম না। দেখাতাম যেন কিছুই বুঝিনি। কারণ সে একে আমার প্রায় কন্যাস্থানীয়া, তাতে উচ্চশিক্ষিতা, কাজেই ঐসব বিষয় নিয়ে ওর কাছে কোনো কথা বলতেই আমার সঙ্কোচ বোধ হতো। আমি সুধীরকেই যা-কিছু বলেছি, ওকে নয়। দু-একবার মনে হয়েছিল বটে যে, ওর বাপকে লিখে জানাই। কিন্তু তাও আর করিনি।

কিন্তু ওরা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত তাই করলে। বিভা তার বাপ-মাকে স্পষ্ট চিঠি লিখে জানালে যে, একজনের সঙ্গে তার খুবই অন্তরঙ্গতা হয়েছে, তাকেই সে বিয়ে করতে চায়। বাপ-মা তাতে অনুমতি না দিলে সে আত্মহত্যা করবে। বাপ-মা যদি দেখতে চান তাহলে সেই বন্ধুটিকে তাঁদের কাছে

পাঠিয়ে দিতেও পারে, তাকে দেখলেই তাঁরা বুঝবেন যে, পাত্রটি খুবই ভালো, কেবল এক বাধা আছে যে, সে বৈদ্য নয়, ব্রাহ্মণের ছেলে। কিন্তু এমন অসবর্ণ বিবাহ আজকাল তো যথেষ্টই হচ্ছে ইত্যাদি। এই ছেলেটির প্রতি তার ভালোবাসা জন্মেছে, একে ছাড়া অন্যকে সে কখনই বিয়ে করবে না। একেই সে বিয়ে করতে চায়। সুতরাং অনুমতি দেওয়া হোক।

চিঠি যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সুধীরও গিয়ে হাজির হলো বিভার বাপ-মায়ের কাছে। মানুষকে বশ করতে সে খুবই ওস্তাদ, আর তাঁরাও অতি ভদ্র। গোঁড়ামি তাঁদের নেই। সাত দিন তাঁদের কাছে থেকে স্নেহের সম্পর্ক কায়েমি করে সে তাঁদের মত করিয়ে নিয়ে এলো।

তারপর শীঘ্রই ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

সুধীর চমৎকার একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলে। ঘর-দোর মনের মতো করে সাজালে। সেইখানে থেকেই সুধীর নিজের চাকরি করতে লাগল, আর বিভা তার কলেজে পড়তে থাকল। ওরা আমাকে কয়েকবার সেখানে চা খাবার নিমন্ত্রণও করলে। আমি গিয়ে দেখলাম ওরা দুজনে বেশ আনন্দে আছে। সুতরাং খুশিই হলাম।

তার পর থেকে প্রায় দু-তিন বছর কেটে গেছে। আমি আর ওদের বিশেষ কিছু খোঁজখবর করিনি। ইতিমধ্যে বিভা এম. এ. পাস করেছে, কোনো এক মেয়ে-স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভালো উপার্জন করছে।

হঠাৎ একদিন ডাকে একখানি চিঠি পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বিভা আমাকে লিখছে :

"শ্রীচরণেষু,

শেষ প্রণাম আপনাকে জানাচ্ছি। কাল থেকে আর আমাকে কোথাও দেখতে পাবেন না। আপনাকে অনেক বিরক্ত করেছি, সে সব দোষ ক্ষমা করবেন।"

এমন অদ্ভুত চিঠির মর্ম আমি কিছুই বুঝলাম না। মনে করলাম যে, কাল একবার ওদের ফ্ল্যাটে গিয়ে খোঁজ নেবো ব্যাপারখানা কি।

কিন্তু তা আর যেতে হলো না। সেইদিনই ভোর রাত্রি চারটার সময় সুধীর আমাদের বাড়িতে এসে হাজির, দুমদাম করে আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। দরজা খুলতেই দেখি, তার উন্মাদের মতো অবস্থা। কথা বলতে পারছে না; কেবল বলছে—"চলুন চলুন, শিগ্‌গির চলুন,

বিভা আর বাঁচবে না!" বার বার প্রশ্ন করে এইটুকু বুঝলাম, সে বিষ খেয়েছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে গাড়ি করে হাসপাতালে এনে ফেললাম। তখনও পর্যন্ত সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়েনি। অনেকবার জোর করে ডাকলে একটু চোখ মেলে চাইছে, আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ছে। চোখের তারা খুব সংকুচিত। নাড়ির গতি খুবই মন্থর। সব কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা গেল সে আফিম খেয়েছে।

স্টম্যাক-পাম্প লাগিয়ে তখনই তাকে কয়েকবার বমি করানো হলো, পার্মাঙ্গানেটের জল দিয়ে পেট ধোলাই করা হলো, অ্যাট্রোপিন প্রভৃতি ইন্‌জেকশন দেওয়া হলো। এই সব প্রক্রিয়ার পরে একটু যখন জ্ঞান হলো তখন থেকে তাকে জাগিয়ে রাখার পালা, যেন কিছুতে ঘুমিয়ে না পড়ে। চার-পাঁচঘণ্টা এইভাবে চেষ্টা করতে থাকার পরে তখন সে সুস্থ হলো।

পুলিসের হাঙ্গামা কাটিয়ে দেবার জন্যে আমাকে একটু মিথ্যা বলতে হলো। বলতে হলো যে, আমি একটা আফিম মিশ্রিত মালিশের ওষুধ দিয়েছিলাম, তাই ও ভুল করে খেয়ে ফেলেছিল।

পরের দিন আমি ওদের ফ্ল্যাটে গেলাম। সেখানে সুধীর তখন নেই, সে তার চাকরিতে গেছে। বিভা সেখানে একাই বসে আছে। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অমন করে হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবার কি কারণ হয়েছিল, বিশেষত ওর মতো এমন বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে।

সে তখন আমাকে এই কথাগুলি বললে—

"হঠাৎ আমি কিছু করিনি, অনেকদিন থেকে দেখে দেখে শেষ পর্যন্ত যখন কিছুতেই সহ্য করা গেল না তখনই এই কাজ করেছি। আপনি আগাগোড়া সমস্ত কথা শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

"আমার বোন প্রভাকে আপনি জানেন তো? সে ভারি গুমুরে মেয়ে। আমাকে সে বরাবরই একটু হিংসে করতো। আমাকেই সবাই ভালোবাসে, তাকে কেউ ভালোবাসে না, অথচ আমার চেয়ে সে বেশী সুন্দরী। এই কথা নিয়ে চিরদিনই সে নালিশ করে এসেছে।

"আমার বিয়ের পরেই ওকে দেখে তার হিংসে হলো। আমার মতো মেয়ের অমন সুন্দর স্বামী হবে কেন? সে যেচে যেচে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে শুরু করলে। হস্টেল থেকে যখন তখন আমার বাড়িতে চলে আসে, এমন কি দু-চার দিন এখানে থেকেও যায়। প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গে সর্বদা

লেগে থাকে, বেড়াতে যায়, সিনেমা দেখতে যায়। তার পর ক্রমে ওকে বলতে শুরু করলে—'চলুন আপনার সঙ্গে আজ একলা একটু বেড়িয়ে আসি, দিদি বাড়িতেই থাক, দিদির অনেক কাজ রয়েছে।' আমি এতে কোনো আপত্তি করতাম না, বরং খুশি হয়েই যেতে বলতাম। তখন-বাস্তবিকই আমার অনেক কাজ। একে স্কুলে পড়ানোর চাকরি নিয়েছি, তার উপর সংসারের কাজগুলোও তো আমাকে করতে হবে।

"ওরা দুজনে মিলে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতো, সিনেমা দেখতেও যেতো। কিন্তু তাতে যে কিছু অনিষ্ট হচ্ছে এমন কথা আমি ভাবতেই পারিনি। আমি যে এর মধ্যেই পুরনো হয়ে গেছি, ওর যে আবার নতুনের নেশা লাগছে, এমন কোনো কথা আমার কল্পনাতেও জাগেনি। মনে হয়েছে, ওরা একটু আমোদ করছে, করুক।

"কিন্তু ক্রমেই ওরা বাড়াবাড়ি শুরু করলে। প্রভা এলে আমার নিজেরই বাড়িতে আমাকে যেন চোরের মতো থাকতে হতো। আমাদের এই একটি মাত্রই শোবার ঘর, পাশেরটা বসবার ঘর। ওকে ঐ ঘরে বিছানা করে দিলে ও শুতে চাইত না, মাঝরাত্রে উঠে এসে বলতো ওখানে ঘুম হচ্ছে না, তোমাদের ঘরে এই কৌচের উপর শুয়ে থাকি। সন্ধ্যার পরে ঘর অন্ধকার করে খাটের উপর বসে দুজনে গল্প করতো, আলো জ্বালা হলে নিবিয়ে দিত, বলতো যে অন্ধকারে ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কি করি, চা তৈরী হলে অন্ধকারেই ওদের আমি চা দিয়ে আসতাম। এমনি আরো কত কি ব্যাপার! সব কথা আপনাকে খুলে বলা যায় না। আমি অবশ্য বুঝতেই পারছিলাম যে, একটা কিছু হচ্ছে। হয়তো আমার মনে হিংসে জাগাবার জন্যেই ওরা অমন করছে। কিন্তু গুরুতর কিছু বলে আমার তখনও মনে হয়নি।

"আর হিংসে আমি কিছুতেই করবো না। ভাবলাম যে, দেখি না ওরা কতদূর কি করে। বড়ো জোর একটা সাময়িক দুর্বলতা ছাড়া এ আর কিছুই হতে পারে না। আচ্ছা, তাই হোক। আমি তা সহ্য করে নেবো, তবু হিংসা-বিদ্বেষ আসতে দেবো না। রাগারাগি ছোটোলোকমি আমি করতে চাই না, সে অতি বিশ্রী জিনিস। দু-দিন পরে প্রভাকে একটা বিয়ে তো করতেই হবে, তখন সবই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি ওদের আচরণের কোনো প্রতিবাদ করছি না দেখে ওরা আরো বেশি নির্লজ্জ, নিঃসঙ্কোচ হয়ে উঠল। আমার সামনেই নানারকম হুটোপাটি করতে শুরু করলে। মনে করলে, আমার যখন তাতে কিছুই গায়ে লাগছে না, তখন আর বাধা কি আছে।

"কিছুদিন আগে ও আমাকে বললে যে, এবার ওকে পুরী যেতে হবে। ওর সাহেব নাকি পুরীতে যাচ্ছে, সেখানে তার সঙ্গে থাকতে হবে। আমি ভাবলাম, সে ভালোই হলো, দিনকতক বাইরে একটু ঘুরে আস্থক! কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে দিলাম, ও পুরী চলে গেল। সেখানে গিয়ে চিঠিও লিখলে যে নির্বিঘ্নে পৌছেচে, বেশ ভালো জায়গাতে আছে।

"দিনকতক পরেই কিন্তু স্কুলে এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, সে আমার স্বামীকে আর আমার বোনকে পুরীতে একসঙ্গে বেড়াতে দেখেছে। সেও ছুটি নিয়ে পুরী গিয়েছিল, সম্প্রতি ফিরেছে। আমি বললাম, কখনই তা হতে পারে না, তুমি নিশ্চয় ওর সঙ্গে অন্য কাউকে দেখেছ। সে বললে, কখনই না, আমি বিলক্ষণ চিনি, অনেকবার ওদের দেখেছি, সমুদ্রে লাফালাফি করে স্নান করতেও দেখেছি। আমি তখন প্রভার হস্টেলে খবর নিয়ে জানলাম, সত্যই তাই, বাড়ি যাচ্ছি বলে সে ছুটি নিয়ে চলে গেছে।

"আমি কি আর করতে পারি, চুপ করেই রইলাম। তার পর ওরা পুরী থেকে ফিরে এলো। যেন কোনো কিছুই হয়নি এইভাবে ও আমার সঙ্গে আচরণ করতে লাগল। প্রভার সম্বন্ধে কোনো কথাই বললে না।

"আমি তখন সোজাসুজি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রভা তোমার সঙ্গে পুরী গিয়েছিল কেন? আর সে-কথা তুমি আমাকেই বা লুকিয়ে রাখছ কেন?

"ও তাতে কি বললে জানেন? বললে যে, তুমি যখন জানতেই পেরেছ, তখন আর কিছু লুকোবো না। আমি ওকে বিয়ে করেছি।

"আমি বললাম, বিয়ে করেছ, তা কেমন করে সম্ভব?

"ও বললে, তোমার সঙ্গে যেমন বিয়ে তেমন নয়, এ হলো সিভিল ম্যারেজ। তোমরা দুই বোনই আমার স্ত্রী হলে।

"নির্লজ্জের মতো ঐ কথা বলবার পরেও আমি ওকে কিছুই বললাম না। চুপ করেই রয়ে গেলাম। কিন্তু তার পরে প্রভাও নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে এসে প্রণাম করলে। তখন আর সহ্য হলো না।

"তখন আর বিষ না খেয়ে কি করি বলুন? আমি থাকতেও যখন ওর অন্য স্ত্রীর দরকার হলো, তখন আর আমার দাম কি রইল? অনর্থক আমি বেঁচে থাকবো, আর এইসব নির্লজ্জতা নিত্যই আমাকে চোখে দেখতে হবে, চিরকাল তাই সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে মরে যাওয়াই কি ভালো নয়!"

বিভার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তবু জোর ক'রে ওকে বললাম—"একটা কিছু নিষ্ফলতায় মানুষের জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় না, তার কারণ যতই গুরুতর হোক। একটা দিক দিয়ে সার্থকতা না হলেও তোমার জীবনে অন্য রকমের সার্থকতা আসতে পারে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর বুঝিয়ে কি বলব। কিন্তু মরবার মতলবে আফিম খাওয়া তোমার উচিত হয়নি। ওর মানে জীবনের দ্বন্দ্বে হেরে পালানো।"

সে বললে—"আফিম খেয়ে কিন্তু এক দিক দিয়ে একটা কাজ হয়েছে। ও খুবই এখন ভয় পেয়ে গেছে। আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বলেছে যে, আমার মনে কখনই আর কষ্ট দেবে না। আমার কাছে স্বীকার করেছে যে, আমাকে ও যথার্থই ভালোবাসে, প্রভাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল অন্য কারণে। কিন্তু এখন থেকে প্রভাকে ও সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে রাখবে, আমার সংসারে সে আর কোনদিনই ঢুকতে পাবে না।"

এই ভাবে ওদের একটা মিটমাট হয়ে গেছে শুনে আমি খুশিই হলাম। আর কোনো কথা না বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

কিন্তু দিন সাতেক পরে একদিন সন্ধ্যায় সুধীরচন্দ্র ঠিক তেমনি উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এসে হাজির।—"চলুন চলুন, প্রভা আর বাঁচবে না!" এবার ওর প্রভা বিষ খেয়েছে।

তাকেও হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। কিন্তু সে খেয়েছে কড়া নির্ভেজাল নাইট্রিক অ্যাসিড। ওদের হস্টেলের কর্ত্রীর ঘরে কোনো কারণে এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড রাখা ছিল। সেই বোতলটি সে চুরি করে সরিয়ে রেখেছিল। সময় বুঝে তারই খানিকটা গলায় ঢেলে দিয়েছে। সুধীর প্রত্যহ বিকেলে অফিস-ফেরতা ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতো। সেদিন গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানে যে, তার ঘরের দরজা বন্ধ, কোনো সাড়া-শব্দ মিলছে না। তখন দরজা ভেঙে ফেলা হয়, তার পর দেখা যায় এই কাণ্ড।

মুখ থেকে গলা থেকে পেট পর্যন্ত তার অ্যাসিডে পুড়ে গেছে। সে হাঁ করতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, শব্দ করতে পারছে না, কিছু গিলতে পারছে না। কিন্তু তার জ্ঞান একটুও হারায়নি, নির্বাক দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। সুধীরের মুখের দিকে বার বার চাইছে, মনে হয় অত যন্ত্রণার মধ্যেও সুধীরের উন্মাদের মতো ছটফটানি দেখে সে রীতিমতো উপভোগ করছে।

তাকে বাঁচাবার জন্য অনেক চেষ্টাই করা গেল। নলের দ্বারা গলার মধ্যে

ধীরে ধীরে ওলিভ-অয়েল প্রয়োগ করতে থাকা, দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম গুলে কোনো উপায়ে একটু খাওয়াবার চেষ্টা করা, অ্যালকালি-জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা—কিছুতেই কিছু হলো না। কিছুই তার গলা দিয়ে নামলো না। অথচ ঐভাবে তিন দিন পর্যন্ত সে বেঁচে রইল—সর্বদা জাগ্রত অবস্থায়, আর সর্বদাই চোখ চেয়ে। সেই চোখ দিয়ে কোনদিন একফোঁটা জলও পড়ল না। তিনদিন পরে সে চেয়ে থাকতে থাকতে মারা গেল।

প্রভা কেন এমন কাজ করেছিল তা শুনিনি। তবে এইটুকু বুঝলাম যে, অন্যান্য রকমের প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে শেষকালে সে আত্মহত্যার প্রতি-যোগিতায় দিদির উপর টেক্কা দিয়ে চলে গেল।

॥ পনেরো ॥

নিশ্চিন্ত মনে কয়েক বছর ধরে সরকারী হাসপাতালের চাকরিটি বেশ করছিলাম। বাইরের তখন প্র্যাকটিসও কিছু জমে উঠেছিল। দিব্য চলে যাচ্ছিল, এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। হঠাৎ মৃত্যুর পরোয়ানার মতো এসে হাজির হলো আমার বদলির হুকুম। সাত দিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে সুদূর বারাসতের মেডিকেল অফিসার হয়ে চলে যেতে হবে। তখন বারাসতও আমার কাছে সুদূর বৈকি। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। সরকারী চাকরিতে অবশ্য বদলি হওয়াটাই নিয়ম, চাকুরে মাত্রই তাতে অভ্যস্ত। কিন্তু ওতে ডাক্তারদের যতখানি বিপদ হয় ততখানি অন্য কারও নয়। চেনা ডাক্তারকেই লোকে ডাকে, অচেনা ডাক্তারকে কেউ ডাকতে চায় না, কিন্তু ডাক্তার হিসাবে একটু চেনা হতে-না-হতে তাদের এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে যেতে হয়। অথচ প্র্যাকটিসের চেষ্টা তাদের সর্বত্রই করতে হয়, বাঁধা সামান্য মাইনেটুকুতে পেট ভরে না।

কিন্তু এতকালের বাঁধা চাকরিটাও হুট্ করে ছেড়ে দিতে পারি না। প্র্যাকটিসের বরাত ততটা বেশী নেই। অগত্যা তল্পিতল্পা বেঁধে যেতে হলো সেই বারাসতে। একাই গেলাম সেখানে। মনে করলাম ভাবনা কি, আমার সঙ্গে মোটরগাড়ি রয়েছে। কলকাতা থেকে মাত্র বারো মাইল পথ, কোনো ফাঁকে যখন খুশি কলকাতায় আসা-যাওয়া করতে পারবো।

সেখানে গিয়ে দেখি, দুই রকমের কাজ। ইন্‌ডোর এবং আউট-ডোর হাসপাতাল দেখা, আর সরকারী জেলখানার সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের কাজ করা।

খুব ভোরে উঠেই যেতে হয় জেলখানাতে। আমি গেলে তবে সেখানকার সারাদিনের ব্যবস্থা স্থির হবে। কাউকে জেল থেকে খালাস দিতে হবে, কাউকে ভর্তি করতে হবে, কাউকে পরিশ্রমের রেহাই দিতে হবে, কাকে কি খেতে দেওয়া হচ্ছে তা দেখতে হবে—ইত্যাদি। তা ছাড়া ওর মধ্যে কোনো রোগী থাকলে তাকে দেখতে হবে, কোনো অপারেশন থাকলে তা করতে হবে, এবং আরো অনেক রকমের কাজ যা ডাক্তারির অন্তর্গত নয়। দুই ঘণ্টার কমে সে-কাজগুলি শেষ করা যেতো না।

সেখান থেকে সরাসরি চলে আসতে হতো হাসপাতালে। সেখানে ইতিমধ্যেই বহু রোগীর ভিড় জমে গেছে, তারা আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

প্রত্যহ সকালে প্রায় একশো-দেড়শো রোগী এসে জমতো। তারা আসতো চারিপাশের অনেক দূর-দূর গ্রাম থেকে। ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশ, এখানে প্রায় বারোমাসই ম্যালেরিয়া লেগে আছে। মাঝে মাঝে তার প্রকোপ বেশ বেড়ে ওঠে, মাঝে মাঝে কমে। বিস্তর রকমের ম্যালেরিয়া সেখানে দেখা যায়। কোনোটা খাপছাড়া রকমের, কোনোটা পালা-যুক্ত, কোনোটা ক্রনিক, কোনোটা আবার জ্বরবিহীন ও ছদ্মবেশী। ম্যালেরিয়া ছাড়াও আরো তিন রকমের রোগ সাধারণত দেখা যায়। পেটের রোগ, আমাশা; রক্তের রোগ, অ্যানিমিয়া; বুকের রোগ, সর্দিকাশি, হাঁপানি। এইগুলোই আসে বেশির ভাগ।

সেই পল্লীগ্রামবাসী রোগীদের দেখতে আমার ভারি ভালো লাগত। তাদের মধ্যে আমি কত রকমের বৈচিত্র্য দেখতাম। রোগের বৈচিত্র্য নয়, মানুষগুলিরই বৈচিত্র্য, তাদের আচরণের নানা বৈচিত্র্য। এরা কলকাতার রোগীদের মতো নয়, তাদের থেকে এদের অনেক তফাৎ। কলকাতার রোগীদের মধ্যে অনেক জটিলতা, প্রায়ই তাদের দেহের রোগের সঙ্গে মনের রোগ থাকে মেশামেশি। প্রায়ই তারা নিজেদের রোগ নিজেরাই বাৎলে দেয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুব কঠিন হয়, সেখানে খুবই সতর্ক হয়ে কাজ করতে হয়। এখানে তেমন কিছু জটিলতার ব্যাপার নেই, কিন্তু এদের মধ্যে আছে সরল ও নির্বোধ অজ্ঞতা। এরা নিজেদের রোগের কথা ঠিক ভাবে বলতেই জানে না, এলোমেলো ভাবে যা মনে আসে তাই বলতে থাকে, তার ভিতর থেকে আসল কথাটি খুঁজে নিতে হয়। তাতে একটু সময় নষ্ট হয় বটে, কিন্তু আমোদ হয়, আর অভিজ্ঞতা হয়।

একজন এসে বললে—"আমার খিদে নেই, খেতে রুচি নেই, পেট দমসম থাকে, জিভে ঘা—" ইত্যাদি।

আমি তার পেটে হাত দিয়ে দেখলাম, মস্ত একটি পিলে। জিজ্ঞাসা করলাম—"মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে কি?"

সে বললে—"জ্বর হলে তো কাঁপুনি ধরবে, লেপ-কাঁথা মুড়ি দিতে হবে। কৈ তেমন কিছু হয়নি। জ্বর-টর বুঝি না বাবু। তবে চান করতে গেলে যেন গা একটু শির্‌শির্‌ করে, তাই চান করা ছেড়ে দিয়েছি। জ্বর আমাদের গাঁয়ে নেই কারও বাবু। আমাদের গাঁয়ে ম্যালোরি নাই।"

কিন্তু নাড়িতে হাত দিয়ে দেখলাম, তখনও বেশ জ্বর রয়েছে। ম্যালেরিয়া। জ্বরই তার আসল রোগ, কিন্তু জ্বরের কথাটাই সে অস্বীকার করে গেল।

আর একজন এসে বললে—"বাবু, জ্বর হচ্ছে, ওষুধ দিন।" গামছাটায় সে একটি শিশি বেঁধে এনেছে। সোজাসুজি জ্বরের ওষুধ চাইছে। আমায় কিছু ভাবতে চিন্তোতে না হয়।

—"কৈ, তোমার জিভ দেখি?" দূর থেকে সে জিভ বের করেও দেখালে।

—"সরে এসো, তোমার নাড়িটা একবার দেখি।"

আমার উদ্দেশ্য এবার বুঝে নিয়ে সে বললে—"আজ্ঞে, জ্বর তো আমার নয়, আমার ঘরের মেয়েলোকের। তেনাকে এখানে আনা যাবে না, তাই আমি নিজেই এসেছি। তেনার জ্বরের ওষুধটা আমাকে দিতে হুকুম করে দিন। তেনার নাম লিখুন—আদুরী।"

অর্থাৎ তার মুখের বিবরণ শুনেই তার স্ত্রীকে ওষুধ দিতে হবে। অবশ্য গরুর গাড়িতে করেও অনেক রোগীকে আনা হয়। গাড়ি থেকে নামবার তাদের শক্তি থাকে না, আমাকেই উঠে যেতে হয় গাড়ির কাছে, সেখানেই রোগীকে পরীক্ষা করে এসে ওষুধের ব্যবস্থা করতে হয়।

ওখানে আমি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার নিজের মাইক্রস্কোপ। দামী জার্মান আধুনিক মাইক্রস্কোপ। সেখানকার হাসপাতালে মাইক্রস্কোপ নেই। অথচ ঠিকভাবে চিকিৎসা করতে হলে রক্তাদির পরীক্ষার জন্যে একটি মাইক্রস্কোপ থাকা নিতান্তই দরকার, নইলে অনেক সময় আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে হয়, এটা না-লাগে তো ওটা। তেমনভাবে কাজ করতে আমি অভ্যস্ত নই, বাধো-বাধো ঠেকে। তাই যেখানেই কোনো সন্দেহস্থল, সেখানেই আমি রোগীকে আলাদা করে বসিয়ে রাখতাম। সাধারণ রোগীদের ভিড় কমে গেলে তখন সেই অপেক্ষমান রোগীদের নিয়ে পড়তাম। তাদের রক্তাদি নিয়ে তখনই পরীক্ষা করতে লেগে যেতাম। পরীক্ষার ফল দেখে তবে ওষুধের

ব্যবস্থা করতাম। এতে অবশ্য যথেষ্ট সময় লাগতো, বেলা প্রায় একটা-দেড়টা বেজে যেতো। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার ও অন্যান্য কর্মচারীরা তাতে বিরক্ত হতো, কারণ তাদেরও অতক্ষণ পর্যন্ত আটক থাকতে হতো। কিন্তু এতে কাজ হতো খুব ভালো। কয়েকটি রোগী অনেক কাল থেকে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছে, কিছুতে তাদের জ্বর ছাড়ে না। পরীক্ষা করে দেখলাম সেগুলি ম্যালেরিয়া নয়, কালাজ্বর। আমি কালাজ্বরের ইন্‌জেকশন তাদের জন্যে কিনিয়ে আনালাম, হাসপাতালে তা ছিল না। কম্পাউণ্ডার বললে, এখানে কালাজ্বর হয় বলে কখনো শুনিনি। সে বিশ্বাসই করতে চায় না। কিন্তু কয়েকটি ইন্‌জেকশন দিতেই তারা আরোগ্য হয়ে গেল।

হাসপাতালের আউট-ডোরে ক্রমশ রোগীদের সংখ্যা আরো বেশী বাড়তে লাগলো। সরকারী ডাক্তারখানার ওষুধে রোগ সারে এটা লোকে কমই বিশ্বাস করতো, সে বিশ্বাস ক্রমশ লোকের মনে আসতে লাগল।

ইতিমধ্যে জেলখানাতে টাইফয়েড রোগ দেখা দিল। একটি সতেরো-আঠারো বছর বয়সের কিশোর কয়েদী টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হলো। সম্প্রতি সে জেলে ভর্তি হয়েছিল, ঐখানেই কোথাও তহবিলের টাকা চুরির অপরাধে তার ছয় মাসের জন্যে সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছিল।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। জেলখানার খাদ্যপানীয়াদি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা করে ফেললাম, কয়েদী ও প্রহরী প্রভৃতি সকলকেই টাইফয়েড-ভ্যাক্সিন দিয়ে দিলাম। আর রোগীকে একটা আলাদা কুঠরিতে রেখে দুজন মেট-কয়েদীকে তার সেবায় নিযুক্ত করলাম। তাদের অন্য কোনোই কাজ থাকবে না, একজন রাত্রে আর একজন দিনে রোগীর সেবা করবে।

অতঃপর কেমন করে টাইফয়েডের পরিচর্যা করতে হয় সে বিষয়ে ঐ দু'জনকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, তারা ওর কিছুই বুঝতো না, আমি যেমন যেমন বলে দিতাম হুবহু তাই করে যেতো। কিন্তু আশ্চর্য তাদের নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা আর অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা। শহরের শিক্ষিত যত সব বুদ্ধিমান শুশ্রূষাকারীদের চেয়ে তারা অনেক ভালো। এ কাজে বেশী বুদ্ধিমান হওয়ার দোষ এই যে, অনেক সময়েই তারা নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে যায়, ডাক্তারের নির্দেশের উপর নিজের কেরামতি চালাতে যায়। তাতেই তারা সব নষ্ট করে, রোগ বিগড়ে গেলে ডাক্তার খুঁজেও পায় না যে, কোথায় কোন্ কারণে ত্রুটি হলো। কিন্তু এখানে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রইল না।

ট্রপিক্যাল থেকে টাইফয়েড-ফাজ আনিয়ে আমি রোগীকে কেবল তাই দিয়েই চিকিৎসা করতে থাকলাম।

রোগীও খুব নিরীহ, আর আমার খুব বাধ্য ছিল। প্রত্যহ চার বার করে তার গা-মাথা ধুইয়ে দেওয়া হতো। নিয়মিত তরল পথ্য ও গ্লুকোজ ছাড়া তাকে কিছুই খেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু কোনো কিছুতেই সে আপত্তি করতো না।

কিন্তু তার ধারণা হয়েছিল সে আর বাঁচবে না, নিশ্চয় এবার মরে যাবে। তাই আমাকে একদিন কাছে ডেকে সে তার শেষ বক্তব্যগুলি শুনিয়ে দিয়েছিল। বারে বারে আমাকে বলে দিয়েছিল যে, সে মারা যাবার পরে তার মা যখন লাশ নিতে আসবে, তখন যেন তাকে সব কথাগুলি আমি বলি।

সে আমাকে বললে—"সত্যি আমি চোর নই, হুজুর। মরবার সময় মিছেকথা বলছি না, সত্যিই আমি দোকানের তহবিল থেকে এক পয়সাও নিইনি। আমি গরীবের ছেলে, চিরকাল গরীবই থাকবো জানি। সংসারে আমি আর আমার মা, এ ছাড়া কেউই নেই, যা রোজগার করতাম তাতেই বেশ চলে যেতো। শ-দুয়েক টাকা নিয়ে আমার কি লাভ আছে বলুন। অনেকদিন থেকেই দোকানে চাকরি করছি, মনিব আমাকে খুব বিশ্বাস করতো। সব-কিছুই আমার হাতে, টাকাকড়িও আমার হাতে। কিন্তু মনিবের ছেলেটা ভারি বদ। বদখেয়ালে টাকা নষ্ট করে ব'লে মনিব আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, তাকে যেন এক পয়সাও না দিই। সে চাইলেও কিছু দিতাম না, তাই আমার উপর তার রাগ ছিল। একদিন তবিলের চাবি কোথায় হারিয়ে গেল, খুঁজে পেলাম না। পরের দিন খুঁজে পেয়ে তবিল মিলিয়ে দেখলাম দু'শো টাকা কম। মনিবকে তখনই সে কথা বললাম। মনিবের ছেলে বললে, তুই নিশ্চয় চুরি করেছিস। আমি 'না' বলতেই সে বললে, খোল্ দেখি তোর প্যাঁটরা। একটা ছোটো প্যাঁটরা ছিল, সে খোলাই পড়ে থাকতো। সেটা খুলতেই কিন্তু তার ভিতর থেকে একশো টাকার নোট বেরিয়ে পড়ল। তখন সে বললে, একশো রেখেছিস আর একশো খরচ করেছিস, দিয়ে দে সেই টাকা। কিন্তু আমি চিরকালই গরীব, কোথায় পাবো অত টাকা? তখন ওরা আমাকে পুলিসে দিয়ে দিলে, প্যাঁটরা আর টাকা সেখানে জমা করে দিলে। আমাকে জব্দ করবার জন্যে সে নিজেই এই কাজটি করেছিল। কিন্তু আদালতে তা শুনবে কেন, চোর বলে আমাকে

জেলে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু আমি চোর নই, হুজুর। আমার মা হয়তো এখন খেতে পাচ্ছে না, কে আর তাকে খেতে দেবে। আমরা খুবই গরীব হুজুর, খুবই গরীব। কিন্তু মা যেন আমার কখনো না মনে করে যে, আমি চুরি করেছিলাম।"

কিন্তু মরবার জন্যে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও রোগীটি আরোগ্য হয়ে উঠলো। দুই মাসের মধ্যে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো।

আর একটি আহত লোককে পুলিস ধরে নিয়ে এলো, তাকে অত্যন্ত আহত দেখে আমি হাসপাতালে রাখলাম। তার কাছে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে পুলিস পাহারা রইল। সে একজন ডাকাত, ডাকাতি করতে গিয়ে খুব চোট খেয়ে জখম হয়ে পড়ে, তাই সেই অবস্থাতে ধরা পড়ে যায়। অন্য যারা তার সঙ্গে ছিল সবাই পালিয়ে যায়। হাতে পায়ে ঘাড়ে মাথায় সে কাটারির অনেক ঘা খেয়েছে। ক্ষতগুলি অত্যন্ত গভীর—সেলাই করে দিলেও, আর সাধ্যমতো প্রতিরোধক ব্যবস্থা করলেও তার বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

কিন্তু লোকটার চেহারা দেখে ডাকাত বলে মনেই হয় না। সে যে ডাকাতি করবার মতো অসমসাহসিক কিছু করতে পারে, এ-কথা তাকে দেখে কোনোমতে বিশ্বাসই করা যায় না। পাড়াগেঁয়ে চাষাভূষো যেমন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিই দেখতে। হাত-পাগুলো সরু সরু, পেটটি বেশ ডাগর, বুকের পাঁজরাগুলো বেরিয়ে পড়েছে, ঘাড় সামনের দিকে ঝোঁকানো, উচ্চতায় পাঁচ ফুটের চেয়ে দুই-এক ইঞ্চির বেশী হবে না। এই কাঠামো নিয়ে ও ডাকাতি করবে! কিন্তু পুলিসের কাছে শুনলাম, ও আগেও কয়েকবার ধরা পড়ে জেল খেটেছে। তবুও দল বেঁধে ডাকাতি করতো, ধরতে পারা যেতো না। এবার জখম হয়ে ধরা পড়ে গেছে। ডাকাতি করাই ওর পেশা। ওই নাকি সর্দার।

একটা জিনিস ওর মধ্যে দেখতে পেলাম যা অসাধারণ। ওর মনে কোনো ভয় ডর নেই, দেহের কষ্টকে কোনো গ্রাহ্য নেই। অতোগুলো জখম নিয়েও ও কোনো কাতরোক্তি করে না। জখমের মধ্যে হাত দিলে কিংবা খোঁচাখুঁচি করলেও চুপ করে থাকে। এমন ধরনের কষ্ট-যন্ত্রণাগুলো পেতে হবে বলেই নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিয়েছে। ও যেন কোনো মারাত্মক অ্যাডভেঞ্চার করতে ইচ্ছা করেই নেমেছিল, তার পক্ষে এগুলি হলো আনুষঙ্গিক, তাই নির্যাতন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব-কিছুর জন্যেই ও প্রস্তুত। তাই সর্বদাই থাকতে

পারে স্থির অবিচল হয়ে, কোনোরকম ভাবপ্রকাশ নেই। ডাক্তারি করতে-করতে ডাক্তারেরা যেমন ভাবলেশবর্জিত হয়ে নিস্পৃহ হয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, ডাকাতি করতে-করতে ওরও বোধ হয় তেমনি এই অবিচলতার ভাবটি এসে গেছে।

অবিচলতার নিদর্শন ওর আরো একটি দেখলাম। পুলিসের অনেক কৌশল আর অনেক ফুসলানো সত্ত্বেও নিজের অন্যান্য সঙ্গীদের কারও নামই সে বললে না। বোধ করি, সুস্থ থাকলেও হাজার নির্যাতন সত্ত্বে তা বলতো না। এর জন্যেও প্রস্তুত ছিল। স্পষ্টই বলে দিলে, আমাকে ধরেছ যখন, আমাকে যত পার শাস্তি দাও, আর কারও নাম আমি বলব না। এই আমার এক কথা।

সেপ্‌টিক হয়ে প্রবল জ্বরে কয়েকদিনের মধ্যেই সে মারা গেল।

আরো এক ফ্যাসাদে পড়েছিলাম এক খুনের ব্যাপার নিয়ে। একটি বৌকে খুন করেছে তার শাশুড়ী। বৌ ছিল অন্তঃসত্ত্বা। তার স্বামী গিয়েছিল মাঠে কাজ করতে, বাড়িতে ছিল কেবল শাশুড়ী আর সেই বৌ। বৌকে ঐ অবস্থাতেই রান্নাবান্না করতে হয়, শাশুড়ী আপন খেয়ালে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। সেদিন শাশুড়ী বাড়ি এসে বৌকে ভাত বাড়তে বলে। বৌ তাতে বিলম্ব করতে থাকে। শাশুড়ীর বোধ করি খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, কিংবা যে কারণেই হোক, তার খুব রাগ হয়ে যায়। বৌ হয়তো কিছু কটু কথাও শুনিয়ে থাকবে। তার পর সে যখন ভাতের থালা নিয়ে আসছিল, তখন শাশুড়ী তাকে কোনো ভারী জিনিসের দ্বারা মাথায় এক ঘা আঘাত করে। বৌ দরজার কাছে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। ছেলে বাড়ি ফিরে এসে দেখে এই ব্যাপার। সে পুলিসে খবর দিয়ে বলে যে, বৌকে মা খুন করেছে। কিন্তু শাশুড়ী বলে, তা নয়, বৌ চৌকাঠে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়ে আপনিই হঠাৎ মারা গেছে।

পুলিস বৌটির লাশ এনে হাজির করলে পোস্টমর্টেমের জন্যে, আর শাশুড়ীকে জেলে ভরে রাখলে। মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করে দেখলাম, মাথার উপরকার ব্রহ্মতালুর কাছে খুলির হাড় কেটে গিয়ে ব্রেণে আঘাত লেগেছিল, তাতেই সে তৎক্ষণাৎ মরেছে। পেটের সন্তানটিও মৃত।

এমন অবস্থা কোনো ভারী রকমের লোহার জিনিসের আঘাত ছাড়া হতেই পারে না। আর অপর কেউ না মারলে মাথার উপর দিকে চোট লাগবে কেমন করে? মেরেছে নিশ্চয়ই। তবে খুন করবার উদ্দেশ্যে হয়তো মারে নি, মেরেছে হঠাৎ রাগের বশে।

শাশুড়ীটিকে দেখলাম জেলখানার মধ্যে। ভয়ে ভাবনায় উদ্বেগে সে যেন পাগলের মতো হয়ে গেছে। কখন কি বলছে তার কিছুই ঠিক নেই, প্রতি কথায় হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে—"কি যে হলো, কি যে করলাম. তার কিছুই জানি নে বাবা। আমার মাথার কোনো ঠিক ছিল না। আমার মাঝে মাঝে এমন ধারা হয়ে যায় বাবা, মাথার কোনো ঠিক থাকে না। কিন্তু আমি কিছুই করি নি, বাবা। বৌটা বড় বজ্জাত ছিল, আমাকে জব্দ করে দিয়ে চলে গেল। কেমন করে যে মরলো তা কিছুই জানি না বাবা। আমায় কি তোমরা ফাঁসি দিতে এনেছ? আমিও তাহলে মরে যাবো? আমার ছেলেটাকে তাহলে কে দেখবে বাবা? আমায় তোমরা কোনোরকমে বাঁচিয়ে দাও বাবা, মরতে আমার বড়ো ভয় করছে। তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হোক, এই বুড়ীকে মেরে কি লাভ হবে?"

আরো কত রকমের আবোল-তাবোল কথা সে বলতে থাকে।

সে অত্যন্তই বোকা। আর বোকা বলেই বদমেজাজী, অথচ ভীতুও তেমনি। সকল বিষয়েই সংযমের ও সঙ্গতির অভাব। তাকে দেখে আমার মায়া হলো। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে আমি মন্তব্য লিখে দিলাম যে, এটি অ্যাক্সিডেণ্ট-মৃত্যুও হতে পারে। বৌটা তো গেছেই, এই হতভাগিনী শাশুড়ীটা যদি বেঁচে যায় তো বেঁচে যাক।

আদালতে যথাকালে আমাকে সাক্ষী দিতে হলো। সরকারী পক্ষের উকিল আমাকে একটি লোহার লম্বা ডাণ্ডা দেখালেন। সেটা সম্ভবত দরজার হুড়কো রূপে ব্যবহার করা হতো। আমাকে প্রশ্ন করা হলো—"মৃত মেয়েটির মাথার আঘাত সম্বন্ধে আপনি যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তা কি এই লোহার ডাণ্ডার আঘাতে হয়েছে বলে আপনার মনে হয় না?"

আমি বললাম—"সে-কথা নিশ্চয় করে আমি বলতে পারি না। ওর দ্বারাও হতে পারে, আবার আকস্মিক ভাবেও অমন আঘাত হতে পারে।"

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন—"মাথার পাশে না হয়ে উপরদিকে কেমন করে তা হবে?"

আমি বললাম—"দরজার মাথার চৌকাঠ যদি মানুষের দৈর্ঘ্যের চেয়ে নীচু হয়, আর সে কথা না-জেনে কিংবা ভুলে গিয়ে কেউ যদি ছুটে সেই দরজা পার হতে যায়, তাহলে মাথার ঐ জায়গাতে খুব গুরুতর আঘাতই লেগে যেতে পারে। লাফিয়ে পার হতে গেলে তা আরো গুরুতর হতে পারে।"

এই বলে প্রমাণস্বরূপ আমি নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিলাম। আমার

মাথায় ঠিক ঐরূপ জায়গাতেই একটা ক্ষতের চিহ্ন ছিল। ছেলেবেলাতে একবার চৌকাঠ লাফাতে গিয়ে আঘাত লেগে সেখানটা অনেকখানি কেটে যায়, তার পর থেকে দাগটা রয়েই গেছে।

পরে দায়রাতে সাক্ষী দিতে গিয়েও আমি ঐ কথা বলেছিলাম। সুতরাং ওটা খুন না আকস্মিক মৃত্যু তার কোনো মীমাংসা হলো না। তা ছাড়া, আঘাত যে বাস্তবিকই করা হয়েছে সে-বিষয়ে সাক্ষীও কেউ ছিল না। অপরাধ প্রমাণিত না হওয়াতে বুড়ী খালাস পেয়ে গেল।

এমনি একরকম ভাবে যদিও বারাসতের চাকরি বজায় রেখে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলাম, তবু কিছুকাল পরে আর তাও সম্ভব হলো না। যিনি তখন সেখানকার হাকিম ছিলেন তিনি আমার পেছনে লাগলেন।

ওখানে বিকেলের পর থেকে আমার কোনো কাজই থাকতো না। বিকেলে একবার ডাক্তারখানাটা ঘুরে আসতাম মাত্র, কোনোদিন এক-আধটি রোগী থাকতো, কোনোদিন কেউই আসতো না। সন্ধ্যার পর থেকে আর কিছুই করবার নেই। কেবল ঘরে বসে থাকা। আমি তাই সন্ধ্যা হলেই নিজের মোটরে কলকাতায় চলে আসতাম। মাত্র আধ ঘণ্টার পথ, জোরে গাড়ি চালিয়ে কুড়ি মিনিটেও আসা যায়। এখানে এসে আমি একবার বাড়ি ঘুরে আসতাম, নিজের ডাক্তারখানাতে ঘণ্টা-দুই বসতাম। যারা আমার হাতের রোগী ছিল, অর্থাৎ অনেকদিন পর্যন্ত যাদের ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসার দরকার, তাদের বলে দিতাম সন্ধ্যার পর আসতে। তাদের দেখাশোনা করে আবার সেই রাত্রেই বারাসতে ফিরে যেতাম। সুতরাং এতে ওখানকার কাজের কোনোই ক্ষতি হতো না, আর এটি কারও নজরে পড়বারও কথা নয়। সন্ধ্যার পরে আমি বাইরের রোগী দেখতেও যেতে পারি। মাঝে মাঝে দুই-একদিন কলকাতায় আসা বাদ দিতাম, সেই দুই-একদিন ওখানকার অফিসারদের ক্লাবে গিয়ে আড্ডা দিতাম। তাতে সকলে সন্ধ্যার পরেও আমাকে সেখানে কোনো কোনো দিন দেখতে পেতো।

এ নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হবার কথা নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মহকুমা-হাকিমের ছেলের মাথায় হলো ছোটো একটি ফোড়া। আমাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে ছুরির মুখ দিয়ে ফোড়াটি গেলে পুঁজ বের করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। পরের দিন আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে গিয়ে সেখানে বহুক্ষণ অপেক্ষা করে বসে থাকতে হলো। প্রায় এক ঘণ্টা পরে হাকিম উপর থেকে নেমে এলেন ছেলেকে নিয়ে। আমি এতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

তার উপর দেখলাম ফোড়াটি প্রায় শুকিয়ে এসেছে, আর বিশেষ কিছু করবার নেই। আমি তাই বললাম যে, "কাল থেকে আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে না, একটু মলম লাগিয়ে দেবেন।" হাকিম বললেন—"তা হোক, আরো দুদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার।" আমি বললাম—"তাহলে ডাক্তারখানাতে পাঠিয়ে দেবেন, সেখানেই বেঁধে দেবো।" তিনি যেন আমার কথায় বিরক্ত হলেন।

তার পরের দিন আর হাকিমের বাড়িতে গেলাম না। তিনিও ছেলেকে আমার ডাক্তারখানাতে পাঠালেন না। আমি ভাবলাম হয়তো সেরেই গেছে।

কিন্তু মফঃস্বলের আমলাতন্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে কিছুই আমি জানতাম না। সেখানে মহকুমা-হাকিম হলেন সর্বশক্তিমান দেবতার মতো, তাঁকে খোশামোদ করে রীতিমতো তুষ্ট রাখতে হয়, নতুবা সমূহ বিপদ। তুষ্ট না থাকলেই তিনি পেছনে লাগবেন। অতএব ডাক্তার প্রভৃতি ছোটোখাটো চাকরদের উচিত, কারণে এবং বিনা কারণে তাঁর বাড়িতে হাজিরা দেওয়া, নানা উপায়ে তাঁকে প্রসন্ন রাখা। আমি তা কোনো দিন তো করিই না, উপরন্তু আমি আবার মোটরে চড়ে বেড়াই। তাও তাঁর নজরে পড়েছে। এই সব কারণে আমি তাঁর চক্ষুশূল হয়ে উঠলাম।

তখন তিনি তলে তলে আমার ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁর গুপ্তচরের কোনো অভাব নেই। সাইকেল-পিওন তাঁর বিস্তর আছে, তারাই তাঁর গুপ্তচর। প্রায়ই দেখতাম তারা সাইকেলে চড়ে আমার বাসার আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছে। তখন ওতে কিছুই সন্দেহ হতো না। কিন্তু তারা সর্বক্ষণ সন্ধান রাখছিল, মোটরে চড়ে আমি কখন কোথায় যাই।

যতটুকু জানবার ছিল তা জেনে নিয়ে স্থানীয় হাকিম আমাদের হেড-অফিসে আমার বিরুদ্ধে এক লম্বা রিপোর্ট দাখিল করলেন। তাতে তিনি লিখলেন যে, আমি জেলখানার কাজে অত্যন্ত গাফিলতি করছি। রোজ রোজ সন্ধ্যায় স্টেশন ছেড়ে কলকাতায় চলে যাই, সারা রাত অনুপস্থিত থেকে পরের দিন সকালে ফিরি, সেই কারণে অনেক বিলম্বে জেলখানার ফটক খোলা হয়। এমন দায়িত্ববিহীন লোককে ওখানে রাখা উচিত নয়।—ইত্যাদি।

হেড-অফিস থেকে আমাকে ডেকে পাঠালে। সেখানে যেতেই ঐ রিপোর্টটি আমাকে দেখিয়ে বড়ো সাহেব খুব রাগ করতে লাগলেন। আমি যদিও বললাম, ওর সমস্তই মিথ্যা কথা, আমি তা প্রমাণ করে দিতে পারি,

কিন্তু তিনি কোনো কথাই শুনলেন না; বললেন—"তোমাকে মেদিনীপুর" বদলি করলাম।"

অগত্যা তখন বাধ্য হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হলো। ঘরের কাছের প্র্যাকটিস ছেড়ে অত দূরে গিয়ে চাকরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এতদিন কোনোগতিকে দুই নৌকোতে পা দিয়ে চালাচ্ছিলাম, কিন্তু আর তা চললো না।

আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি, এ কথা বারাসতের সর্বত্র রটে গেল। কেউ কেউ আমাকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এলেন, কেউ বা দুঃখ করলেন, কেউ আনন্দ করলেন।

তখন একদিন মহকুমা-হাকিমটি স্বয়ং আমার বাসাতে এসে হাজির হলেন। মুখের ভাব অত্যন্ত অমায়িক, অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ। বললেন—"শুনে পর্যন্ত আমার কষ্ট হচ্ছে, কারও পরামর্শ না নিয়ে হঠাৎ এমন একটা অবিবেচনার কাজ করে বসলেন! এতদিনের চাকরি, বাঁধা পেনশন রয়েছে, এ চাকরি কি ছাড়তে আছে? হলেনই বা বদলি, আবার দুদিন পরে কলকাতাতেই ফিরতে পারতেন। আমি বলে কয়ে চেষ্টা করে তার ব্যবস্থা করতে পারতাম। আপনি রেজিগ্নেশনটা ফিরিয়ে নিন, আমার পরামর্শ শুনুন। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।"

আমি বললাম—"অনেক ধন্যবাদ। কষ্ট করে আমার বাসায় পর্যন্ত এসেছেন সৎ পরামর্শ দিতে। কিন্তু এ চাকরি আমি ছেড়েই দিতাম, এই একটা বেশ সুযোগ মিলে গেল। যাদের প্র্যাকটিস আছে তাদের চাকরি করা পোষায় না, আর তা করা উচিতও নয়।"

॥ ষোলো ॥

তখন থেকে কলকাতায় বসে পুরোপুরি প্রাকটিস শুরু করে দিলাম। আমার ডাক্তারখানাতে কতরকম লোকেরই আমদানি হয়। সকলেই যে রোগী তা নয়, নীরোগ ব্যক্তিরাও অনেক আসে। কেউ আসে গল্প জমাতে, কেউ আসে কাগজ পড়তে, কেউ বা এমনিই খানিকক্ষণ বসে থেকে সময় কাটায়। যেন আগেকার যুগের বারোয়ারি বৈঠকখানার মতো।

এখানকার ডাক্তারি ব্যাপারটাই একেবারে আলাদা। চিকিৎসা করাতে রোগীও যারা আসে তাদের মধ্যে অর্ধেক থাকে সত্য রোগী, আর অর্ধেক

মিথ্যা রোগী। মিথ্যা রোগী মানে তাদের দেহে কোনো নির্দিষ্ট রকম রোগের লক্ষণ নেই, কিন্তু তবু তারা সুস্থ নয়। দেহে ও মনে তারা অসুস্থতা বোধ করছে—শরীরে রোগচিহ্ন না থাকলেও বাস্তবিকই তারা কষ্ট পাচ্ছে। মিথ্যা কপটতা তারা করতে আসে না। রোগ কিছু না থাকলেও তাদের রোগীই বলতে হবে, তাদের উপযুক্ত চিকিৎসাও করতেও হবে। যদি খোলাখুলি বলি যে, তোমার শরীরে কোনো রোগ নেই, তাতে তাদের সেই অসুস্থতা সারবে না। আমার কথায় কোনো ভরসা না পেয়ে তারা তখন চলে যাবে অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে। অতএব সত্য রোগীর মতোই তাদের দেখতে হবে, সেই মতোই রীতিমত চিকিৎসাও করতে হবে। অন্ততপক্ষে মনে ভরসা দেবার জন্যেও তাদের চিকিৎসা কিছু করা দরকার।

মিথ্যা রোগের চিকিৎসাও নানা রকমের আছে। কোথাও বা নার্ভের ওষুধ, কোথাও বা ঘুমের ওষুধ, কোথাও বা ইন্‌জেকশন। আবার রোগী বিশেষে এ সব কিছুরই প্রয়োজন নেই, পথ্যাদির কিছু অদল-বদল ও টোট্‌কা-টুটকির ব্যবস্থা বলে দেওয়া, তাতেই তারা খুশি হয়। মোট কথা তাদের মনে কিছু বিশ্বাস জন্মানোর দরকার, তাহলেই কাজ হয়। তবে কার বেলাতে কেমন ব্যবস্থা, সেটা বুঝে করতে হয়।

এখানে এমনি একজনের গল্পটাই বলি। ভদ্রলোক চাকরি-বাকরি করেন, ভালোই উপার্জন করেন। এদিকে বেশ অমায়িক মানুষ, কোনোরকম দোষ নেই, শরীরে কোনো অত্যাচার নেই। বরং সেদিকে খুবই সাবধানে থাকেন। মানুষটি বুদ্ধিমান, সত্যবাদী, পরোপকারী। কিন্তু একটিমাত্র তাঁর দুর্বলতা, থাইসিস হবার ভয়। ছেলেবেলাতে কবে একবার সর্দিকাশি হয়েছিল, হয়তো খুব জোরে কাশতে কাশতে গয়ারের মধ্যে রক্তের ছিটে দেখা গিয়েছিল। কোনো একজন ডাক্তার তখন নাকি বলেছিলেন, এ ভালো কথা নয়, এর থেকে পরে খারাপ রোগ দাঁড়াতে পারে। সেই অবধি মনে ঐ রোগের ভয় লেগে আছে।

তাঁর ধারণা ওটা যক্ষ্মা রোগেরই উপক্রম হয়েছিল, হঠাৎ আবার তা নতুন করে পরিণত বয়সে দেখা দিতে পারে। হয়তো দেহের মধ্যে রোগটি লুকিয়ে আছে, কোনো একদিন বেরিয়ে পড়তে পারে। তাই মাঝে মাঝে এ প্রশ্ন মনকে উদ্বিগ্ন করে তোলে, তখন তিনি আমার কাছে ভালো করে একবার বুক পরীক্ষা করাতে আসেন। এসেই অন্যান্য কথার পরে বলেন—"দেখুন তো বুকটা একটু ভালো ক'রে। পুরোপুরি নিশ্বাস নিতে পারি না, বুকে যেন

চাপ চাপ মতন মনে হয়। এই বয়েসেই লাংসের দোষ আবার নতুন করে ধরে কিনা।"

তাঁর বয়স তখন প্রায় চল্লিশ। পরীক্ষা করে বলি—"কই কিছুই তো হয় নি, আপনার লাংস বেশ ভালোই আছে। কোনোরকম দোষ নেই।"

"ঠিক বলছেন তো? আরো একবার ভালো করে দেখুন।"

আরো একবার পরীক্ষা করে বলি—"ঠিকই বলছি, কিছু দোষ হয় নি।"

তখনকার মতো এতেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান। তারপর কিছুকাল বেশ সুস্থ থাকেন। আবার একদিন হঠাৎ হয়তো কোনো মানসিক কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে নতুন করে অসুস্থ হয়ে ওঠেন। তখন আবার তাঁকে পরীক্ষাদি করে কিছু হয় নি বলে সুস্থ করতে হয়। ওষুধ কিছু দিতে হয় না, কেবল নীরোগ আছেন এই কথাটি বিশ্বস্তভাবে জানিয়ে দিলেই তিনি সুস্থ হয়ে যান।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে তিনি সকল তথ্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেনে রেখেছেন। এ রোগের জীবাণু কেমন, তারা কেমনভাবে মানুষের দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কেমনভাবে ফুসফুসকে আক্রমণ করে, কেমনভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় করতে থাকে, কোন্ বয়সে কাদের পক্ষে সহজে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি, এ সব কোনো কথাই তাঁর জানতে বাকী নেই। এ নিয়ে অনেক বই পড়েছেন, অনেক চিন্তা করেছেন, আর মনে মনে এটা ধরে নিয়েছেন যে, এই রোগেই শেষে তাঁকে মরতে হবে। তিনি বলেন, মরতে যে তিনি ভয় করছেন সে কথা নয়। মরতে কোনো ভয় নেই, সেই তো একদিন মরতেই হবে। কিন্তু টি. বি. হয়ে তিলে তিলে মরতে থাকা, সে বড়ো খারাপ জিনিস।

কিন্তু আসল কথা মরতেই তাঁর ভয়। মৃত্যুভয়েতেই তিনি অমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। আর যেহেতু থাইসিস হওয়া মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু, সেই কারণেই এই রোগটিকে তাঁর এত বেশি ভয়। পৃথিবীতে এসে কিছুই ভোগ করা হলো না, অকালে জীবন ত্যাগ করতে হবে, আর এমন একটা রোগ নিয়ে ভুগতে হবে যাতে কেউই কাছে ঘেঁষতে চাইবে না, একা একা কোথাও মুখ গুঁজে পড়ে থেকে নিঃসঙ্গ স্বজনবিহীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে, এই তাঁর দুর্ভাবনা।

কিছুতেই তাঁর এই ভয়ের ব্যাধিটি দূর হবার নয়। মাসের মধ্যে তিন-চার বার তাঁকে এই ভাবে রোগের ভয়ে আক্রান্ত হতে হয়, কোনো কোনো মাসে আরো বেশি। এই বিশেষ রোগের ভয়েই তিনি বিয়ে পর্যন্ত করেন নি। অথচ থাইসিস শব্দটি তিনি মুখ দিয়ে কখনো উচ্চারণ করেন না, তার বদলে

বলেন টি. বি.। যাকে ভয় করা যায় তার নামটা যত সংক্ষিপ্ত করে আনতে পারা যায় ততই বোধ হয় ভালো।

আমি তাঁকে বার বার পরামর্শ দিয়ে বলি—"আপনি সাহস করে একটা বিয়ে করে ফেলুন। তাহলেই এ রোগ হবার আতঙ্ক আপনার সেরে যাবে। নিতান্ত আপন জন কেউ আপনার না-থাকাতেই এই অবস্থাটি হয়েছে। তেমন ভালোবাসবার মতো কেউ একজন থাকলে, তার দায়িত্ব আর সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে, তখন আর এই নিয়ে ভাবনা করবার অবসর মোটে থাকবে না। দেখবেন তখন আপনি অন্যরকম মানুষ হয়ে যাবেন।"

তিনি বলেন—"হ্যাঁ, আপনার কথায় ঐ ফাঁদে পা দিই আর কি। একে তো বিয়ে-টিয়ে করলেই এ রোগ তাড়াতাড়ি আরো বেড়ে যায় শুনেছি, তার পরে আমার থেকে তাকেও ধরুক টি. বি.-তে, তখন কে কাকে দেখবে আর কে কাকে সামলাবে? রোগ নিয়ে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে আমি নেই মশাই।"

"আমি আপনাকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি, এ রোগ আপনার কখনই হবে না।"

"সে কথা কেমন করে আপনি বলতে পারেন?"

"আমি এতদিন এতবার আপনাকে পরীক্ষা করলাম, আর আমি সে কথা আপনাকে বলতে পারব না? এতকাল কি বৃথাই ডাক্তারি করলাম, একটুও অভিজ্ঞতা জন্মায় নি? সেই অভিজ্ঞতার জোরেই আমি বলছি।"

আমি জানি, এমনি জোর দিয়ে বলতে পারলে তাতে তিনি আশ্বস্ত হন। আমার কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন—"আচ্ছা, তাহলে একটু ভেবে দেখি, ভেবে দেখি।" এই বলে তাড়াতাড়ি তিনি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

কিছুকাল যাবৎ এমনিভাবে সাহস দিয়ে বলতে বলতে ভদ্রলোক অবশেষে সত্যিই একদিন বিয়েটা করে ফেললেন। ভালোই বিয়ে করলেন, মেয়েটি সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী।

যথারীতি নিমন্ত্রণ খেয়ে এলাম। ভাবলাম যে ভদ্রলোকের সেই থাইসিস-ভীতি এবার বোধ হয় ঘুচলো। এখন অন্যরকম ভাবনার পালা।

কিছুদিন পরেই কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ মুখ নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ একভাবে গুম্ হয়ে বসে রইলেন। যখন দেখলেন যে, ঘরে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, তখন বেশ গম্ভীরভাবে বললেন—"না বুঝেসুঝে আমার সম্বন্ধে আপনি কিন্তু ভারী একটি অন্যায় কাজ করেছেন। আপনিই এর জন্যে দায়ী। আমি তো বরাবরই বলে আসছি—"

আমি বললাম—"অত ভণিতা না করে ব্যাপারটা কি তাই বলুন।"

"আমার মোটে পুরুষত্ব শক্তি নেই। এর জন্যে আমাকে অনেক ওষুধ খেতে হবে, আর সে ওষুধের দাম এক পয়সাও আপনি পাবেন না। কারণ আপনিই এর জন্যে দায়ী, আমি তো চাই নি এই বয়সে বিয়ে করতে—"

"কেমন করে জানলেন যে, আপনার পুরুষত্ব শক্তি নেই?"

"আগে তো কখনো পরীক্ষা করে দেখি নি, এখন পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই বুঝতে পারছি।"

"ও কথা নিজের পরীক্ষাতে জানা যায় না, আর অল্পদিনের পরীক্ষাতেও তা জানা যায় না। পুরুষ মানুষের পুরুষত্ব নেই, বিধাতার রাজ্যে এমন খুব কমই হয়ে থাকে। ঐ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, কোনো ওষুধও খাবেন না। একটা বছর অন্তত সময় দিন। তার পরেও যদি আপনার ছেলেপুলে না হয়, তখন দেখা যাবে। এখন ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি বলছি পুরুষত্ব আপনার ঠিকই আছে।"

"ঠিক বলছেন তো? মিথ্যে স্তোকবাক্য নয়?"

"না, আমি ঠিক কথাই বলছি।"

এর পর কিছুদিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

একদিন কাগজে পড়া গেল, দেশের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। সেইদিনই মাঝরাত্রে আমার বাড়ির দরজা ঠেলে লোক ডাকাডাকি হতে লাগল। বাইরে বেরিয়ে এসে শুনলাম, ঐ ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, হার্টফেলের মতো অবস্থা।

ছুটে গেলাম তাঁকে দেখতে। গিয়ে দেখি তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন, এমনি তাঁর ভাব। ত্রস্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—"এবার বোধ হয় রাখতে পারলেন না ডাক্তারবাবু। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, মাঝে মাঝে নাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। আমি নিজে দেখেছি। দেখুন না আমার নাড়ি টিপে। কোথাও কিছু নেই, এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে হঠাৎ এই জিনিসটা শুরু হয়ে গেল।"

আমি বুক পরীক্ষা করলাম, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করলাম। নাড়ির এক একটা স্পন্দন মাঝে মাঝে বাদ পড়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক গতিতেই চলছে। ভয়ে উদ্বেগে নাড়ির গতি কখনো কখনো অমন হয়ে থাকে। সেটা হার্টের কোনো দোষ নয়।

আমি বললাম—"ঘুমুতে ঘুমুতে কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন?"

"তা তো মনে পড়ছে না।"

"ঘুমের আগে কিছু চিন্তা করেছিলেন ?"

"চিন্তা তো ছিলই। আজকের কাগজে সেই নিদারুণ মৃত্যুর খবরটা পড়া পর্যন্ত—"

আমি বললাম—"তাই থেকেই এটা হয়েছে। আপনি মনে মনে নিশ্চয় বারকতক ভেবেছেন যে, আমারও অমনি হঠাৎ হার্টফেল হতে পারে। সেই ভাবনাটাই আপনার মনের উপর ও নার্ভগুলোর উপর কাজ করেছে। ও কিছুই নয়, আমি ওষুধ দিচ্ছি, সেরে যাবে।"

"কি ওষুধ দেবেন ? তাহলে হার্টেরই ওষুধ তো ?"

"না না, তা কেন। হার্টে আপনার কিছুই হয় নি, আমি আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেবো, মাথা ঠাণ্ডার ওষুধ দেবো।"

"হার্টফেল হয়ে মরবো না, বলছেন ?"

"নিশ্চয়ই মরবেন না, গ্যারান্টি দিচ্ছি।"

"তবে নাড়ির গতিটা হঠাৎ অমন থেমে থেমে হচ্ছে কেন ?"

"অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লে কখনো কখনো অমন হয়ে থাকে।"

"আর যদি কোনো ওষুধই আপনার না খাই ? তাহলে কি এটা সারবে না ?"

"তাতেও ওটা আপনা থেকেই সেরে যাবে।"

"তাহলে কোনো ওষুধই দিতে হবে না। দেখি আপনার কথা সত্যি হয় কি না।"

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। পরের দিন সকালে হাসতে হাসতে চেম্বারে এসে ভদ্রলোক বললেন—"এখন বেশ ভালোই আছি। কাল রাত্রে আপনি চলে আসার পরেই আমি সুস্থ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

কিন্তু হার্টফেলের ভয় একবার ধরলে কি তা সহজে ছাড়তে চায় ! মাঝে মাঝে তাঁর হার্টফেল হবার উপক্রম হতেই থাকল। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা, হার্টের দুম্ দুম্ শব্দ নিজের কানে শুনতে থাকা, মনে হতে থাকা যে, ঐ শব্দটা বুঝি এবার থেমে যাবে। কিছুই বলা যায় না, ও বিষয়ে কোনো নির্ভরতাও নেই, আর নিশ্চিন্ততাও নেই। পথ চলতে চলতে তিনি বার বার নিজের নাড়ি টিপে দেখেন, ঠিক সমান তালে চলছে কিনা। যেমনি দেখেন যে, কিছু বেতাল মনে হচ্ছে, অমনি সটান আমার কাছে এসে হাজির হন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—"এবার দেখুন, নাড়ি কত গোলমেলে ভাবে চলতে শুরু করেছে। আমি কি আর আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি !"

আমি ধমক দিয়ে বলি—"তা হোক, আপনি আগে এখানে একটু চুপ করে বসুন। তার পরে দেখব।"

ধমক খেয়ে তিনি চুপ করে বসেন। কয়েক মিনিট পরে আমি নাড়ি পরীক্ষা করি, বুক পরীক্ষা করি। কোনোই গণ্ডগোল নেই। হেসে তখন বলি—"কই কিছুই তো দোষ পেলাম না।"

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে আবার কিছুক্ষণ নিজের নাড়ি টিপে দেখেন। তার পরে বলেন—"আশ্চর্য, আপনার কাছে যেমনি এলাম, সেটা আপনা থেকে সেরে গেল। আমি নিজেই বুঝতে পারছি, সমস্ত এখন ঠিক হয়ে গেছে। কোনো দোষ আর নেই।"

আমি বললাম—"তাহলে রোজ দুবেলা এসে আমার কাছে বসে থাকুন। তাতে শেষ পর্যন্ত ওটা আর হতেই পারবে না।"

প্রত্যহ তাই তিনি করতে থাকলেন। তবুও মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর বুক পরীক্ষা করে বলতে হতো যে হার্টের কোনো দোষ নেই।

শুধু তাই নয়। সারা সপ্তাহের মধ্যে রবিবার দিনটি আমার ছুটি। ঐ দিনটি চাকরিতেও ছুটি থাকতো, তাই ডাক্তারখানার কাজেও ছুটি নিতাম। একটা দিন বিশ্রাম নেবার জন্যে তোড়জোড় করে শহরের বাইরে যেখানে হোক কোথাও মাছ ধরতে চলে যেতাম। মাছ ধরার এক রকমের নেশা আছে। মনটি তাতে বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির ভাবে নিবিষ্ট হয়ে থাকতে পারে, তাতে কতক সময়ের জন্যে সে নিত্যদিনের ভাবনাচিন্তার হাত থেকে রেহাই পায়। বিশেষ করে সেইজন্যেই আমাকে এই মাছ ধরার নেশাতে পেয়ে বসেছিল। আমি কোনো রবিবারই ফাঁক দিতাম না, হাতে যতই কাজ থাক।

তাতে কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের মুশকিল হলো। সারা রবিবারের মধ্যে তিনি আমার কোনো পাত্তা পান না। যদি কোনো একটা রবিবারের মধ্যেই তাঁর হার্টের কিছু একটা গোলমাল হয়ে যায়, তাহলে কি হবে! শনিবার থেকেই তাই বলতে শুরু করেন—"কাল তো আসছে রবিবার, সারাদিন আপনার দেখাই পাওয়া যাবে না। কাল যে কি হবে তাই ভাবছি।"

একদিন ধৈর্য ধরে থাকতে না পেরে তিনি বললেন—"আপনি তো মাছ ধরতে যান, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমি মাছধরা দেখতে খুব ভালোবাসি।"

আমি বললাম—"বেশ তো, চলুন আমার সঙ্গে।"

তারপর থেকে প্রতি রবিবারেই তিনি হলেন আমার মাছধরার সঙ্গী।

আমি চার করে ছিপ ফেলে বসতাম, তিনি চুপ করে বসে থাকতেন আমার পাশে।

এতে আমারও সুবিধা হয়ে গেল। সর্বক্ষণ ফাৎনার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে থাকা, সে ভারি কষ্টকর। নেশা যতই থাক্ অতটা আমার ধাতে সয় না। আমি ফাৎনার দিকে চাইতে চাইতে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যাই, স্থির জলের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনটা যখন অনেকখানি থিতিয়ে স্থির হয়ে শান্ত হয়ে আসে, তখন কোথায় যেন আমি নিজেকে হারিয়ে বসে থাকি। কখনো বা ফিরে যাই অতীতের রাজ্যে, কখনো বা তলিয়ে যাই ভবিষ্যতের আলো-ছায়ার মরীচিকার মধ্যে। বর্তমানের সব কিছুই ভুলে বসে থাকি, মাছধরা তো দূরের কথা। তাতে কিন্তু অনেক সময় মাছে টোপ খেয়ে যায়, কিংবা ছিপসুদ্ধ টেনে নিয়ে পালিয়ে যায়।

ঐ ভদ্রলোক সঙ্গে যাবার পর থেকে আমি একখানি করে বই নিয়ে যেতাম। তাঁকে বলতাম যে, আপনি ফাৎনার দিকে লক্ষ্য রাখবেন, একটু নড়ে উঠলেই আমাকে বলবেন। এই বলে আমি বই খুলে পড়তে শুরু করে দিতাম। বইখানাই যে মন দিয়ে পড়তে পারতাম তাও নয়। কয়েক লাইন পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে যায়, তখন বই-এর কথা আর কল্পনার কথা একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক অপরূপ দিবাস্বপ্ন রচনা করতে শুরু করি। তাই হলো আমার মনের বিশ্রাম। এমনি কোনো দিবাস্বপ্নের মধ্যে মশ্‌গুল্ হয়ে আছি, তখন হয়তো অকস্মাৎ ঐ ভদ্রলোক আমার গা ঠেলে চেঁচিয়ে ওঠেন—
"ডাক্তারবাবু, টান মারুন—"

তখন কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে সজোরে এক খ্যাঁচ্ মারি। কিন্তু মাছ তখনও টোপ খায় নি, হয়তো ঠুকরেছে মাত্র, কিংবা হয়তো বাতাসে ফাৎনা একটু নড়ে উঠেছিল। আমার খ্যাঁচ মারার চোটে পিছনের গাছের ডালে উঠে গিয়ে বঁড়শিটা বেধে যায়। গাছে কাউকে উঠিয়ে সেটা ছাড়িয়ে আনতে হয়। তবে একথা অস্বীকার করবো না, মাছ আমি ধরেছি অনেক।

বর্ষা এসে পড়ল। আমরা দুজনে আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফ মুড়ি দিয়ে পুকুরধারে সারা দুপুর বসে ভিজছি, অত বৃষ্টিতে একটা মাছও টোপ খাচ্ছে না, অথবা খেলেও তা বোঝা যাচ্ছে না। এমনও অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু এত অত্যাচারেও সেই ভদ্রলোকের হার্টের কোনো গোলমাল হলো না। কিন্তু ওর পরে যা হলো তা আবার অন্যরকমের ব্যাপার।

একদিন ভদ্রলোক আমার ডাক্তারখানায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। আমি তখন সেদিনের কাগজটা পড়ছি।

"শুনুন শুনুন ডাক্তারবাবু, এখন কাগজ রাখুন। সিরিয়স কথা, এবার আর বাজে কথা নয়। নির্ঘাত আমার ডায়েবিটিস হয়েছে। সত্যিকার ডায়েবিটিস্। কি করা যায়?"

"কেমন করে জানলেন ডায়েবিটিস?"

"অনবরতই জলতেষ্টা পাচ্ছে, আর খিদে পাচ্ছে। যতই খাচ্ছি, কিছুতেই আমার খিদে কিংবা তেষ্টা মিটছে না। বারে বারে জল খেতে হচ্ছে। তাই তো ডায়েবিটিসের লক্ষণ?"

"বেশ তো, আন্দাজের কি দরকার, প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে দেখুন না।"

"ঠিক বলেছেন। ওতেই ঠিক ধরা পড়বে। আমি রাজী আছি। এখনই করবেন? আপনার তো সব যন্ত্রপাতি এখানেই আছে।"

তাঁর সামনেই পরীক্ষা করা হলো। প্রস্রাবে কিছুমাত্র চিনি নেই। কিন্তু তবুও ভদ্রলোক খুশি হলেন না। বললেন—"আপনারাই বলেন, প্রস্রাবে সব সময় সুগার মেলে না। একবার ব্লাডসুগার পরীক্ষা করে দেখবেন?"

আমি আর সে কথার জবাব দিলাম না। ভদ্রলোক তাতে ক্ষুণ্ণ হলেন।

কিন্তু কিছুদিন পরে সত্যিই এবার তাঁর একটা রোগ হতে দেখা গেল। তিনি টাইফয়েডের জ্বরে আক্রান্ত হলেন। প্রথমটায় তা বুঝতে পারা যায় নি, কয়েকদিনের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা গেল। আমি একটু চিন্তিত হয়ে যথাসাধ্য নরম করে বললাম—"আপনার জ্বরটা হয়তো বিগড়ে গিয়ে টাইফয়েডে দাঁড়াতে পারে।"

তিনি বললেন—"হয় হোক্, তার আর কি করা যাবে।"

আমি বললাম—"এমন একটা শক্ত রোগের কথা শুনেও আপনার ভয় ভাবনা হচ্ছে না?"

তিনি হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"কিচ্ছু না, ওতে আর ভাবনা কিসের? টাইফয়েডকে আমার কোনো ভয় নেই, এ রোগে আমি মরবো না। কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, এই যা।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সত্যিকার রোগে উনি কোনো ভয় পান না, যত ভয় ওঁর মিথ্যা রোগ নিয়ে!

নির্দিষ্ট সময়ে উনি সেরে উঠলেন। কিছুকাল পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই থাকলেন। আমি ভাবলাম হার্টফেলের ভয়টা এবার গেল বুঝি।

ইতিমধ্যে তাঁর দু-তিনটি সন্তানাদি হয়েছে। পুরুষত্বহানির যে আশংকা ছিল তাও ঘুচে গেছে। হঠাৎ একদিন এসে বললেন—"ডাক্তারবাবু, আমার ব্লাড্‌প্রেসারটা একবার দেখুন তো! বোধ হয় খুব বেড়ে গেছে। কদিন থেকে মাথাটা কেমন ঘুরছে।"

যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলাম। প্রেসার বেশি নয়, বরং একটু কমের দিকেই। তাই বললাম—"বাড়ে নি কিছু, কমই তো দেখছি।"

তিনি চুপ করে বসে কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—"টি. বি. হলে ব্লাড্‌প্রেসার কমে যায় না?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু সে সামান্য কম নয়, অনেক বেশি কমে যায়। আপনার যেটুকু কম দেখছি, ওই হয়তো আপনার পক্ষে স্বাভাবিক।"

"ভাবনা চিন্তা বেশি হলে ব্লাডপ্রেসার বাড়ে না কমে?"

"তার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। কেন, ভাবনাচিন্তা আবার এখন কিসের?"

তিনি তখন চুপ করে রইলেন, আর কোনো কথা বললেন না।

কয়েকটা দিন পরে আবার এসে হাজির। যেন বিশেষ কিছু প্রয়োজনে আসেন নি, এমনি আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলে উঠে চলে যাচ্ছেন, হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে গেল, এই ভাবে ফিরে এসে বললেন—"ভালো কথা, প্রেসারটা আজ একবার দেখে দিন তো।"

দেখলাম প্রেসার। বললাম যে, একই রকম আছে।

কিন্তু তবুও এই ধরণের আচরণ কয়েক বারই তিনি করলেন। যেন ও একটা তুচ্ছ অবান্তর কথা, মনে উদ্বেগ কিছু নেই, কথাচ্ছলে প্রেসারের প্রশ্নটা হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে, তাই একবার দেখিয়ে নিচ্ছেন। আবার তাতে একটু অপ্রস্তুতও হচ্ছেন, আমাকে অনর্থক বিরক্ত করা হচ্ছে বলে।

তাই একদিন আমি বলে ফেললাম—"প্রেসার বাড়ার ভয়টা মাথায় ঢুকছে কেন? কয়েক বারই তো দেখলেন যে বাড়ে নি।"

তিনি বললেন—"তা দেখতে পাচ্ছি বৈকি, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। মনের ভিতরকার প্রেসারটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে কিনা। তবে আপনাকে বলেই ফেলি, এর জন্যেও দায়ী আপনি।"

"কেন, আবার কি হলো?"

"হয়নি এখনও কিছু, কিন্তু প্রত্যেক মাসেই হবে হবে বলে আতঙ্ক হতে থাকে। তিনটেকে নিয়ে অস্থির হয়ে আছি, আরো যদি হতে থাকে তাহলে খাওয়াবো কি? এমন একটা কিছু ওষুধ দিতে পারেন যাতে আর না হয়? যত দামই হোক তা আমি দিতে রাজী আছি।"

"বৈজ্ঞানিক মহলে এই নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন কিছু ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলে সন্তানাদি হবেই, প্রকৃতির এই নিয়ম।"

"কে জানতো যে আমার মধ্যে এমন বয়সে এতটা বেশি পুরুষত্ব ছিল।"

"কিন্তু ওর জন্যে ব্লাড্ প্রেসার বাড়বে কেন?"

"ভাবনাতে ভাবনাতে ক্রমশ ওটা বাড়ে বৈকি। আপনার তো কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, আপনি এ কথা বুঝবেন না। আজকাল এত লোকের অল্প বয়স থেকেই প্রেসার বাড়ছে, কেন তা বলতে পারেন? ফট্ ক'রে হঠাৎ সুস্থ মানুষগুলো থ্রম্বোসিস হয়ে মারা যাচ্ছে, কেন বলতে পারেন? সবই হচ্ছে দুশ্চিন্তার ফলে। আগেকার লোকদের এ সব রোগ ছিলই না, কারণ তাদের কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু আমাকে অনবরতই ভাবতে হচ্ছে যে হঠাৎ যদি আজ আমি মারা যাই, তাহলে আমার ছেলেপুলেগুলোকে খাওয়াবে কে? এ ভাবনা কেবল আমার একার নয়, আজ অনেককেই এই ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। সময়টা কেমন পড়েছে দেখছেন না!"

"আপনি বলতে চাইছেন যে পৃথিবীতে মানুষের কোনোকালেই কিছু দুশ্চিন্তা ছিল না, কেবল আজই এসেছে যত দুশ্চিন্তার যুগ। তাও যদি হয়, যখন দেখছেন যে কেবল দুশ্চিন্তাতে কোনো কিছুর মীমাংসা হয় না, তখন ওটা অন্তত আপনি ছাড়ুন। মরবার সময় না-আসা পর্যন্ত কিছুতেই আপনি মরবেন না। মিছে ভয় ক'রে করে শরীর আর মন দুটাকেই আপনি অসুস্থ করে তুলছেন।"

এ কথা বলার পর থেকে আর তিনি আমাকে ব্লাডপ্রেসার দেখতে অনুরোধ করেন নি। তবে আসতেন তিনি বরাবরই আমার কাছে, অনেক কাল পর্যন্ত। আমি নিজেই যদি যেচে জিজ্ঞাসা করতাম, হার্ট পরীক্ষা করতে হবে নাকি, তাহলে তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন—"নাঃ, মনকে আমি শক্ত করে ফেলেছি। ওগুলো মনের দুর্বলতা বৈ তো নয়, ওকে আর আমি প্রশ্রয় দিতে রাজী নই। এখন বুকে কোনো কষ্ট হলেও আমি সেটাকে উড়িয়ে দিই। গ্রাহ্যই করি না।"

বাস্তবিকই হয়তো ক্রমশ তিনি নিজেকে অনেকটা শক্ত করে নিতে পারলেন। কিংবা হয়তো মনের দুর্বলতাকে তিনি মনেই চেপে রাখতে শিখেছেন, বাইরে বেরোতে দেন না। মোট কথা, মনের মধ্যে কিছু লুকোনো থাকলেও আমার কাছে আর তা প্রকাশ করেন না।

কিন্তু বোধ করি মানসিক অসুস্থতা জিনিসটা সংক্রামক। একজন বাইগ্রস্ত মানুষের কাছে নিত্য থাকতে থাকতে অন্যের মধ্যেও তা ঢুকে পড়তে পারে। ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রী বেশ সুস্থ সবল মানুষ। কিন্তু ইদানিং দেখেছি তিনি নানান রকম রোগে ভুগতে শুরু করলেন, যার উৎপত্তি শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মন থেকেই। কোনোদিনই যেন তিনি সুস্থ থাকেন না, একটা না একটা কিছু নিত্য লেগেই আছে। অবশ্য শরীর নিয়ে খুঁৎখুঁতি একটু আধটু সকলেই আমরা করে থাকি, এটা হয়তো সভ্য মানুষদের ধাতের মধ্যেই এসে গেছে, তাদের সূক্ষ্মানুভূতির মাত্রাটা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে। আর শরীর রক্ষার জন্যে তার কিছু দরকারও আছে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, এ জিনিসের বাড়াবাড়ি হতে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আজকালকার দিনে অনেকের মধ্যেই এ জিনিস দেখা যাবে। আমাদের মনকে বিশেষ সতর্ক রাখা দরকার, যেন তাদের কাছ থেকে তার ছোঁয়াচটা এসে মনের মধ্যে না লাগে।

॥ সতেরো ॥

টাইফয়েড ফিভারের নাম করাতে মনে পড়ছে—একবার উপর্যুপরি কয়েকটা টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি কি রকম নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। তখন টাইফয়েড জাতীয় রোগের কোনো সার্থক ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি, কাজেই রোগের লক্ষণ ধরে চিকিৎসা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর ছিলনা। তেমনি ভাবে তখন চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতায় আমাকে যে কতখানি হয়রাণ করে তুলেছিল সে কথা বলবার নয়। এমন কি তখন এতটাই ধিক্কার এসে গিয়েছিল যে মনে হয়েছিল ডাক্তারি প্র্যাক্‌টিস করা ভুল হচ্ছে, এ কাজ আমার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। একটাকেও যদি সারাতে না পারলাম, তাহলে এ মিথ্যা ব্যবসার মূল্য কি আছে!

নলিনাক্ষ একজন সাহিত্যিক। নামজাদা সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু সাহিত্যই তার পেশা। অর্থাৎ সে লিখে পয়সা রোজগার করে।

প্রায়ই ইংরেজী বাংলা খবরের কাগজে নানারকম প্রবন্ধ লেখে, তাতে সে কিছু পায়। বাংলা গল্প উপন্যাস লিখে পাব্‌লিশারকে বেচে দেয়, তাতেও কিছু পায়। কেউ কেউ ওকে দিয়ে বই লিখিয়ে নিয়ে নিজের নামে ছেপে বের করে, তাতেও কিছু পায়। আবার পরীক্ষাদির খাতা দেখে, তাতেও কিছু পায়। পেটে বিদ্যা আছে, সাহিত্যেও বেশ দখল আছে। সুতরাং একরকম করে চলে যায়। সংসারে তার খুব অনটন নেই। পৈতৃক সম্পত্তিও কিছু আছে। সেকেলে আমলের একতলা বাড়িখানি নিজেদের।

তবে নলিনাক্ষকে মধ্যবিত্ত বলা যায় না, টানাটানি করেই তাকে চালাতে হয়। সংসারযাত্রা সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। সাধারণ ডালভাত খেয়েই থাকে, মাছ কোনোদিন জোটে আর কোনোদিন জোটে না। বেশভূষার বাহুল্য নেই, বাড়ির সকলে প্রায় এক বস্ত্রেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেই তারা সুখে আছে, কোনো অভাব বোধ করে না। ঐরকম জীবনযাত্রাই তাদের গা-সওয়া।

নলিনাক্ষের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাদের ভালো ভাবে মানুষ ক'রে তোলাই নলিনাক্ষের জীবনের সব চেয়ে প্রধান লক্ষ্য। ছোটো ছেলেমেয়েগুলি সবাই নাবালক। কেবল বড়ো ছেলেটি সাবালক হয়েছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করে সে বিনা বেতনে মাসিক জলপানি পাচ্ছে। ছেলেটির নাম চণ্ডী। এমন মেধাবী ছেলে ক্বচিৎ দেখা যায়। পরীক্ষাতে সকল বিষয়েই সে প্রথম হয়, পরীক্ষক তার খাতা দেখে একটি নম্বরও কাটতে পারেন না। নলিনাক্ষ গর্ব করে বলে, "আমার এ ছেলে একখানি হীরের টুকরো।" সেই ছেলেটিই তার ভবিষ্যৎ জীবনের আশাভরসা, সে জানে যে এই ছেলে একদিন তার বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, একটা কিছু অসাধারণত্ব দেখাবে। ছেলের মুখ চেয়েই সে পরম আনন্দে আছে।

নলিনাক্ষের আরো একটি শখ আছে, গরু পোষা। তাও ঐ ছেলে-মেয়েদেরই জন্যে, তারা ঘরের খাঁটী দুধটুকু খেতে পাবে। অন্য কিছু দামী দামী ভালো জিনিস খেতে না পেলেও ওতেই তাদের পুষ্টি হবে। তাই সে নিজের হাতে গরুর সেবা করে, নিজেই জাব কেটে খোল মেখে তাদের খাওয়ায়। তবে নলিনাক্ষের পরিচ্ছন্নতা বোধ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান খুব কম। গোয়াল ঘর মাঝখানে করার দরুণ সমস্ত বাড়িটাকে সে নোংরা করে রেখেছে, সেই গোয়ালের ভিতর দিয়েই তাদের যাতায়াত। আর বাড়ির উঠোনের মধ্যে একটি নাতিগভীর সেকেলে পাতকুয়া আছে, তার থেকে জল তুলে গোয়ালেও ব্যবহার করা হয়, কাপড় কাচা ও বাসন প্রভৃতিও মাজা হয়।

সুস্থ থাকতে হলে যে সেই দূষিত জল সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া দরকার, সে বোধ তার নেই।

ভাদ্রের পর আশ্বিন পড়েছে, পূজা আসন্নপ্রায়। শহরে তখন টাইফয়েডের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। নলিনাক্ষের প্রথম ছেলে চণ্ডী সেই সময় জ্বরে পড়ল। প্রথম থেকেই বোঝা গেল এ টাইফয়েড, প্রবল জ্বরের সঙ্গে মারাত্মক সব সুস্পষ্ট লক্ষণ। ভুল বকা, মাথার যন্ত্রণা, নাক খোঁটা, বিছানার চাদর ধরে টানা ইত্যাদি। অথচ যখন একটু ভালো থাকে তখন বেশ হেসে কথা বলে, বলে—"কিছুই আমার হয় নি।"

গোড়া থেকে সে আমারই চিকিৎসাতে রইল। নলিনাক্ষ আমাকে চিনতো। আমি সাহিত্যিকদের একটু ভালোবাসি, তাদের প্রতি আমার খানিকটা সহানুভূতি আছে। দেশের নানারকম পেশার মানুষদের মধ্যে তারাই সকলের চেয়ে গরিব। মাতৃভাষার জন্যে তারা জীবনপাত করে, দেশের লোক যাতে মনের খোরাক পায়, মন যাতে তাদের একটু উন্নত হয়, অনেক দুঃখের মধ্যে নিপীড়িত হয়েও লোকের মন যাতে একটু আনন্দ পায়, সেই দিক দিয়ে তারা প্রাণান্ত পরিশ্রম করে। অথচ সেই পরিশ্রমের মূল্য তারা কতটুকুই বা পায়। অথচ এই কাজ নিয়েই তারা অনেক কষ্টে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে, অন্যান্য উপায়ে বেশি অর্থোপার্জনের দিকে তারা কখনো লোভ করে না। আমি অনেক সাহিত্যিকের ঘরের খবর জানি। তাদের কারো কারো অবস্থা স্কুলমাষ্টারদের চেয়েও বিপজ্জনক। কারণ স্কুলমাষ্টারদের তবু একটা বাঁধা আয় থাকে, তারই পরিমাণ বুঝে তারা সংসার চালাবার একটা যাহোক ব্যবস্থা করে নিতে পারে। কিন্তু সাহিত্যিকের আয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো একখানা বই কিংবা কিছু প্রবন্ধাদি লিখে হাতে বেশ কিছু থোক টাকা এসে গেল, অমনি ভালো রকম খাওয়াদাওয়াতে আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাতে অল্পদিনেই সে টাকা খরচ করে ফেললে। তারপরে কিছুদিনের জন্যে আর কোনো আয় নেই, তখন দারুণ টানাটানি আর ধারকর্জ। এমনি করেই তাদের জীবন কাটে। আমি সে কথা ভালোরকম জানি, তাই সাহিত্যিকদের বাড়িতে রোগী দেখতে কিছু ফী নিই না। এমনিতেই তাদের চিকিৎসাদি করে থাকি। এটা চ্যারিটি হিসাবে নয়, তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন করা হিসাবে। নলিনাক্ষের সেকথা জানা ছিল। তাই সে আমার হাতেই ছেলের চিকিৎসার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু টাইফয়েড রোগের চিকিৎসা করা খুব সহজ কথা নয়, বিশেষতঃ

দর্শনকার দিনে। শুধু ওষুধ দিয়ে চলে আসা নয়, তার রীতিমত পরিচর্যা হচ্ছে কিনা তা দেখা চাই। সে পরিচর্যার জন্যে বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী শুশ্রূষাকারীর দরকার। বেশি জ্বর হলে তার মাথায় বরফ দিতে হবে, দু-তিনবার করে আধা স্নান করানোর মতো করে ভিজে কাপড় দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে হবে, ঘড়ি ধরে পথ্য খাওয়াতে হবে, প্রত্যেক বার মুখ ও জিভ পরিষ্কার করে দিতে হবে যাতে ভিতরে ঘা হতে না পারে, পিঠে স্পিরিট লাগাতে হবে যাতে বেডসোর না হতে পারে, ইত্যাদি ওর অনেক হাঙ্গামা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় নলিনাক্ষের স্ত্রীটি এমন আনাড়ি ও নির্বোধ যে কিছুই সে ঠিকভাবে করতে পারে না। সে না পারে স্পঞ্জ করতে, না পারে উচিত মত পথ্য তৈরি করতে, না পারে যত্ন নিয়ে পরিচর্যা করতে। এমন কি ওষুধটা পর্যন্ত মুখে ঢেলে দিতে পারে না, এমন ভাবে ঢালে যে অর্ধেক তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। পথ্য খাওয়াতে গেলে তার খানিকটা কানের মধ্যে ঢুকে যায়, খানিকটা গলার পাশ দিয়ে গড়িয়ে বিছানা ভিজে যায়। তখন বিছানার চাদর পাল্টাতে গিয়ে সে আরো অনর্থ করে বসে। রোগীকে উঠিয়ে বসিয়ে এপাশ ওপাশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে উত্যক্ত করে তোলে। আবার ভালো করে কিছু বোঝাতে গেলে বোকার মতো হাসে।

এই সব কারণে ঐ শক্ত রোগীর চিকিৎসা নিয়ে আমি খুব মুশকিলে পড়লাম। দুবেলা আমাকে যেতে হতো আর খানিক খানিক পরিচর্যা নিজের হাতেও দেখিয়ে দিয়ে আসতে হতো। অবশ্য নলিনাক্ষ যথেষ্টই সাহায্য করতো। সে-ই প্রত্যহ রাত জাগতো, বেডপ্যান দেওয়া প্রভৃতি সব কিছু সে নিজের হাতে করতো। আর মাঝে মাঝে অন্য কিছু সাহায্যের দরকার হলে আমার কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দিতাম। নার্স নিযুক্ত করার মতো সামর্থ্য তাদের ছিল না।

কিন্তু সকল রকমের ব্যবস্থা করা সত্বেও রোগ উত্তরোত্তর বাড়ের দিকে চলতে থাকলো। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই রোগী সর্বক্ষণ অচৈতন্যের মতো হয়ে রইল। তাকে ডেকে ডেকে পথ্য খাওয়ানো যায় না, ওষুধ পর্যন্ত খাওয়ানো যায় না। জোর করে সে মুখ বুজিয়ে থাকে, চামচ দিয়ে মুখ খুলিয়ে তবে তাকে কিছু খাওয়াতে হয়। তাও মুখে ঢেলে দিলে বহুক্ষণ পর্যন্ত মুখের মধ্যেই থেকে যায়, সেটুকু গিলে ফেলতে অনেক বিলম্ব হয়।

একে বলে ভিরুলেণ্ট টাইফয়েড। মারাত্মক ব্যাধি, এর জীবাণুগুলোই স্বভাবত খুব মারাত্মক, তাদের বিষক্রিয়া অত্যন্ত বেশি। মানুষের দেহ-প্রকৃতি

তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যুঝতে পারে না, তাই তখনকার দিনে শতকরা প্রায় নব্বুইজনই এমন বাড়াবাড়ির অবস্থাতে মারা যেতো। চিকিৎসায় আর কতটুকু সাহায্য করা যেতে পারে, যদি জীবাণুদের মারতে না পারা যায়। তখনকার দিনে ঐ জীবাণুদের বিরুদ্ধে একরকম ফাজ্ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাকে বলে 'টাইফয়েড ফাজ'। ট্রপিক্যাল থেকে টাটকা ফাজ আনিয়ে আমি রোগীকে দিতে লাগলাম। অনেক রোগীকে ওর দ্বারা আরোগ্য হতে দেখেছি, কিন্তু এখানে তার বিশেষ কিছু ফল হতে দেখা গেল না। জ্বর একটুও নরম হলো না, বিষক্রিয়া একটুও কমল না।

তৃতীয় সপ্তাহে যাওয়ার পর থেকে রোগী আরো বেশি বিগড়ে গেল। সে হাত পা গুটিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে, আর মাঝে মাঝে এক রকম গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে। সর্বদা অজ্ঞান অচৈতন্য, কিছুই তাকে খাওয়ানো যায় না, চামচ দিয়ে জোরে দাঁত ফাঁক করতে গেলে রক্তপাত হতে থাকে। অথচ তাকে তো কিছু খাওয়াতেই হবে, একেবারেই কিছু না খাইয়ে ফেলে রাখা যায় না। অগত্যা নাকের ভিতর দিয়ে রবারের নল চালিয়ে সেই নলের ভিতর দিয়ে ওষুধ আর পথ্যাদি দেওয়া হতে লাগল। প্রত্যহ আমাকেই তা করতে হতো।

কিন্তু তার পরে উদরাময়ের লক্ষণ শুরু হয়ে গেল, আর মলের সঙ্গে প্রচুর রক্ত নির্গত হতে থাকল। তখন বুঝলাম আর রক্ষা নেই। নলিনাক্ষকে সে কথা আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়ে বললাম, কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে এনে দেখাও। যথাসাধ্য চেষ্টা করা হোক, তোমার মনে কোনো ক্ষোভ না থাকে।

নলিনাক্ষ কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করলে, ডাক্তার সরকারকে ডেকে আনা হলো। তিনি খুব যত্ন সহকারে রোগী দেখলেন, কি চিকিৎসা করা হচ্ছে সমস্তই দেখলেন, তার পরে বললেন সবই ঠিক ঠিক হচ্ছে, কেবল রোগীর মায়ের রক্তশিরা থেকে কতকটা রক্ত টেনে নিয়ে ওকে ইন্জেকশন দিয়ে দেখতে পারো, তাতে হয়তো রক্তপাত থামতে পারে আর উপকারও অন্য দিক দিয়ে হতে পারে।

তখন সেই ব্যবস্থাই করা হলো। পঞ্চাশ সি. সি. মাত্রার একটা বড়ো সিরিঞ্জ এনে আমি নলিনাক্ষের স্ত্রীর হাতের শিরা ফুটিয়ে রক্ত নিতে শুরু করলাম।

নলিনাক্ষের শাশুড়ী সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেখে মনে হলো

তিনি বেশ অবস্থাপন্ন, অন্ততপক্ষে এটা দেখলাম যে তাঁর গায়ে অনেক গহনা রয়েছে। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমার কার্যকলাপ দেখছিলেন। যখন দেখলেন যে অত বড়ো একটা সিরিঞ্জের মধ্যে তাঁর মেয়ের দেহ থেকে আমি রক্ত টেনে বের করে নিচ্ছি, তখন হঠাৎ এসে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন—"না না, তুমি ওকে ছেড়ে দাও। অমন করে রক্ত টেনে নিলে মেয়ে আমার মরে যাবে। আমার মেয়েকে অমন করে মেরে ফেলতে দেব না। ওসব গুণ্ডামি এখানে চলবে না।"

নলিনাক্ষ তাঁকে পিছন থেকে জাপটে ধরে জোর করে সরিয়ে নিলে, বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলে যে অল্প খানিকটাই রক্ত নেওয়া হবে, তাতে ওর কোনো ক্ষতি হবে না। আর ছেলে যদি ওতে বেঁচে ওঠে তাহলে তার মায়ের কিছু ক্ষতি হলেও সে তো মায়ের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা, নিজের রক্ত দিয়ে সে ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে।

কিন্তু এ সব যুক্তি তিনি কানেও নিলেন না। অকথ্য গালাগালি দিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করতে থাকলেন। নলিনাক্ষ তখন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য এক ঘরে শিকল বন্ধ করে রাখলে।

মায়ের রক্ত নিয়ে রোগীকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হলো। তার কিছু ফল হতেও দেখা গেল। উদরাময় ও রক্তপাত হওয়া থেমে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগী বাঁচল না। চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে একদিন সে হার্টফেল করে মারা গেল।

সে তো গেলই, কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছিল অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলির জন্যে। টাইফয়েড হলো দারুণ সংক্রামক রোগ, অতঃপর অন্যগুলিকে না আক্রমণ করে। আমি তাদের সকলকে তফাতে তফাতে রাখতে বলেছিলাম, আর সময় থাকতে টাইফয়েড ভ্যাক্সিন ইন্‌জেকশন দিয়ে তাদের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবার কথা নলিনাক্ষকে বলেছিলাম। কিন্তু নলিনাক্ষ সে কথা গ্রাহ্যই করে নি। সে তখন আমাকে বলেছিল—"ওদের জন্যে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না। ওরা তো সব নকল ছেলে, আসল ছেলে আমার ঐটি। আগে ওকেই আপনি রক্ষা করুন, ওদের সম্বন্ধে কিছু না ভেবে এখন কেবল ওর কথাই আপনি ভাবুন।"

একদিন নলিনাক্ষ তাদের বাড়ির উঠোনের সেই পাতকুয়ার তলায় দাঁড়িয়েছিল। আমি সেখান দিয়ে যেতে যেতে বললাম—"ঐ পাতকুয়ার জলটা তোমাদের ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। এর জল নিশ্চয়ই দূষিত

হয়েছে, ওর থেকেই হয়তো রোগের সংক্রমণ এসেছে। ঐ জলে বাসনমাজা প্রভৃতি তোমরা বন্ধ করে দাও।"

নলিনাক্ষ একটু হেসে বললে—"ও সব বৈজ্ঞানিক নিয়ম আপনাদের শাস্ত্রেই কেবল লেখা থাকে। ভাগ্যের নিয়ম ওর থেকে আলাদা। ভাগ্য বিজ্ঞানের কোনো ধার ধারে না। রোগে যাকে ধরবার হয় সে ঐ জল না ছুঁলেও তাকে রোগে ধরে, কিন্তু এই দেখুন আমি এ জল খেলেও আমাকে রোগে ধরবে না।"—এই বলে সে আমার সুমুখেই পাতকুয়ার বালতি থেকে খানিকটা জল আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে খেয়ে ফেললে। আমি হতভম্ব।

কিন্তু নলিনাক্ষের বড়ো ছেলেটি মারা যাবার কয়েকদিন পরেই তার আর একটি ছেলে জ্বরে পড়ল। ক্রমে দেখা গেল তারও ঐ একই রকমের টাইফয়েড। আমি খুবই চিন্তিত হয়ে নলিনাক্ষকে বললাম—"তুমি এবার ডাক্তার বদলাও। একটি ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। এবার অন্য কারো হাতে ভার দাও, যদি তাতে তোমার এই ছেলেটি বেঁচে ওঠে।"

নলিনাক্ষ বললে—"ভাগ্যের উপর কারোর হাত নেই। আপনি যথেষ্টই করেছেন, আর এর বেলাতেও যথেষ্টই করবেন জানি। যদি ও বাঁচবার হয় তবে আপনার হাতেই বাঁচবে। আমি আর কাউকে দেখাতে চাই না, যা করতে হয় আপনি করুন। তাছাড়া আমার পয়সাই বা কোথায়? আপনি বিনা পয়সায় আমাদের দেখছেন। কিন্তু অন্য ডাক্তার আনলেই সে টাকা চাইবে, কোথা থেকে আমি তা যোগাবো?"

অগত্যা তার চিকিৎসাও আমাকেই করতে হলো। কিন্তু একজনের মাত্র নয়, দেখতে দেখতে আমার রোগীর সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। ছেলেটির পরে বিছানা নিলে একটি মেয়ে, তারপরে নলিনাক্ষ নিজেও।

প্রথমে নলিনাক্ষ নিজের জ্বরকে মোটে গ্রাহ্যই করলে না। বললে, "ও কিছু নয়, আমার বাতিকের জ্বর।" কিন্তু ক্রমশ জ্বর ও মাথার যন্ত্রণা খুব যখন বেড়ে গেল তখন বাধ্য হয়ে তাকে বিছানায় শুতে হলো। হেসে বললে—"যতই কষ্ট দিক, এ জ্বরে আমার কিছু করতে পারবে না।"

নলিনাক্ষের শাশুড়ী আবার তখন এসে পড়লেন। আমার উপর তাঁর বোধ হয় বরাবরই একটা বিদ্বেষ ছিল। তিনি বললেন যে তিনি আর আমার ভরসায় ওদের রাখবেন না, বড়ো ডাক্তার এনে দেখাবেন।

নলিনাক্ষ কিছুতেই রাজী হয় না। সে বলে, "আমার ছেলেকে যিনি চিকিৎসা করেছেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে

দেখাবো না।" কিন্তু আমি বললাম, "তাই হবে, আমি তো থাকবই, উনি আর যাকে আনতে চান আনুন, আমরা একসঙ্গেই চিকিৎসা করব। তাতে আমার আপত্তি নেই।"

ডাক্তার সেনগুপ্তকে আনা হলো। তিনি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র। এতে আমার নিজের একার দায়িত্ব আর রইল না। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আমি তিনটি রোগীর চিকিৎসা করতে থাকলাম।

কিন্তু নলিনাক্ষের রোগটি ক্রমে ক্রমে আরো প্রবল হয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। একদিন হার্টফেল করে সে আমার চোখের সামনেই মারা গেল। সজ্ঞানে গেল। তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—"যাচ্ছি তাহলে।"

এমন অনায়াসে বললে, যেন কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে। ভয় কিংবা কষ্ট কিছুই তখন নেই। আমি অনেক মৃত্যুই এমন দেখেছি। স্যার উইলিয়ম ওস্‌লারও এই কথায় বলেছেন যে, মরবার সময় ভয় কিংবা কষ্ট কিছুই থাকে না, ওগুলো তখন মুছে যায়। আমরা বাইরের থেকে দেখে মনে করি বটে যে কতই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু যে মরছে তার ওগুলো আগের থেকেই সরে যায়। যাবার সময় মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়। লোকে মৃত্যুকে যতটা যন্ত্রণাদায়ক মনে করে, ততটা বোধ করি সে নয়। অপারেশনের সময় রোগীকে যেমন অসাড় করে নিই, মৃত্যুও বোধ করি মারবার আগে তেমনি কিছু করে।

অতঃপর নলিনাক্ষের ছেলেমেয়ে দুটিকেও রক্ষা করা গেল না। দুই-তিনদিনের আগে পিছে তিনজনেই মারা গেল।

শেষ পর্যন্ত কেবল নলিনাক্ষের স্ত্রী এবং তার একটি মেয়ে রইল বেঁচে। খুবই অসতর্কভাবে থেকেও তাদের কিছু হলো না। নলিনাক্ষের থিওরীটা কেবল তাদের বেলাতেই খেটে গেল দেখলাম। ওদের পরিবারটা নষ্ট হয়ে গেল। নলিনাক্ষের শাশুড়ি তাঁর মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এ বাড়ি পরে বিক্রি হয়ে গেল।

কিন্তু এখনকার দিনে হলে কি তাই হতো? ঐ চণ্ডীও হয়তো মারা যেতো না; সুতরাং তার বাবা আর ভাইবোনেরাও যেতো না। এখন টাইফয়েডের বিরুদ্ধে অব্যর্থ ওষুধ আছে। কাজেই এই টাইফয়েড রোগকে এখন আর আমরা কেউ গ্রাহ্যই করি না, সাধারণেও এর নাম শুনে এখন তেমন ভয় পায় না। সবাই জানে যে এর উৎকৃষ্ট রকমের ওষুধ রয়েছে,

চিন্তার কোনো কারণ নেই। আগেকার দিনের মতো অমন মহামারী ব্যাপার এ রোগে আর হতে পারবে না।

শুধু টাইফয়েডের কথাই বা বলি কেন! আরো কত মারাত্মক রোগের এমনি অব্যর্থ সব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, মাত্র বিশ বছর আগেও যার সম্বন্ধে কোনো কল্পনাই করা যায় নি। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে হয়েছে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন। নানারকম রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে আবিষ্কৃত হয়েছে পেনিসিলিন, টেরামাইসিন, অরিওমাইসিন, আরো কত কি। শুধু কি তাই? কত অসাধ্য রকমের চিকিৎসাও এখন সাধ্য হয়ে এসেছে। এখন ব্রেণের মধ্যে, এমন কি হার্টের মধ্যেও অপারেশন করা যায়। হার্টের মধ্যে অপারেশন করে থ্রম্বোসিস রোগ আরোগ্য হচ্ছে। রোগীর দেহকে বরফের মধ্যে ঠাণ্ডা করে রেখে শরীরের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে তবুও তাকে বাঁচিয়ে রেখে আট-দশ ঘণ্টা পর্যন্ত সুদীর্ঘ অপারেশন চালানো যায়। শুধু তাই নয়, রক্তহীনকে রক্ত দেবার জন্যে যেমন ব্লাড্‌ব্যাঙ্ক হয়েছে, তেমনি চোখের ব্যাঙ্ক, হাড়ের ব্যাঙ্ক, নার্ভ ও আর্টারির ব্যাঙ্ক, চামড়ার ব্যাঙ্কও তৈরি হচ্ছে। সদ্য মৃত ব্যক্তির ঐ সব অংশ নিয়ে, এমনভাবে রাখা হয় যাতে ছয় মাস বা এক বছরেও তা নষ্ট হয় না, প্রয়োজন হলে রোগীর শরীরে তা জুড়ে দেওয়া হয়, রোগী তখন তার বিনষ্ট অঙ্গ ফিরে পায়।

চিকিৎসা বিদ্যার ভবিষ্যৎ যে খুবই উজ্জ্বল তাতে সন্দেহ নেই। এখনও আমরা যে সব রোগকে সারাতে পারি না, কিছুকাল পরে তাও নিশ্চয় অনায়াসে সারানো যাবে।

কিন্তু এই সব ব্যাপার থেকে কি একটা জিনিস আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি না? একটু ভেবে দেখলেই স্বীকার না করে উপায় নেই যে মানুষের এই দেহযন্ত্র কোনো এক নিপুণ কারিগরের হাতের তৈরি। তাঁর চেতনার মধ্যে সকল রোগেরই চিকিৎসা আর সকল সমস্যারই সমাধান লুকোনো রয়েছে নিশ্চয়, আমরা আজ পর্যন্ত তার সামান্য মাত্রই জানতে পেরেছি। হঠাৎ এক-একটা জিনিস আমাদের নতুন করে জানা হয়ে যাচ্ছে,—যখন যেটি জানবার সময় উপস্থিত হচ্ছে, তার আগে নয়। ওর কোনোটাই আমরা নিজেরা আবিষ্কার করছি না, সবই আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। এমনি করে ক্রমশ সবই আমরা জানতে পারব, কিন্তু তা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী নয়। আর এ কথাও মনে করা আমাদের ভুল যে অমুক বা তমুক রোগটি একেবারে দুরারোগ্য। দৃষ্টি যখন আমাদের সবটা খুলে দেওয়া হবে তখন কোনো কিছুই দুরারোগ্য থাকবে না।

॥ আঠারো ॥

ডাক্তারি পাস করার আগে থেকেই অমলেন্দু আমার প্রতিবেশী বন্ধু। পাড়াতে কলেজের ছাত্রেরা ও শিক্ষিত যুবকেরা মিলে এক ডিবেটিং ক্লাব করেছিল, সেখানে প্রবন্ধাদি পড়া হতো, তাই নিয়ে বাদ প্রতিবাদ ও বক্তৃতাদিও করা হতো। অমলেন্দু ছিল বিদ্বান ছেলে, সে খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারতো। ইংরেজী সাহিত্যে সে এম. এ পাশ করেছিল।

অমলেন্দু কলকাতার বনেদী ঘরের ছেলে। অবস্থা ভালোই, যদিও তাকে খুব ভালো বলা যায় না। আগেকার কালে হয়তো আরো ভালোই ছিল। অবস্থার আরো উন্নতি করবার দিকে তার বরাবরই খুব ঝোঁক ছিল।

এম এ পাস করবার পরে সে কিছুকাল প্রফেসরি করলে। তাতে উপার্জন খুব কম হয় দেখে সে আইন পড়তে শুরু করলে। আইন পাস করবার পরে ওকালতি শুরু করলে। ওকালতিতে বহুদিন ধৈর্য ধরে থাকলে তবে অর্থাগম হতে শুরু হয়, কিন্তু অমলেন্দুর অত ধৈর্য ছিল না। বছর দুয়েক ওকালতির চেষ্টা করেই হতাশ হয়ে ও সে কাজ ছেড়ে দিলে। আর ওকালতি করতে যে বিশেষ চাতুর্য থাকা দরকার তাও ওর ছিল না।

তখন ওর ঝোঁক হলো ব্যবসা করবে। ও বললে যে মূর্খ লোকেরাও ব্যবসা করে বড়লোক হয়, তাদের পেটে কোনো বিদ্যা না থাকলেও। কিন্তু যারা বিদ্যা শিখেছে তারা যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমে বিদ্যাকে সেই কাজে লাগায়, তাহলে তাতে আরো বেশি সাফল্য মিলতে পারে। এই বলে সে নিজের বিষয়সম্পত্তি বেচে যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করলে। তার পর ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে এক মস্ত ব্যবসার প্রতিষ্ঠান ফেঁদে বসল।

ব্যবসাটি হলো ইউরোপ থেকে রকমারি জিনিসপত্র আমদানি করা এবং বড়ো বড়ো অফিসে অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করা। এ কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারলে লাভ আছে। আর একটু হুঁশিয়ার থাকলে লোকসানের কোনো ভয় নেই। যত বেশি খরিদ্দার বাড়বে, কেনাবেচা বাড়বে, ততই বেশি লাভ।

অমলেন্দুর বিদ্যাবুদ্ধি, অমায়িকতা, সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রতার গুণে ব্যবসা খুব ভালো ভাবেই চলল। সকলেই ওর ব্যবহারে সন্তুষ্ট, কারণ ওর এক মস্ত গুণ, ও কখনো কথার খেলাপ করে না। কাজেই ওর ব্যবসা দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠল, ছোটো অফিস বড়ো হয়ে উঠল। সেখানে অনেক কর্মচারী,

অনেক লোকজন খাটতে লাগল। তখন ওর কাছে অনেক দালাল ও চাটুকার নিত্য আনাগোনা করতে থাকল। ক্রমে ওর বিলাস বাড়ল, দু-তিনটে গাড়ি হলো, স্ত্রীর গায়ে অনেক গহনা হলো, বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফিরে গেল। সেখানে গেলেই মনে হতো ধনী লোকের বাড়িতে এসেছি। সকলেই বলাবলি করতো, বিদ্বান বাঙালী ব্যবসায়ে নামলে এমন তো হবারই কথা। আমরা ভাবতাম, অমলেন্দু একটা আদর্শ দেখিয়ে দিলে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের ওকে অনুসরণ করা উচিত। এতটা সুনাম হলেও ওর মনে কোনো গর্ব ছিল না, আমাদের সঙ্গে দেখা হলে আগেকার মতো তেমনি অমায়িক হেসে আলাপ করতো, তেমনি করেই সকলের সঙ্গে মিশতো।

কিন্তু একটা জায়গাতে ওর গলদ ছিল। যাকে বলে ব্যবসাদারী চাতুর্য ও সতর্কবুদ্ধি, সে জিনিসটা ওর একেবারেই ছিল না। সরল বুদ্ধি নিয়ে ও সকলের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার করতো আর সকলকেই বিশ্বাস করতো। তাতে যে ক্ষতি হতে পারে এ ধারণা ওর ছিল না। কয়েক বছর সব দিক থেকে ভালোই চলল। তার পর কেউ কেউ, এমন কি নিকট আত্মীয়েরা ওকে ঠকাতে শুরু করলে, ফাঁকি দিতে শুরু করলে। কেউ বা এক-একটা মিথ্যা নামে প্রচুর মাল ধারে খরিদ করতে শুরু করলে। এ ফাঁকি ও ধরতেই পারলে না। সকলের উপরেই ওর অটুট বিশ্বাস।

ক্রমশ মূলধন যখন প্রায় ফাঁক হয়ে এসেছে, তখন একদিন সব ধরা পড়ল। দেখা গেল যে বাজারে ওর ধারের পরিমাণ অনেক বেশি, পাওনার পরিমাণ অনেক কম। যে সব নামে অনেক পাওনা রয়েছে বলে জানা ছিল, সেই সব নামের কোনো অফিসই নেই। কোনো অস্তিত্বই নেই।

অমলেন্দু তখন চিন্তায় পড়ল। তাকে সাবধান হতে হলো, ব্যয় সংক্ষেপ করতে হলো। কিন্তু তবুও দেনা অনেক বেশি, সে দেনা মেটাতে না পারায় বাজারে তার দুর্নাম হতে শুরু হলো। তখন স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে সে কিছু কিছু দেনা মেটালে বটে, কিন্তু তবুও বিস্তর দেনা রয়ে গেল। মালের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল, বাজারেও কেউ আর তাকে ধারে মাল দিতে চায় না।

এমনি যখন অবস্থা তখন নিজেকে দুর্ভাবনা ও মনোকষ্ট থেকে রেহাই দিতে গিয়ে অমলেন্দু এক মারাত্মক ভুল কাজ করে বসল। কিন্তু সে কথা গোড়া থেকে বলি।

উন্নতির সময়ে বিলাতী কোম্পানির ম্যানেজার ও বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের সঙ্গে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখবার জন্যে মাঝে মাঝে ওকে

হোটেলে ডিনার দিতে হতো। ডিনারে পান ভোজনাদি সবই চলত। সেখান থেকেই বোধ হয় ও একটু একটু মদ খেতে শুরু করে। কিন্তু তখন সেটা হতো কালেভদ্রে। এখন মনটাকে একটু চাঙ্গা করবার জন্যে সে বাড়িতেই কিছু কিছু মদ্যপান শুরু করল। তাতেই ক্রমশ সে আবিষ্কার করল এ খুব উপকারী জিনিস, এতে মনকে স্ফূর্তি দেয় তো বটেই, তাছাড়া রাত্রে ঘুমটিও চমৎকার হয়। ইদানিং ও অনিদ্রাতে কষ্ট পাচ্ছিল, মনে দুর্ভাবনা নিয়ে সারা রাত জেগে কাটাতে হতো। কিন্তু মদ খেয়ে শুলে সেই কষ্ট থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তাই প্রতি রাত্রেই সে নিয়মিত মদ্যপান শুরু করে দিলে। বলা বাহুল্য নিদ্রা বাড়াবার জন্যে মাত্রাও ক্রমশ বাড়তে থাকল। কাল যেটুকু খেয়ে তেমন ভালো ঘুম হয় নি, আজ তার চেয়ে একটু বেশি খেলে নিশ্চয় তার চেয়ে ভালো ঘুম হবে। এমনি করে প্রথমে একটু থেকে পরে পানের মাত্রা অনেকটাই বেড়ে গেল।

অমলেন্দুর স্ত্রী সবই দেখতে পাচ্ছিল। সে খুবই পতিপরায়ণা। স্বামীর যাতে ঋণমুক্তি হয় সেজন্যে সে অম্লানবদনে নিজের গায়ের গহনাগুলি খুলে দিয়েছিল, একটুও প্রতিবাদ করে নি। সে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, কিন্তু তবুও সে সরলবুদ্ধি নারী। মদে যে কতখানি অনিষ্ট হতে পারে সে তার কিছুই জানে না। তবুও সে কয়েকবার নিষেধ করেছিল, বলেছিল—রোজ রোজ ওটা খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু অমলেন্দু বুঝিয়ে দিলে যে ওটা সে ওষুধের মতো খাচ্ছে। ওতে তার উপকার হচ্ছে। প্রত্যহ শোবার আগে খেলে তার বেশ ঘুম হয়, যেদিন খাওয়া বাদ যাবে সেদিন সারারাত ঘুম হবে না। ওর স্ত্রীও প্রকৃতই তাই দেখলে যে স্বামী সমস্ত দিনটা বিমর্ষ হয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়, দুর্ভাবনা সর্বদা লেগেই থাকে, কেবল রাত্রে ওটা খাওয়ার পর থেকে কিছুকালের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে। তাই দেখে সে আর ও বিষয়ে কোনো আপত্তি করলে না। মনে করলে এটুকু ওর নির্দোষ বিলাস, এটুকুও বন্ধ করে দিলে ও দুঃখ দুর্ভাবনার সঙ্গে লড়তে পারবে কেন? যদিও এটা নেশার জিনিস, কিন্তু ওর পক্ষে এটা এখন উপকারী। এমনিভাবে কোনো বাধা না পেয়ে মদ্যপানের মাত্রা খুবই বেড়ে গেল, একদিনের জন্যেও তা বাদ যেতো না।

কিন্তু এত সব ভিতরের কথা আমি কিছুই জানি না। অমলেন্দু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, খুবই মিশুক, এমনিই মাঝে মাঝে ডাক্তারখানায় আসে গল্প করতে। একদিন এমনিই এসে মুখখানা গম্ভীর করে আমাকে তার পেটের

বাঁ দিকটা দেখিয়ে বললে—"ওহে, দেখতো আমার লিভারটা, বিগড়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।—"পেটের ঐদিকে বুঝি লিভার থাকে ? কে বললে তোমার লিভার বিগড়েছে ?"

সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—"তা জানি না ভাই, কোন দিকে লিভার। কিন্তু বাঁ দিকটাই ক'দিন ব্যথা করছে। অত্যাচার তো যথেষ্টই হয়।"

আমি বললাম—"তাহলে অত্যাচারগুলো বন্ধ করে দাও, আপনিই সেরে যাবে। কি অত্যাচার হচ্ছে ?"

"এই খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার, আর কি হবে।"

"তবে একটু তার সংশোধন করে নাও। আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি খাও।"

সেদিন এই পর্যন্তই জানলাম। কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, সত্যই যা খায় তা হজম হয় না। অক্ষুধা, অস্থিরতা, দিনের বেলা মাথাধরা, সর্বত্র চুলকানি, গায়ের বর্ণ ঘোলাটে হওয়া, চোখের কোলে হল্‌দে ভাব।

আমার তখন ওর বাড়িতেই ডাক পড়ল। আমি লিভারের চিকিৎসা শুরু করলাম, তেল ঘিয়ের জিনিস খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এমিটিন প্রভৃতি কয়েকটা ইন্‌জেকশনও দিলাম। কিন্তু মাস দুয়েক চিকিৎসা করেও রোগের কিছুই উপশম হলো না, বরং আরো বাড়ের দিকেই চলল। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তবে এ কোন রোগ !

মদ্যপানের কথা তখনও আমি ঘুণাক্ষরেও জানি না। অমলেন্দুর মতো সচ্চরিত্র বিদ্বান ও আদর্শপ্রিয় মানুষ যে ও কাজ করতে পারে, তা আমার কল্পনাতেও আসে নি। কাজেই আমি ঐ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও করি নি, ভেবে নিয়েছি যে কোনো প্রদাহের কারণে লিভারের দোষ হয়েছে। কিন্তু যখন চিকিৎসায় কিছু ফল হতে দেখা গেল না তখন আমি চিন্তিত হয়ে উঠলাম।

একদিন ওর স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "খাওয়া-দাওয়ার দিক দিয়ে কোনো অনিয়ম বা অত্যাচার সত্যই কিছু হচ্ছে না তো ?"

সে বললে, "আমি নিজের হাতে ওর পথ্যাদি রান্না করি, আপনি যেমন যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি ভাবেই খেতে দেওয়া হয়। অত্যাচার কেমন করে হবে ?"

কথাটা খুবই ঠিক। আশ্চর্য ঐ মেয়েটির সেবানৈপুণ্য আর আশ্চর্য তার পথ্যাদি প্রস্তুতের দক্ষতা। বিনা তেলে বিনা ঘিয়ে সে এমন কিছু উপায়ে মাছ তরকারি প্রভৃতি রান্না করে যা তবুও খেতে মুখরোচক হয়। একদিন

অমলেন্দুর বড়া ভাজা খাবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। ওর স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কড়াইতে একটু ওলিভ অয়েল মাখিয়ে নিয়ে তাতে পলতার বড়া ভেজে দেওয়া যেতে পারে কিনা। আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম। সেই বড়া খেয়ে ওর খুবই তৃপ্তি হয়েছিল। সুতরাং খাবার বিষয়ে অত্যাচার ওখানে সম্ভব নয়।

আমি খুব চিন্তিত হয়ে বললাম—"তবে কেন রোগটা কিছুতে সারছে না?"

অমলেন্দুর স্ত্রী বললে—"একটিমাত্র দোষ অবশ্য ওঁর আছে, কিন্তু সে কথা আপনাকে বলতে উনি বারণ করে দিয়েছেন।"

"কিন্তু ডাক্তারকে সকল কথাই বলা দরকার, নইলে রোগ সারে না।"

তখন অনেক ইতস্তত করে ওর স্ত্রী আমাকে সকল কথা বললে। আমি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমারই দোষ, ডাক্তার হিসাবে আমার ঐ সম্বন্ধে আগেই বিশেষ করে খবর নেওয়া উচিত ছিল।

আমি ওর স্ত্রীকে বুঝিয়ে বললাম যে মদেই ওর সর্বনাশ করেছে, ওটি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। সে বললে, "তা অসম্ভব, তাহলে রাত্রে ওর ঘুম হবে না।" আমি বললাম, "সেজন্য আমি ঘুমের ওষুধ দেব।"

কিন্তু ওর স্ত্রীকে বলে কোনো লাভ নেই, আমি অমলেন্দুকে খুব কড়া করে নিষেধ করে দিলাম যে এক বিন্দুও মদ তার স্পর্শ পর্যন্ত করা চলবে না, যদি সে বাঁচতে চায়। চুপ করে মুখ বুজে সে আমার সমস্ত কথাগুলি শুনলে, একটও প্রতিবাদ করলে না। কেবল বললে, "রাত্রে যাতে আমার ঘুম হয় সে ব্যবস্থা তুমি করে দিও।"

ঘুমের ওষুধ দিলাম। দিন কয়েক রাত্রে মদের পরিবর্তে তাই সে খেতে লাগল। কিন্তু মদের নেশার যে চাহিদা, ঘুমের ওষুধে তা মিটবে কেন। সেই ওষুধ ডবল মাত্রায় খাওয়া সত্ত্বেও কয়েক রাত্রি সে না ঘুমিয়ে ছটফট করে বেড়ালে। তারপর আবার মদ খেতে শুরু করে দিলে। আমার নিষেধও তখন মানলে না।

তখন আবার তার স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে পরামর্শ করতে থাকলাম, কেমন করে ওর এই বদ অভ্যাস বন্ধ করা যায়। পরামর্শ করে স্থির হলো যে ওকে দূরে কোথাও চেঞ্জে পাঠানো যাক। সেখানে ঐ জিনিস মিলবে না, তাতে অভ্যাসটি ছেড়ে যেতে পারে।

তোড়জোড় করে ওকে নৈনিতাল পাহাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কথা রইল যে অন্তত দুটি মাস সেখানে থেকে আসবে। সেখান থেকে খবর পেলাম

যে একটু ভালোই আছে, খিদে বেড়েছে, দেহে একটু স্ফূর্তি পেয়েছে। কিন্তু অমলেন্দু সেখানে কুড়ি দিন মাত্র থেকেই পালিয়ে এলো। সেখানে রইল না সম্ভবত একই কারণে, মদ্যপানের অসুবিধা। কিন্তু সে বললে, সেখানে তার জ্বর হচ্ছিল, তাই আর থাকতে ভালো লাগল না।

ফিরে আসার পর থেকে রোগটা অল্পদিনেই বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল। তখন বাস্তবিকই জ্বর হতে শুরু করল। ব্যাপার সুবিধা নয় বুঝে ডাক্তার সরকার ও ডাক্তার রায়কে ডেকে আনা হলো। তাঁরা বললেন, রীতিমত সিরোসিস্ ধরে গেছে। আমারও তাই আশঙ্কা হচ্ছিল।

তখন আরো গুরুতরভাবে চিকিৎসার কাজ শুরু হলো। শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারদের নির্দেশ অনুসারে আমি সব কিছু করতে থাকলাম।

সুদীর্ঘ ব্যাধি, তার সুদীর্ঘ চিকিৎসার ব্যাপার! দিনের মধ্যে বহু বারই আমাকে সেখানে যেতে হতো, বহুক্ষণ পর্যন্ত থাকতে হতো। অন্যান্য প্র্যাকটিস আমাকে প্রায় ছেড়েই দিতে হলো, কারণ বেশির ভাগ সময় আমাকে ওখানেই কাটাতে হয়। চাকরিটা কোনোগতিকে করতেই হতো, নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যেতাম, তাড়াতাড়ি সেখানকার কাজ শেষ করে চলে আসতাম।

চিকিৎসা যতদূর পর্যন্ত হবার তার সব কিছুই হতে থাকল, কিন্তু তবু রোগের কিছু উপশম দেখা গেল না। তার কারণ এই যে লিভারে সিরোসিসের অবস্থা দাঁড়িয়ে গেলে তাকে আর বদলানো যায় না। কিন্তু আরো কারণ এই যে মদ খাওয়াটি ওকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছিল না। যখন আমি অত্যন্ত কড়া হয়ে বললাম, যে ওটি একেবারে বন্ধ না করলে আমি চিকিৎসাই করতে আসবো না, তখন ও আমার হাতে পায়ে ধরতে লাগল, কান্নাকাটি করতে লাগল। বললে, দুই আউন্স করে অন্তত না দিলে ও মরে যাবে, তার চেয়ে কোনো বিষ দিয়ে ওকে মেরে ফেলা হোক। এমন কথা বললে আর উপায় কি। আমি বললাম, আচ্ছা বেশ, কিন্তু ওর স্ত্রীর আলমারিতে বোতল চাবি বন্ধ করা থাকবে, সে নিজের হাতে ওকে ঠিক ঐটুকু মাত্র ঢেলে দেবে। তাতেই ও রাজী হলো। তখন আরো একরকম ফন্দি করলাম। ওর স্ত্রীকে শিখিয়ে দিলাম যে বোতলের অর্ধেক মাল অন্যত্র ঢেলে রেখে জল ঢেলে সেটা ভরিয়ে রাখবে, তাই থেকে দুই আউন্স করে ঢেলে দেবে। এতে প্রকৃতপক্ষে ওর এক আউন্সের বেশি খাওয়া হবে না।

কিছুদিন এমনিই চলল। কিন্তু ঐটুকুতে ওর কিছুই হয় না। আর যারা

নেশাখোর হয় তারা সহজেই ফাঁকি বুঝতে পারে। ও তাই বুঝতে পেরে কুটিল বুদ্ধিতে আমাদের উপরেও টেক্কা দিলে।

অমলেন্দুর একটি পেয়ারের খানসামা ছিল। তাকে ও প্রত্যহ একটি করে টাকা বকশিস দিয়ে আলাদা মদ আনিয়ে তার দ্বারাই বাথরুমের কুলুঙ্গির মধ্যে রাখিয়ে দিত। রাত্রে শোবার আগে যখন স্ত্রীর মেপে দেওয়া মদটুকু খেয়ে ও একবার বাথরুমে যেতো, তখন সেখান থেকে আবার এক দফা খানিকটা খেয়ে আসতো। কিছুদিন পরে ওর স্ত্রী এই চালাকিটুকু ধরে ফেললে। চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু যে লোক অত্যাচার করবেই করবে, তাকে কোন দিক দিয়েই বা সামলানো যাবে। সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকতে পারে না বলে বিকেলের দিকে ওকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে একটু বেড়াবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। একদিন সেই পথ দিয়ে আসতে গিয়ে দেখি, অমলেন্দু তার বাড়ির সামনের এক রেস্তোরাঁ থেকে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসছে। তখনই ধরলাম তাকে। কৈফিয়ৎ চাইতে সে নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে বললে, "বাড়িতে সিদ্ধ জিনিস খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে, তাই আজ একটা কাট্‌লেট খেয়ে দেখলাম। বেশ লাগলো খেতে।" ওর বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

তারপর একদিন ওকে দেখতে গেছি, আমার হাতে ছিল একখানা ডাক্তারি বই, ওস্‌লারের মেডিসিন। বইখানার দিকে নজর যেতেই অমলেন্দু জিজ্ঞাসা করলে—"অত বড়ো কি বই ওটা ?"

আমি বললাম—"মেডিসিনের বই, কেবল রোগের কথা।"

"বইখানা দুদিনের জন্যে আমায় পড়তে দেবে ?"

"এ-সব টেক্‌নিক্যাল জিনিস, পড়ে কিছু বুঝবে না।"

"আমি কি এতই মুখ্‌খু যে তোমাদের বই পড়ে কিছু বুঝতেই পারবো না ? তা হোক, না বুঝেই পড়বো। তবু তো খানিকটা সময় কাটবে। যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে দুদিনের জন্যে বইখানা আমার কাছে রেখে যাও।"

আমি তখন কিছু বুঝতে পারি নি, এ বই কেন ও পড়তে চাইছে। রেখে এলাম বইটা ওর কাছে। ভাবলাম যে এমনিই শখ হয়েছে, পড়ে দেখুক। তবু এই নিয়ে ওর সময় কাটবে।

দিন কয়েক পরে ও হাসতে হাসতে বইটা আমাকে ফেরত দিলে। বললে,

"নাও তোমার বই, আমি সবই পড়ে দেখলাম। সবই যখন জানো, তখন মদটুকু আমার বন্ধ করে দিয়ে কি লাভ হচ্ছে তোমার ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে তুমি তো জানতেই পারছো যে এ রোগ কিছুতে সারবার নয়"—এই বলে সিরোসিস্ সম্পর্কে অধ্যায়টি খুলে সে আমাকে দেখিয়ে দিলে, যেখানে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে এ রোগটি দাঁড়িয়ে গেলে আরোগ্য অসাধ্য।

আমি দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে উঠলাম। এইজন্যেই বইখানি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, এ রোগের শেষ পরিণাম কি হতে পারে তাই জানতে। এখন সে কথা ও স্পষ্টই জানতে পেরেছে, আর কোনো স্তোকবাক্য দিয়ে লুকিয়ে রাখা চলবে না। তবুও আমি চোখে মুখে যথাসাধ্য একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে বললাম, "ও, বইতে যা লিখেছে তা নিতান্তই সাধারণ ভাবে বলা। সাধারণত এ রোগ হলে সারানো খুব কঠিন। কিন্তু রীতিমত ভাবে চেষ্টা করলেও যে কাউকেই সারানো যাবে না, এমন কথা নয়। আমি তো কত এমন সারতে দেখেছি।"

"আমার কাছে কেন চালাকি করছ, তোমাদের ওস্লার মিছে কথা কিংবা বাজে কথা লেখেন না।"

"তাহলে ঐ কথাটি লেখা আছে বলে কি চিকিৎসা ছেড়ে দিতে হবে ?"

"কি হবে আর চেষ্টা করে ? আমাকে যেতে দেওয়াই তো ভালো।"

"এবার তুমিই বাজে কথা বলছ। ওই কি একটা কথা হলো ?"

"কিন্তু তুমি তো জানো, বেঁচে আমার বিশেষ কোনো লাভ নেই।"

"লাভ আছে বৈকি, তুমি থাকলে তোমার স্ত্রী-পুত্রদের খুবই লাভ। তোমার স্ত্রী রয়েছে, ছোটো ছোটো ছেলেরা রয়েছে, তুমি গেলে তাদের কে দেখবে ?"

"তা ঠিক, ওদের জন্যেই তো আমার মরতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু আমার দিকটাও একবার ভেবে দেখ। বেঁচে যদিও থাকি, আমার সম্বন্ধে আর কোনোই আশা নেই। যা কিছুই করতে যাবো, চারিদিক থেকে সবাই আমাকে ঠকাবে। আমার মতো বোকা লোকের এখানে স্থান নেই। এখানে টিঁকে থাকতে হলে আমার পক্ষে ভোল পাল্টে আসা দরকার, কাঠামো বদলে আসা দরকার।"

এ কথার কি বা জবাব দিতে পারি ? তখন অন্য রকম ভাবে বললাম, "ভবিষ্যতে তোমার কি হবে আর না-হবে তা কে বলতে পারে ? ও সব কথা

আমার ভাববার নয়। আমার কাজ তোমাকে সারিয়ে তোলা। সেই চেষ্টা আমাকে করতে দাও।"

অমলেন্দু বললে, "মদ খাওয়া যদি আমি একেবারেই ছেড়ে দিই, তাহলে আমাকে সারিয়ে তুলতে পারবে, এই তুমি আশা করো?"

"নিশ্চয় আশা করি, অন্তত চেষ্টার কতকটা সাফল্য নিশ্চয়ই মেলে।"

"আচ্ছা বেশ, তোমার কাছে আমি কথা দিচ্ছি, আজ থেকে আর একবিন্দুও মদ খাবো না। দেখ তুমি চেষ্টা করে কি করতে পারো।"

সত্যই সেই দিন থেকে সে মদ খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করল।

কিন্তু তখন অনেক বেশি বিলম্ব হয়ে গেছে। রোগটি দস্তুরমত জাঁকিয়ে দখল নিয়েছে। তখন মদ খাওয়া বা না-খাওয়া দুইই সমান।

এর পর কতদিন হঠাৎ গিয়ে দেখেছি অমলেন্দু চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে মনে করে আমি ওর খাটের কাছে দাঁড়িয়ে ওর স্ত্রীকে নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করেছি—"কতক্ষণ ঘুমোচ্ছে?" তখনই ও চোখ মেলে চেয়েছে। বলেছে, "ঘুমোই নি ভাই, চোখ বুজে পড়ে আছি।" এই বলে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে থাকে। তাই দেখে আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করি—"চেয়ে চেয়ে অত কি দেখছ?" সে হেসে জবাব দেয়—"দেখছি তোমাকেই, তোমার চমৎকার স্বাস্থ্যটি।" একটু হেসে আমি বলি—"তোমারও তো এককালে এমন স্বাস্থ্য ছিল, নিজেই নষ্ট করেছ। সেরে উঠলে আবার তোমারও এমনি স্বাস্থ্য হবে।" সে একটু হেসে বলেছে—"তোমাদের ওস্‌লার সাহেব তাই বলেন নাকি?" আমি চুপ করে থাকি, এর কোনো জবাব দিতে পারি না।—সে বুঝে নিয়েছে, তার কোনো আশা নেই।

রোগের সমস্ত কুফলগুলি পরে একে একে আত্মপ্রকাশ করতে থাকল, আর ক্রমশই তার উপসর্গগুলি বেড়ে বেড়ে চলল। একটা সামলাতে না সামলাতে আর একটা দেখা দেয়, সেটিও সামলাতে সামলাতে আবার অন্য একটি নতুন কিছু দেখা দেয়।

পেটের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল জমতে শুরু করল, যাকে বলে উদরী। পেট ফুটো করে সেই জল বের করে দেওয়া হয়, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আবার তেমনি ভরাট হয়ে জমে ওঠে। আবার তাকে বের করে দিতে হয়।

গায়ে স্থানে স্থানে ফুলে উঠে ঘা হতে লাগল। কম্‌প্রেস দিয়ে ওষুধ দিয়ে সেগুলিকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রাখা হলো।

মূত্রত্যাগ বন্ধ হয়ে গেল। কিডনিতে মূত্রই তৈরি হচ্ছে না, তা বেরোবে কি? মূত্র বাড়াবার জন্যে নানারকম ইনজেকশন দেওয়া চলল।

তারপর কিডনির এই বিকৃতি থেকে মাঝে মাঝে গভীর কোমার অবস্থা এসে পড়তে থাকল। তখন সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে, কোনোরকম সাড়া নেই, শব্দ নেই। তখন ওর দেহের শিরা থেকে খুব খানিকটা রক্ত টেনে বের করে দিতে হয় এবং তার বদলে গ্লুকোজ ঢুকিয়ে দিতে হয়। তখন আবার তার জ্ঞান ফিরে আসে।

আর শরীরে ওর দিবারাত্র নানা রকমের অসহ্য কষ্ট। রাত্রে ঘুম নেই, দেহে এক মুহূর্তও স্বস্তি নেই। সর্বদাই কাতরাচ্ছে।

কিন্তু যতই বেশি ওর অসহ্য কষ্ট, ততই বেশি ওর স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা। সে যেন ওর কষ্টের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে কোমর বেঁধে নেমেছে। কোনোমতেই ওকে কোনোরকম কষ্ট পেতে দেবে না। যখন যে কষ্টটি দেখা দিচ্ছে তখনই সেটিকে দূর করবার জন্যে সে তার প্রাণপণ করছে। দিনে রাত্রে তার একটুও বিশ্রাম নেই, তবু কিছুমাত্র ক্লান্তি নেই। হাসিমুখে সমস্তই করে চলেছে। রাত্রে তারও ঘুম নেই। অনেক দিন স্নান করা প্রভৃতিও হয় না। খাবার সময় রোগীর পাশে বসেই কিছু খেয়ে নেয়। তখনও হঠাৎ কিছুর প্রয়োজন হলে খেতে খেতেই তাকে উঠে পড়তে হয়।

নার্স রাখার কথা অনেকবারই আমি বলেছিলাম। কিন্তু ওর স্ত্রী কোনোমতেই তাতে রাজী হয় নি। আমি বলেছিলাম, নার্সের জন্যে বেশি কিছু খরচ লাগবে না, অন্তত পক্ষে রাত্রিটুকুর জন্যে একজন কোনো নার্স রাখলে সামান্য খরচেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ওর স্ত্রী বললে, "খরচের জন্যে নয়। আপনি দেখছেন তো ঐ মানুষটিকে, আমাকে ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোককে উনি সহ্যই করতে পারেন না। এমন কি কোনো নিকট আত্মীয়া এসে একটু মাথায় হাত বুলোতে গেলে উনি অস্থির হয়ে ওঠেন। আমি ছাড়া কাউকে বিছানাটা পর্যন্ত ছুঁতে দিতে চান না। এতেও যদি জোর করে কোনো নার্সকে ওঁর কাছে রাখি, তাহলে উনি এমনি আড়ষ্ট হয়ে থাকবেন যে তাতে যেটুকু বা আরাম এখন পাচ্ছেন তাও আর পাবেন না।"

আমি দেখলাম, সত্যই তাই। সকল সময়ে ওর স্ত্রীকেই কাছে চাই। যতক্ষণ স্ত্রী কাছে বসে আছে ততক্ষণ ও চুপ করে চোখ বুজে থাকে। যদি কোনো কারণে কাছ থেকে ওর স্ত্রীর উঠে যাবার দরকার হয়, তখনই ও ছটফট করতে শুরু করে। বেশি কথা বলতে পারে না, ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে

চেয়ে খুঁজতে থাকে। একটু বিলম্ব হলেই তখন অবুঝ হয়ে চেঁচাতে শুরু করে। ইদানিং সে ভারি খিট্‌খিটে হয়ে পড়ল। সর্বক্ষণ সেবা করতে থাকলেও স্ত্রীকে সামান্য কারণে খিঁচিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে। কোথায় গেল অমলেন্দুর সেই অমায়িকতা। স্ত্রীর প্রতি সে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার শুরু করে দিলে। সর্বদাই রেগে উঠছে। অথচ স্ত্রীকে এক মুহূর্তও ছাড়তে চায় না। তারও যে একটু বিশ্রাম দরকার সে বিবেচনাই আর নেই।

এমনিই চলল দীর্ঘ তিন মাস ধরে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও মনোকষ্টে অমলেন্দুর স্ত্রীর স্বাস্থ্যটি একেবারে ভেঙে পড়ল। তার পেটের মধ্যে একটা প্রদাহ জন্মালো, প্রত্যহ জ্বর হতে থাকল, আর হার্টটিও দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন তারই রীতিমতো চিকিৎসার প্রয়োজন হলো। কিন্তু চিকিৎসাও চলতে থাকল, আর সে তার পেটের ব্যথা ও জ্বর নিয়ে আগের মতোই রোগীর সেবা করতে থাকল। কিন্তু রোগী সে কথা জানতেও পারলে না। জানবার মতো তার অবস্থাও নয়। যখন পেটে খুব বেশি যন্ত্রণা হতো তখন ওর স্ত্রী ওর পাশেই বিছানার উপর শুয়ে পড়ত। অমলেন্দু মনে করত, হয়তো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রয়োজন হলেই তাকে ঠেলে তুলতো।

ইদানিং প্রত্যহ বহুবার করেই আমাকে ওদের বাড়ি যেতে হচ্ছিল। এমন কি রাত্রেও প্রায় বারোটা পর্যন্ত সেখানে থেকে তার পরে আমি বাড়ি ফিরতাম। তার আগে ওরা আমাকে ছাড়তেও চাইত না। নানারকম কথা বলে, গল্প বলে ওদের কতকটা অন্যমনস্ক করে রাখতে পারতাম। দুজনেই অসুস্থ, অন্য লোকজন কিংবা বন্ধুবান্ধব ঘরের দিকে কেউই আসে না। আর রোগের যন্ত্রণা নিয়ে ওদের ঘুম হয় না, সময় কাটতে চায় না। আমি যে কেবল ডাক্তারি করতেই যেতাম তা নয়, বন্ধুর কাজটাও আমাকে করতে হতো। আমি যতক্ষণ থাকতাম ততক্ষণ তবু ওরই মধ্যে ওরা একটু খুশি থাকতো। নিত্য নিরানন্দের মধ্যে তবু একটু বৈচিত্র্য মিলতো।

কিন্তু একদিন রাত্রে বারোটার পরে খেয়েদেয়ে আমি ঘুমিয়েছি, গভীর রাত্রে আবার আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি অমলেন্দুর মলদ্বার দিয়ে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে, রক্তে সমস্ত বিছানা ভিজে গেছে। দেখেই বুঝলাম, এবার শেষ অবস্থা। মুখ আমার অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু তখনই দেখি, অমলেন্দু উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার মুখের ভাব-পরিবর্তন সে লক্ষ্য করছে। তাড়াতাড়ি তাই বললাম—"ও বিশেষ কিছু নয়, এ রোগে মাঝে মাঝে অমন হয়ে থাকে।" রক্ত বন্ধ করবার মতো ওষুধ

দুই তিনটা ইন্‌জেকশন দিয়ে বললাম, এতেই ওটা থেমে যাবে। নিজের মনে কিন্তু নিতান্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। মনটা বড়ই দমে গেল।

পরের দিন সকালে গিয়ে কিন্তু দেখি, রক্তপাত একেবারে বন্ধই হয়ে গেছে। রোগী বেশ সুস্থ আছে, বরং অন্যান্য দিন অপেক্ষা যেন একটু স্ফূর্তিতেই আছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে বললে—"এ ধাক্কাটা বোধ হয় তুমি সামলে দিলে। দেখ, এমনি করে যতদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারো। তাতে তোমারই হাতযশ হবে।" এই বলে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললে—"ডাক্তারকে এক কাপ চা খাইয়ে দাও। বেচারা রাত্রে আমার জন্যে ভালো করে ঘুমোতে পায় নি।" কিন্তু স্ত্রীও যে তখন খুবই অসুস্থ, সে কথা সে জানে না। নিজের রোগের কথা সে ওর কাছে একেবারে চেপে গেছে।

সেদিন একটু নিশ্চিন্ত মন নিয়ে আমি আমার নিজের কাজে গেলাম।

ফিরলাম একটু তাড়াতাড়ি। বরাবর ওদের বাড়িতেই গেলাম। দূর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, কি হলো আবার। মৃত্যুর কথাটা মনে হলো না।

ঘরে ঢুকেই দেখলাম অমলেন্দু মারা গেছে। তার স্ত্রী পাশে বসে কাঁদছে, নিঃশব্দে। তার ছোটো ছেলে তিনটি মাথার কাছে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে, চোখের জলে তাদের মুখ ভেসে যাচ্ছে। বাড়ির লোকজন চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পাড়ার অন্য একজন ডাক্তার নিস্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, হঠাৎ হার্টফেল করেছে।

মৃত্যু তো হতোই জানি, কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে! বোধ হয় নিজেও একটা শক্‌ পেলাম। ওখানে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমি যে ডাক্তার, সে কথা ভুলে গেলাম, হঠাৎ আমিও কেঁদে ফেললাম। ছি ছি, একি করছি, এই কথা তখনই মনে হওয়াতে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে গেলাম। কাঁদতে কাঁদতে ভগবানকে ডেকে বললাম, ওর আত্মাকে এবার তুমি শান্তি দিও। তখন কেবল ভগবানের কথাই মনে হচ্ছিল। নিশ্চয় যেন তিনি ওপর থেকে শুনতে পাচ্ছেন এমনি মনে করেই বললাম, পৃথিবীর লোকে ওকে ঠকিয়েছে, কিন্তু তোমার কাছে গেলে তুমি যেন ঠকিয়ো না।

মনে করেছিলাম আমার কান্নার কথাটা এখানে আর লিখব না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, যা সত্য তা গোপন রাখার দরকার নেই। মৃত্যু দেখে ডাক্তার কখনো কাঁদে না বটে, কিন্তু ডাক্তারের মধ্যেও একজন দুর্বল মানুষ থাকে, সে কচিৎ কখনো হঠাৎ অসতর্ক মুহূর্তে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ডাক্তারের মন

যতই কড়া হোক, তবু ছেলেবেলাকার কাঁচা মন একটু তার মধ্যে থেকে যায়। মানুষের কাছে বলতে দোষ নেই, কারণ মানুষ সকলেই এমনি দুর্বল।

মৃত্যুর তরফের একটা আইন আছে বৈকি, সে চলবে তার নিজের আইনে। কিন্তু তার মধ্যে দয়া মায়া ক্ষমা প্রভৃতি জিনিসের কোনো বালাই নেই। ওর ওই নিষ্ঠুর রকমের আচরণটাই মানুষদের কাছে মর্মান্তিক ঠেকে।

কিন্তু মৃত্যুকে বিচার করতে বসে কোনো লাভ নেই। মানুষের বুদ্ধি নিয়ে ওর আমরা কী বিচার করতে পারি! হয়তো ওর কাজটাই অমন, ওর অমন নিষ্ঠুর আচরণেরও হয়তো প্রয়োজন আছে।

কথাটা নিয়ে অনেকদিন ভেবে দেখেছি। অনেক কাল পরে তার একটা জবাবও পেয়েছি। ডাক্তার হওয়াতেই ক্রমশ তা জানতে পারলাম।

ডাক্তারি পেশার মধ্যে এমন এক সৌভাগ্য মেলার অবকাশ আছে, যা অন্য কোনো পেশাতে নেই, তা হলো, কেউ যা জানে না এমন সব কথা জানার সৌভাগ্য। মানুষ আসে কেন, সে জন্মায় কেন, ভোগে কেন, ঠকে কেন, আবার মরে কেন—এর কি কোনো মানে আছে? আছে বৈকি। আমাদের বুদ্ধিতে একে যতই অন্যায় অহেতুক অর্থহীন খামখেয়ালি বলে মনে হোক, এরও মধ্যে একটা বুদ্ধি আছে। তবে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে সে বুদ্ধির আন্দাজ করা যাবে না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাকে মনে করছি মহা ক্ষতি, তার কাছে সেটি হয়তো ক্ষতিই নয়। হয়তো বড্ড বেশি গিঁট পড়ছে দেখে তাই ছাড়িয়ে দেওয়া। হয়তো তাও আগের থেকে তার জানা। সে এক মহাবুদ্ধি, মহাচেতনা, মহাপ্রজ্ঞা, আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো মন নিয়ে অনেক বেশি বড়ো করে সে যেমন দেখছে সেই ভাবে তার কাজ চালাচ্ছে। অথচ আমাদের কাছে তার কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে না, সে রয়েছে সম্পূর্ণ আড়ালে। তাই আমরা কিছু বুঝতে পারি না, সব কিছুই হেঁয়ালির মতো ঠেকে। কিন্তু ডাক্তারদের কাছে জন্ম মৃত্যু আর রোগপীড়ার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে সেই বুদ্ধির ঝিলিক একটু আধটু বেরিয়ে পড়ে, তখন তারা ওর বিরাট ও ব্যাপক মতলবের কতকটা আন্দাজ পেয়ে যায়। তারা মনে মনে বুঝতে পারে যে, এখন যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেইটুকুই সব নয়, এই আশ্চর্যের পিছনেও এক পরমাশ্চর্য রয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে বটে যে হঠাৎ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু তার পরেও এর ক্রমশ আছে, তা পরে জানা যাবে। যে অভাবনীয় বুদ্ধি জগৎকে এই ভাবে সৃষ্টি করে এই ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তার মতলব একটা কিছু আছেই, আর সে মতলব এখন বোঝা না গেলেও শেষ পর্যন্ত তা ভালোই।

সমস্ত দেখে শুনে এটুকু বোধ ডাক্তারদের মাথার মধ্যে এসে যায়। সমস্ত দেখে শুনে অন্তরে তারা এই একটা আশ্বাস পায়। এই আস্থা, এই আশ্বাস পাওয়া, এইটুকুই তাদের লাভ, সৌভাগ্য। মানুষের নানা অবস্থা দেখে দেখে মানুষের স্রষ্টার মতলবের কিছু হদিস তারা পেয়ে যায়। নতুবা তাদের কাজের উচিত মূল্য হিসাবে বিশেষ কিছুই তারা পায় না, যা পায় তা সামান্য। কিন্তু এই যে অন্তরের একটা আশ্বাস, এটাই তো বহুমূল্য। অর্থ মান বিদ্যা যশ কোনো কিছুই মানুষকে এ-আশ্বাস এনে দিতে পারে না।

॥ উনিশ ॥

কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে সংক্রামক রোগের মহামারী লাগে। কলেরা, বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু প্রভৃতি এক একটা রোগের তখন মরসুম পড়ে যায়। আগেকার কালে এই রোগগুলি খুবই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত এবং বহু মানুষ তাতে এককালে মারা যেতো। কিন্তু এখন কোনো রোগের প্রকোপ ততটা বাড়তে পারে না, নানারকম উপায়ে তার প্রতিরোধ করা হয়, তাই শহরের এপিডেমিক শীঘ্রই থেমে যায়।

কিন্তু এপিডেমিক থামলেও রোগের হুজুগ থামে না। অর্থাৎ লোকের মুখে মুখে রটতে থাকে,—ও পাড়ায় ভয়ানক ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, ঘরে ঘরে লোক মারা যাচ্ছে। এ হুজুগ একবার শুরু হলে বেশ কিছুদিন যাবৎ তাই নিয়ে গুলতান চলতে থাকে। তখন একটু কিছু হলেই প্রত্যেকে বলে আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, এমন কি ডাক্তারেরাও তাই ধরে নেয় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, কষ্ট করে চোখ চেয়ে কেউ দেখেও না যে বাস্তবিক কি হয়েছে। অথচ কিছুকাল পরে বোঝা যায় যে সেগুলো ঠিক ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, তার বেশির ভাগই হয়তো ম্যালেরিয়া। কলকাতা শহরেও যথেষ্ট ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে, এ কথা ডাক্তারদের কারোর অজানা নেই। এই ম্যালেরিয়াকে ডেঙ্গুর সঙ্গেও অনেক সময় ভুল করা হয়। ডেঙ্গুও এক রকমের জ্বর, মশার কামড়েই তা হয়ে থাকে, এই জ্বরের আক্রমণও দুবার করে হয়। একবার জ্বর হয়ে দুদিন থেকে ছেড়ে পরে আবার একবার জ্বরের ফিরে আক্রমণ হলো। এমনি ছেড়ে গিয়ে জ্বর আসা দেখেই অনেকে ধরে নেয় এটা তাহলে ম্যালেরিয়া। আবার প্রকৃত ম্যালেরিয়াকেও কখনো কখনো ডেঙ্গু বলে ভুল করা হয়। অর্থাৎ যখন যে রোগের হুজুগ উঠেছে, তখন প্রায় সকল রোগকেই সেই রোগটি বলে সাব্যস্ত

করা হয়ে থাকে। হুজুগ এমনিই জিনিস। মানুষ তখন হুজুগেই মাতে, বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাতে চায় না। রোগের হুজুগে মানুষের দুর্বল মস্তিষ্ককে ও স্নায়ুগুলিকে অত্যন্ত বিকল করে দেয়। শরীরে কোনো রোগ না থাকলেও ভয়ে অনেক সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

একদা কলকাতা শহরে একবার ঝিন্‌ঝিনিয়া রোগের হুজুগ উঠেছিল, অনেকেরই তা মনে থাকতে পারে। লোকের মুখে শোনা গেল, শহরে এমন এক রোগ দেখা দিয়েছে, মানুষ রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত পা খেঁচতে শুরু করছে। দু-একজন নাকি ওতে মরেও যাচ্ছে। এই দারুণ রোগের নাম ঝিন্‌ঝিনিয়া। তাই শুনে শুনে সকলে সচকিত হয়ে উঠল, তারপর থেকে বাস্তবিকই দেখা যেতে লাগল যে রাস্তায় ঘাটে হঠাৎ কেউ কেউ শুয়ে পড়ে হাত পা খেঁচতে শুরু করছে।

ঐ অবস্থাতে এক একজনকে আমার ডাক্তারখানাতেও চ্যাংদোলা করে আনা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লোকে লোকারণ্য। সবাই এসেছে মজা দেখতে, চোখে মুখে তাদের অদম্য কৌতূহল। সেটাও এক হুজুগ। এর পরে পাড়ায় পাড়ায় তারা ব্যাখ্যা করে বলে বেড়াবে, কি কি দেখলে, আর ডাক্তারখানায় কি কি করা হলো।

লোকের ভিড় তাড়িয়ে আমি ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ করে দিতাম। রোগীকে পরীক্ষা করে দেখতাম, কোথাও কিছু হয় নি। কেবল স্নায়ু বিগড়েছে, ভয়ে সে ঐরকম কাঁপছে। এটা ওটা ওষুধ খাইয়ে অ্যামোনিয়া শুঁকিয়ে তাকে সুস্থ করা হতো, তখন সে আপনিই উঠে বাড়ি চলে যেতো।

একবার একজন এইরকম রোগী কিছুতেই সারতে চায় না, যেন ইচ্ছা করে হাত পা খেঁচতে থাকে। আমার মনে হলো, একে কিছু ইন্‌জেকশন করা দরকার। ছুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে, এটা মালুম হলে মনের উপর তার ক্রিয়া হবে, তাতে শীঘ্রই সেরে যাবে। কোনো বিশেষ ওষুধ প্রয়োগ করবার দরকার নেই, বিশুদ্ধ ডিস্‌টিলড্‌ ওয়াটার ইন্‌জেকশন দেওয়া যাক, তাতেই হয়তো কাজ হবে। ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার মানুষের দেহের লবণাক্ত রসের বিপরীতধর্মী, সুতরাং যেখানে ওটি ইন্‌জেকশন করা যায় সেখানে ব্যথায় চড়্‌চড়্‌ করতে থাকে, মনে হয় কি একটা খুব তেজী ওষুধ শরীরের মধ্যে ঢুকেছে। এমনি ব্যথা লাগলেই তখন বিশ্বাস হয়ে যাবে যে জোরালো কিছু চিকিৎসা হচ্ছে। তাই আমি ইন্‌জেকশন দিয়ে দেখলাম, চমৎকার তাতে

কাজ হলো। রোগী ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে দুই তিন মিনিটের মধ্যে শান্ত হয়ে থেমে গেল।

তখন থেকে ঐরকম ঝিন্‌ঝিনিয়ার আক্রমণ দেখলেই ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ইন্‌জেকশন দিয়ে দিতাম। এতে পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল যে আমি ঝিন্‌ঝিনিয়ার ইন্‌জেকশন আবিষ্কার করেছি, দিলেই রোগ সেরে যায়। এমনি অনেক রকমের সাময়িক স্নায়ুদৌর্বল্যেই আমি ওতে বেশ কাজ পেয়েছি।

এই সূত্রে আমি এক স্থায়ী রকমের স্নায়ুবিকারগ্রস্ত রোগীর পাল্লায় পড়ে গেলাম। তিনি কোথাকার একজন রাজ্য-নির্বাসিতা রাণী। অবশ্য সে কথা পরে জেনেছিলাম।

সন্ধ্যার পরে ডাক পড়ল গয়লাপাড়ায় এক গয়লাদের বাড়িতে। তারা বেশ অবস্থাপন্ন, নিজেদের দোতলা বাড়ি আছে। পাশেই মস্ত গোয়াল। নিজেরা বাস করে একতলাতে, দোতলার ঘর দুখানি সম্প্রতি ঐ রাণীকে তারা ভাড়া দিয়েছে।

তারাই আমাকে কল দিয়ে নিয়ে গেল। বললে—"রাণীর ঝিন্‌ঝিনিয়া রোগ হয়েছে, তাকে দেখতে যেতে হবে। আপনার সেই ইন্‌জেকশনটা সঙ্গে নিয়ে চলুন।" "রাণী মানে কি হলো?" তারা বললে, অমুক জায়গার রাণী তাদের বাড়িতে ভাড়া রয়েছেন। বাংলা দেশের এমন এক জায়গার কথা তারা বললে যার নাম বিখ্যাত, অনেকেরই জানা আছে।

"সেখানকার রাণী তোমাদের বাড়িতে কেন?"—পথে যেতে যেতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তাদের মুখে যা শুনলাম তা এই যে, এই রাণীটির কোনো সন্তানাদি হয় নি। রাজা মারা যাবার পরে এঁর সপত্নীপুত্রেরা গদির দখল পেয়েছেন, রাজার উইল অনুসারে ইনি শুধু একটা মাসোহারা পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এঁর বনিবনা হয় না। তারপর তাঁরাই ওঁকে তাড়িয়ে দিয়ে থাকুক, কিংবা উনিই তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসে থাকুন, মোট কথা উনি সেখানে আর থাকেন না। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, অনেক তীর্থেও গিয়ে কিছুকাল বাস করেছেন। সম্প্রতি কলকাতায় এসে কয়েক জায়গায় থেকে পছন্দ না হওয়াতে অবশেষে ওদের বাড়িতে এসে ভাড়া রয়েছেন।

উপরে গিয়ে ঘরে ঢুকেই দেখি, ঘর দুটি নানা আসবাবপত্রে ঠাসা। বাক্স পেঁটরা বিস্তর, উপর্যুপরি সাজানো। আর ঘরের চারিদিকেই নানা আকারের আয়না ঝুলছে। যেদিকেই চাওয়া যায় ছোটোবড়ো আয়নার ভিতর দিয়ে নিজের মুখটাই নজরে পড়ে। ঘরের মধ্যে এক চড়া রকমের ধূপের গন্ধ। এক

পাশে রয়েছে একটি দেয়াল আলমারি ও একটি টেবিল। সে তুটি কেবল নানা আকারের ওষুধের বোতলে ঠাসা।

দেখলাম রাণীকে। শুয়ে আছেন খাটের উপর বিছানাতে। তিনি বেশ স্থূলাঙ্গী, বয়সটা চল্লিশের নীচে বলে মনে হয় না। গায়ের রঙটা অতিরিক্ত রকমের ফর্শা, এত বেশি ফর্শা যে চোখে লাগে। মনে হয় এর চেয়ে একটু কম হলেই যেন ভালো ছিল। তাছাড়া যেখানে দেহগঠনের কোনো একটা শ্রীছাঁদ নেই, সেখানে শুধুই চামড়ার উগ্র রঙটা কেমন কট্‌কটে মনে হয়। চোখ তুটি কটা। দৃষ্টি চঞ্চল, কাউকেই যেন তাঁর বিশ্বাস নেই।

বোধ করি বিছানায় তিনি শান্তভাবে ছিলেন না, আমাকে দেখে "উঃ আঃ" শব্দ করে আরো বেশি ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—"ডাক্তারবাবু, শিগ্‌গির এর কিছু একটা উপায় করুন, আমি আর মোটে সহ্য করতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট।"

আমি বললাম—"কি কষ্ট হচ্ছে আপনার ?"

তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন—"জ্বালা, জ্বালা, সর্বাঙ্গ আমার লঙ্কা-বাটা লাগার মতো জ্বলে যাচ্ছে। আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিন্‌ঝিন ঝিন্‌ঝিন করছে—"

"কখন থেকে এমন হলো আপনার ?"

"এই আজ প্রথম, জীবনে কখনো আমার এমন হয় নি। আমি বিস্তর রকম রোগে ভুগেছি, সব রোগকেই চিনি, কিন্তু এ যে অতি ভীষণ ব্যাপার—"

"দেখি, আপনার বুকটা একবার পরীক্ষা করি।"

"তা করবেন করুন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। সকলেই হাজার বার বুক পরীক্ষা করে দেখেছে, কেউই কিছু ধরতে পারে নি। কিন্তু এ যে কি ভীষণ কষ্ট—"

বুক পিঠ পরীক্ষা করলাম। কোথাও কিছু দোষ নেই। তখন বললাম —"এ আপনার ঝিন্‌ঝিনিয়া নয়, নার্ভের উত্তেজনা। ঘুমের ওষুধ খেলেই এটা সারবে।"

"সে সব না খেয়েই কি আপনাকে ডেকেছি! রোজই আমাকে তাই খেতে হয়, নইলে মোটে ঘুমোতে পারি না। সন্ধ্যাবেলা খাই উইন্‌কার্নিসের সঙ্গে খানিকটা পীকক্ ব্রোমাইড মিশিয়ে। তাতেও কিছু হয় না, শোবার আগে খাই একটা ইউকোডোলের বড়ি (কতক মর্ফিয়ার মতো), আর তার

সঙ্গে দুটো সোনেরিলের বড়ি (ঘুমের ওষুধ), তবে আমার ঘুম আসে। কিন্তু আজ তাতেও কিছু হচ্ছে না। সবরকম ওষুধই আমার জানা আছে, দেখুন না টেবিলের ওপর সব সাজানো রয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রণার চোটে কোনো ওষুধই আজ থই পাচ্ছে না। এ কী ভীষণ রোগ ধরল রে বাবা—"

তখন আমি বললাম—"তাহলে একটা ইন্‌জেকশন আপনাকে দিয়ে দিই। খুব ভালো জিনিস, জার্মানির তৈরি, এতে নিশ্চয় কষ্ট সেরে যাবে।"

"না না, দাঁড়ান, আগে বলুন কি ইন্‌জেকশন্ আপনি দিতে চাইছেন। আমি সব ইন্‌জেকশনেরই নাম জানি, অনেক কিছুই নিয়েছি। আমার আবার অনেক জিনিস ধাতে সয় না। এতটুকু কুইনিন আমাকে কিছু না বলে খাইয়ে দেখুন, এখনই হার্টফেল হতে শুরু করবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইন্‌জেকশনের মধ্যে এক মর্ফিয়া ইন্‌জেকশনই আমার ধাতে সয়, অন্য কিছু সয় না। যদি তাই দিতে পারেন তো দিন, তাতেই আমার কাজ হবে।"

আমি বললাম—"এটা মর্ফিয়ার মতোই জিনিস, তার চেয়ে বরং আরো জোরালো।"

"তবে তাই দিন, তাই দিন, আমি একটু ঘুমিয়ে বাঁচি।"

আমি খানিকটা ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম। বুঝলাম যে স্থানীয় প্রতিক্রিয়াটি তিনি বেশ বোধ করলেন। অতঃপর তিনি চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন। আমি আলো নিবিয়ে সকলকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বললাম, কেবল ওঁর ঝি রইল কাছে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

এর পর থেকে প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার ঐ সময়ে ডাক পড়তো। শুনতাম, যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন। বুঝতাম যে ঐ তথাকথিত মর্ফিয়ার ইন্‌জেকশনটি উনি নিতে চাইছেন। যথারীতি ফী পাচ্ছি, অগত্যা ডাকলেই আমাকে যেতে হতো, ইন্‌জেকশনটি দিয়ে আসতে হতো। ওটির উপর বিশ্বাস এসে গিয়েছিল, কাজেই ওতেই তাঁর কাজ হতো।

একদিন আমাকে বললেন—"এত যে কষ্ট পাচ্ছি, হঠাৎ কোনোদিন হার্ট ফেল করে মরে যাবো না তো?"

আমি বললাম—"মরবেন না, সে গ্যারাণ্টি আপনাকে দিতে পারি।"

তিনি বললেন—"মরণাপন্ন রোগে ধরেছে, তা তো আপনি বুঝতে পারছেন? যদি একটা কাজ করেন তাহলে আমার খুব উপকার করা হয়। দেখছেন তো, এখানে আমার নিজের লোক কেউই নেই, নিতান্ত আমি

একা। কখন যে কি হয় বলা যায় না। আমাদের স্টেটে আমার ছেলেদের কাছে আপনি যদি একটি চিঠি লিখে দেন যে আমার মরণাপন্ন রোগ হয়েছে, ওদের কারো এসে দেখা দরকার, তাহলে আমার কিছু উপায় হয়।"

আমি বললাম—"তা আমি পারবো না, ওটি আমার কাজ নয়।"

"তাহলে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন, আমি নিজেই সেটা পাঠিয়ে দেব।"

"তাও আমি দিতে পারি না, সার্টিফিকেট দেবার মতো এমন কিছু রোগ আপনার নয়।"

—"আপনি তাহলে কিছুই জানেন না। আমার হলো শক্ত রকমের পেটের রোগ। কোনো খাওয়াই হজম হয় না, প্রত্যেক জিনিসটা ওষুধের দ্বারা হজম করাতে হয়। কেউ বলে আল্‌সার হয়েছে, কেউ বলে লিভার খারাপ, কেউ বলে কোলাইটিস, আবার কেউ বলে ফ্লোটিং কিড্‌নি। ঠিক যে কি রোগ তা আজও ধরা পড়ে নি।"

পেটের রোগ শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। পেটে কোনো ক্রনিক রোগ হলে সত্যই ধরা খুব কঠিন। উপর থেকে পরীক্ষার দ্বারা কিছু বোঝা যায় না, কেবল রোগীর কথার উপরেই নির্ভর। হাসপাতালে থেকে রীতিমত পরীক্ষাদি করলে এই ধরণের ক্রনিক রোগ কখনো কখনো ধরা পড়ে। আমি তাঁকে সেই কথাই বললাম যে এখানে থেকে এ রোগের চিকিৎসা হবে না, হাসপাতালে তাঁর ভর্তি হওয়া উচিত।

তিনি বললেন, সে কথাও তাহলে তাদের জানানো দরকার, নইলে কে তার ব্যবস্থা করবে। আমি বললাম, "ব্যবস্থাটা বরং আমিই করে দিতে পারি, যদি আমার ব্যবস্থাতে আপনি রাজী হন।"

তখন ট্রপিক্যালের হাসপাতালে আমি তাঁকে ভর্তি করে দিলাম। এই হাসপাতালটির সব কিছু ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট। কারণ রিসার্চের কাজ করবার সুবিধার জন্যে রোগীদের এখানে যথেষ্টই যত্ন নেওয়া হয়। আর যত রকমের পরীক্ষা আছে সমস্তই একাধিক বার করে দেখা হয়, যাতে ভিতরের খবর কোথাও কিছু জানতে বাকি না থাকে। এক একটি ক্রনিক রোগীর রোগনির্ণয় করতে একমাস দুমাস যাবৎ পরীক্ষাই চলে। আর রোগীরাও তাতে আপত্তি করে না, তাদের সর্বপ্রকারে খুশি রাখা হয়। আর পথ্যাদির ব্যবস্থা তাদের জন্যে প্রচুর।

হাসপাতালে দুই রকমের বেড্‌ আছে, পেয়িং বেড্‌ আর ফ্রি বেড্‌। আমি তাঁকে পেয়িং বেডে ভর্তি করে দিলাম। খুবই তাঁর যত্ন হতে থাকল। আমি

গোয়ালাদের কাছে শুনলাম যে এতরকম খাবার ব্যবস্থা তাঁর করা হয়েছে যে সব তিনি খেতে পারেন না, পাশের বেডের মেয়েটিকে কতক কতক বিতরণ করে দেন।

দুই মাস যাবৎ রইলেন তিনি ঐ হাসপাতালে। যদিও সকল রকম পরীক্ষা সত্ত্বেও রোগ কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না, কিন্তু ওখানকার নিয়মিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তিনি এদিকে বেশ সুস্থই হয়ে ফিরে এলেন। হাসপাতালে আরো কিছুকাল থাকবার জন্যে তিনি অনেক রকম চেষ্টা করেছিলেন এবং ডিরেক্টরকে পর্যন্ত ধরেছিলেন, কিন্তু তারা তাতে সম্মত হয় নি। বলে দিয়েছে যে তাঁর কোনো রোগ আর নেই, এখানে থাকার কোনো দরকার নেই।

ফিরে এসেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম গায়ে আরো মাংস লেগেছে, সাদাটে রঙের উপর একটা লাল্‌চে আভা ধরেছে। হাসপাতালের সুখ্যাতিতে একেবারে পঞ্চমুখ। সেখানকার অনেক গল্প করলেন, নার্সদের অনেক গুণব্যাখ্যা করলেন। তারপর আমাকে বললেন— "আপনি ছিলেন বলেই আমার এত বড়ো রোগের এমন চিকিৎসাটা হতে পারল। নইলে চিরকাল কষ্টই পেতাম, হয়তো কবে মরেই যেতাম।

কিন্তু শুধু এটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, বাক্স থেকে বের করলেন একটি হীরার নাকছাবি। আমাকে সেটি দিয়ে বললেন—"এটি আপনার কাছে রাখুন, বাড়িতে ব্যবহার করতে দেবেন। এমন হীরে আজকাল মেলে না। আপনি আমার বাঁধা ডাক্তার রইলেন, যখনই ডাকবো আসবেন, হয়তো ইন্‌জেকশন দেবারও দরকার হতে পারে, কিছু বলা যায় না।"

আমি তখন ঠিক বুঝতে পারি নি, হঠাৎ অমন দামী জিনিসটা আমাকে দেবার উদ্দেশ্য কি। মনে করলাম রাণী মানুষ, এঁদের প্রকৃতিই হয়তো এমনি দিলদরিয়া, মন খুশি হলে এটা ওটা লোককে দিয়ে ফেলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝলাম ব্যাপারটা।

একদিন তেমনি রাত্রের দিকে আবার আমার ডাক পড়ল। আবার তেমনি ঝিন্‌ঝিনিয়ার মতো কষ্ট শুরু হয়েছে, তিনি ঘুমোতে পারছেন না, ছটফট করছেন। এখনই একটা ইন্‌জেকশন দেওয়া চাই।

একটু ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার সঙ্গে নিয়ে গেলাম সেখানে। যেতেই কিন্তু রাণী বললেন—"আপনার ও ইন্‌জেকশন আমি নেবো না। ও তো মর্ফিয়া নয়, অন্য কিছু। আপনি আমাকে সত্যিকার মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন দিন, যেমন

হাসপাতালে আমাকে দিতো। তাতে কি সুন্দর ঘুম হতো, চোখ দুটোকে যেন টেনে বুজিয়ে দিয়ে কোথায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো।"

আমার কৌশলটি কেমন করে ওঁর কাছে ধরা পড়ে গেছে! তখন ভালো করে খবর নিয়ে সব জানলাম। উনি হাসপাতালেও অমনি অসহ্য কষ্ট হচ্ছে বলে ছটফট করতেন। সেখানকার নার্সেরা ব্যস্ত হয়ে রেসিডেণ্ট ডাক্তারকে ডেকে আনতো। তাকে উনি বুঝিয়ে দিতেন যে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন না দিলে ওঁর কষ্ট কিছুতেই সারবে না। রেসিডেণ্ট তখন নার্সকে তাই দেবার হুকুম দিয়ে চলে যেতেন। অতঃপর রাত্রে অমনি কষ্ট দেখা দিলে রেসিডেণ্টকে আর বিরক্ত করবার প্রয়োজনও হতো না। উনি নিজেই নার্সদের বলতেন; "ভারি কষ্ট হচ্ছে, একটা মর্ফিয়া দিয়ে দাও ভাই।" তারা তাই দিয়ে দিতো। এর জন্যে তাদের কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে উনি খুশি রাখতেন।

সব কথা শুনে আমি বললাম—"কিন্তু আমি তো সেইরকম মর্ফিয়া দিতে পারবো না, আমি আমার এই ইন্‌জেকশনটাই দিতে পারি।"

"কেন পারবেন না? আমি আপনাকে ডবল ফী দেবো।"

"তাহলেও পারবো না।"

"আপনাকে দিতেই হবে, নইলে আমি এমনি কষ্ট পেতে থাকবো?"

"ও কষ্ট কিছুই নয়, ঘুমের ওষুধ খান আর এই ইন্‌জেকশন নিন, তাতেই সারবে।"

মর্ফিয়া দিতে কোনোমতেই আমি রাজী হলাম না।

কেন রাজী হলাম না, এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলা দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে মর্ফিয়া আমাদের দিতেই হয়। মানুষের কষ্ট সহের একটা সীমা থাকে, সেই সীমা পার হয়ে রোগী যখন অত্যন্তই কাতর হয়ে পড়ে, তখন তাকে মর্ফিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। সেখানে তা দিতে ইতস্তত করলে অমানুষিকতা করা হয়। এমন এক একটা অবস্থা এসে পড়ে যখন পুনঃ পুনঃ মর্ফিয়া দিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না। অন্যায় হবে জানলেও না।

একটি বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। এক ভদ্রলোকের পুরুষাঙ্গে ক্যানসার হয়েছিল। সে অবিবাহিত, তার পরিপূর্ণ যৌবন, কেন যে ঐ বয়সে তার অমন স্থানে ক্যানসার হলো সে কথা ঈশ্বরই বলতে পারেন, আজ পর্যন্ত আমরা ওর সঠিক কারণের কথা বলতে পারি না। কিন্তু ওরূপ স্থানে ক্যানসার হলে মাঝে মাঝে প্রবল যন্ত্রণাতে অস্থির হতে হয়, তেমন তীব্র যন্ত্রণা বোধ করি অন্য কিছুতে হয় না। এক্সরে ও রেডিয়ম প্রভৃতির দ্বারা তার

চিকিৎসা করা হচ্ছিল, কারণ রোগটি এত বেড়ে গিয়েছিল যে তখন আর অপারেশন করা চলে না। কিন্তু তার যন্ত্রণা অন্য কিছুতে কমতো না, মর্ফিয়া ঘটিত ওষুধই খেতে দিতে হতো। তার পর তাতেও কিছু হতো না, অগত্যা ইন্‌জেকশন দিতে হতো। প্রত্যহই তাকে একটি করে ইন্‌জেকশন দিতে আমি আমার কম্পাউণ্ডারকে পাঠাতাম। ক্রমে তাও সওয়া হয়ে এলো, তখন তাকে দৈনিক দুবার ইন্‌জেকশন দেওয়া প্রয়োজন হলো। প্রত্যহ এই ভাবে নিতে নিতে ক্রমে সে নিজেই নিতে শুরু করলে, তার লোক এসে ডাক্তারখানা থেকে দুটি করে অ্যাম্পুল নিয়ে যেতো। তার পর একদিন যখন তাকে দেখতে গেছি, তখন সে অত্যন্ত মিনতি করে বললে—"রোজ রোজ আপনার ডাক্তারখানা থেকে অ্যাম্পুল চেয়ে আনতে হয়, তার চেয়ে যদি দয়া করে বারোটা অ্যাম্পুলের একটা পুরো বাক্সের জন্যে আপনি প্রেস্‌ক্রুপশন লিখে দেন।"

ডাক্তারের রেজিস্ট্রি নম্বর দেওয়া প্রেসক্রুপশন ছাড়া পুরো এক বাক্স মর্ফিয়ার অ্যাম্পুল কোনোমতেই পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তেমন প্রেসক্রুপশন কি আমার দেওয়া উচিত? আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। চোখ দুটি ওর জলে ভরে গেছে, অত্যন্ত কাতর নয়নে ও আমার কাছে যেন এক দুষ্প্রাপ্য করুণা ভিক্ষা করছে। আমি তৎক্ষণাৎ লিখে দিলাম প্রেসক্রুপশন। পরের দিনই শুনলাম সে মারা গেছে। তার আত্মীয়েরা আমার কাছে তার মৃত্যুর সার্টিফিকেট নিতে এলো। আমি লিখে দিলাম—ক্যানসার রোগে স্বাভাবিক মৃত্যু, যদিও স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বারোটি অ্যাম্পুল একসঙ্গে ইনজেকশন নিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। ডাক্তারিতে ইউথ্যানেসিয়া বলে একটা কথাই আছে, তার মানে যন্ত্রণাবিহীন মৃত্যু। এ সেই জিনিস। প্রেসক্রুপশনটি দেওয়া হয়তো আমার অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে আমার মনে কোনো ক্ষোভ হলো না। সে যে ঐ নিদারুণ যন্ত্রণা ভুগতে ভুগতে একদিন মারা যেতোই এ নিশ্চিত কথা, সুতরাং সেই যন্ত্রণাভোগ এড়িয়ে আত্মহত্যা করাতে তার ব্যক্তিগত অধিকার ছিল। তাতে যে আমি বাধা দিই নি, এতে আমার কিছু অন্যায় হয় নি। প্রকৃতির রাজ্যে অনেক অপঘাতমৃত্যুও হয়, কিন্তু প্রকৃতির কাছে তা স্বাভাবিক। তেমনি এই ধরণের কোনো কোনো আত্মহত্যাও স্বাভাবিকের অন্তর্গত।

কিন্তু আবার অন্য একজনের কথা বলি। তিনি এক মহা পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পরম ভক্ত। বিরাশি বছর তাঁর বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ বয়সেও তিনি

পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকাদি লিখে থাকেন। তিনি প্রত্যহ নিজের হাতে মর্ফিয়া ইন্‌জেকশন নেন, এটি তাঁর অভ্যাস। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। যেতেই কাছে বসিয়ে আমাকে স্পষ্ট বললেন যে তিনি দুবার করে রোজ মর্ফিয়া নিয়ে থাকেন। একজন বৃদ্ধ ডাক্তার সপ্তাহে একবার করে আসতেন এবং একটি ফী নিয়ে এক টিউব মর্ফিয়া বড়ির জন্যে প্রেস্‌ক্রপশন দিয়ে যেতেন। সেই বড়ি একটি করে জলে গুলে টেস্টটিউবের মধ্যে ফুটিয়ে উনি ইনজেকশন নিতেন। কিন্তু সেই ডাক্তারটি হঠাৎ মারা গেছেন। এখন টেস্টটিউবের মধ্যে বড়ি একটি গোলাই রয়েছে, সেটি আমার সামনেই তিনি ইনজেকশন করে নেবেন, অতঃপর আমার প্রাপ্য ফী নিয়ে এক ডজন মর্ফিয়া বড়ির জন্যে একটি প্রেস্‌ক্রপশন আমাকে লিখে দিতে হবে।

এই বলে আমার সামনেই তিনি ইন্‌জেকশনটি নিলেন। আমি চেয়ে দেখলাম, ছুঁচ ফুঁড়ে ফুঁড়ে তাঁর দুই হাতের ও দুই পায়ের চামড়া একেবারে কালো হয়ে জুতোর চামড়ার মতো শক্ত হয়ে গেছে, সে চামড়া এত কঠিন যে সহজে ছুঁচ ঢুকতে চায় না, জোর করে ঢোকাতে হয়।

আমি বললাম—"মাপ করবেন, অমন প্রেস্‌ক্রপশন আমি দিতে পারবো না।"

"কেন, তাতে তোমার ক্ষতি কি আছে? এ জিনিস তো আমার পক্ষে বিষ নয়, অমৃত। দেখ, এর জোরেই আমি সুস্থ হয়ে এখনও বেঁচে আছি, জগতের কত কাজ করতে পারছি। আমাকে সেই কাজে তোমার সাহায্যই করা হবে।"

"আপনার তরফ থেকে হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমার তরফের কথা অন্যরকম। আমিও জগতের একটা কাজ করি। সে কাজ হলো ডাক্তারি করা। অর্থাৎ কারো রোগ হলে আর সেখানে দরকার হলে তবেই অমন প্রেস্‌ক্রপশন করতে পারি। সেই কারণেই আমাকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, আমি তার অপব্যবহার করতে পারি না। তাতে আমার ডাক্তারি নীতিতে বাধবে।"

"কিন্তু আমারও তো এটা রোগই, ওটি না নিলেই আমি মরে যাবো।"

"একে রোগ বলে না, নেশা বলে, ড্রাগ হ্যাবিট। মাপ করবেন, আপনি আমার চেয়ে বয়সে আর বিদ্যায় অনেক বড়ো, আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। আপনি অন্য কাউকে ধরুন।"

তেমনি এখানেও দেখলাম সেই একই ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, ফাঁদে পড়ে ঐ মহিলাটির মর্ফিয়ার নেশা জমানোতে প্রশ্রয় দেওয়া। এতে শীঘ্রই এমন অবস্থা আসবে যখন প্রত্যহই এটি নেওয়া দরকার হবে। সে কথা আমি ওঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু কিছুতেই উনি বুঝলেন না, কেবলই বলতে থাকেন যে আমি কথা দিচ্ছি, সে অভ্যাস কখনই করবো না। কিন্তু আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি, সে অভ্যাস প্রায় এসেই পড়েছে। তাও স্পষ্ট করে তাঁকে জানিয়ে দিয়ে বিরক্ত হয়ে চলে এলাম।

পরের দিন সেই হীরার উপহারটি তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুকাল পরে শুনলাম, তিনি এক কম্পাউণ্ডারকে জুটিয়েছেন, আর এখন প্রত্যহই একটি করে ইন্‌জেকশন নিচ্ছেন। পরে হয়তো নিজের হাতেই নিতে শুরু করবেন।

॥ কুড়ি ॥

তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে সবেমাত্র কলকাতায় এসে বসেছি, নতুন করে আবার প্র্যাকটিস জমাবার আশায়। কিন্তু তখনও আগের মতো জমে ওঠে নি। তার কারণ অনেকেই জানে যে আমি কলকাতায় নেই। ফিরে এসেছি তা অনেকে জানে না। সুতরাং তাই জানাবার জন্যে সকালে বিকালে বহুক্ষণ পর্যন্ত রাস্তার সামনে ডাক্তারখানায় এমনিই বসে থাকি। বই পড়ি, কাগজ পড়ি। বন্ধুবান্ধব এসে জুটলে তাদের সঙ্গে বাজে গল্পগুজব করি। আর যখন কেউই থাকে না এবং কিছুই করবার থাকে না, তখন বসে বসে রাস্তার দিকে চেয়ে দিবাস্বপ্ন দেখি—সেই মস্ত ধনী নবাবের বাড়িতে আবার আমার ডাক পড়েছে, আবার আমি সেই পরমাসুন্দরী নবাবকন্যার রক্ত পরীক্ষা করতে চলেছি।—

এরই মধ্যে একদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়ো, তাঁকে আমি মান্য করি। সাহিত্যিক মহলে কোথাও ডাক্তারি করবার দরকার হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে যান। সেদিন তিনি এসে বললেন—"একটি মেয়েকে দেখতে যেতে হবে। একটু দূরে যেতে হবে, হাওড়াতে। অবস্থা ভালো নয়, কিছু দিতে পারবে না। তার স্বামীও এখন জেলে, স্বদেশী মামলায় তাকে জড়িয়েছে। ইতিমধ্যে মেয়েটি প্রসব হয়েছে। প্রসব হবার পর থেকেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘুষঘুষে

জ্বর, শয্যাগত হয়ে আছে। রয়েছে তার ভাইয়ের বাড়িতে। তারা ডাক্তার দেখাতে চায় না, এমনি ফেলে রেখেছে। কিন্তু এমন অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা উচিত হচ্ছে না। তুমি একবার চলো, কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।"

গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে মেঝের উপর ছেঁড়া মাদুরে একটি শীর্ণদেহা মেয়ে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে। পাশে তার সদ্যোজাত শিশু।

সেখানে বসবার কোনো জায়গা নেই। অন্য কোনো লোকও সেখানে নেই। বন্ধু আছেন বাইরে দাঁড়িয়ে। উপায়ান্তর না দেখে আমি প্যাণ্ট গুটিয়ে সেই মাদুরেরই এক পাশে ধপ্ করে বসে পড়লাম। বসেই বললাম—"আমার দিকে ফিরে শোও, নাড়িটা একবার দেখি।"

সম্বোধনটা আমার মোলায়েম হয় নি। নিজের পয়সায় পেট্রল পুড়িয়ে অতটা রাস্তা গেছি, সেখানে কোনো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই, বেগারের রোগী দেখছি। তাই মেজাজটা কিছু গরম গরমই আছে। যেখানে অর্থ মেলে সেখানে অমন রুক্ষ ভাবে সম্বোধন করা চলে না। সেখানে যথেষ্ট অমায়িক হতে হয়, রোগীকে খুশি করবার জন্যে হেসে কথা বলতে হয়। এমন কি রোগী বিরক্ত হলেও হাসিমুখ বজায় রাখতে হয়। কিন্তু এখানে অত কিছুর প্রয়োজনই নেই। কে কোথাকার একটা মেয়ে, নেহাৎ খাতিরে পড়ে তাকে দেখতে এসেছি।

মেয়েটি ত্রস্ত হয়ে আমার দিকে ফিরে শুলো। নাড়িতে দেখলাম একটু জ্বর আছে। বললাম—"জিভ দেখি।" তৎক্ষণাৎ সে জিভ বের করে দেখালে। "পেটটা দেখি।" সে ত্রস্তে পেটের কাপড় ঢিলা করে দিলে। "বুকটা দেখবো।" সে তেমনি ত্রস্তে বুকের কাপড় একটু সরিয়ে ধরলে, ষ্টিথোস্কোপ লাগিয়ে আমি পরীক্ষা করলাম। চোখের কোল টেনে দেখলাম, সাদা।

তবে রোগ এমন কিছু কঠিন নয়। প্রসবের সময় বেশী পরিমাণে রক্তক্ষয় হয়েছে, তাইতে শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তার উপর একটু ম্যালেরিয়াও আছে। জ্বরটা হচ্ছে দুই কারণেই। শরীরে যাতে রক্ত বাড়ে তার ব্যবস্থাও করতে হবে, আর ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসাও করতে হবে।

তখন আমি বললাম—"একটু কাগজ চাই যে, প্রেসক্রুপশন করতে হবে।"

কাছেই একটা টেবিল ছিল। মেয়েটি অসহায় ভাবে সেই টেবিলের দিকে চাইতে লাগল।

আমি বললাম—"থাক থাক, ঐ টেবিলের উপর কাগজ মিলবে তো? আমি নিজেই যোগাড় করে নিচ্ছি, তোমায় উঠতে হবে না।"

আমি তখন উঠে গেলাম সেই টেবিলের দিকে। সেখানে দেখলাম, কয়েকখানি বই পড়ে রয়েছে। সামনের বইখানি শেলির কাব্যগ্রন্থ। এক পাশে রয়েছে একখানি বাঁধানো খাতা। তার ভিতর থেকে একটা সাদা পাতা ছিঁড়ে নেবো মনে করে খাতাখানি খুললাম।

খাতাখানি প্রায় আদ্যোপান্ত বাংলা কবিতায় ভরা। সুন্দর ঝরঝরে হস্তাক্ষর, নিপুণভাবে লাইনের পর লাইন ছন্দ অনুসারে সাজানো। কাটাকুটি নেই কোথাও।

নেহাৎ ডাক্তার হলেও কবিতা পড়তে আমি ভালোবাসি। ওদিকে ছেলেবেলা থেকেই আমার একটু টান আছে। দেখি তো কেমন কবিতা, এই ভেবে আমি একটা জায়গায় পড়ে দেখলাম—

"যদি—উধাও হয়ে বয়ে যাওয়ার জোয়ার আসে প্রাণে,
মহাসাগর ডাকে যদি বিপুল আহ্বানে;
পাষাণ যদি ঝর্ণাধারায়
ডুব দিয়ে সে আপন হারায়,
দখিন হাওয়ায় হৃদয় যদি
বারণ নাহি মানে;
ও মন, মনরে আমার, তখনো কি রইবি ঘরে,
কে জানে কে জানে।"

বাঃ, চমৎকার কবিতাটি! ঠিক যেন হুবহু রবীন্দ্রনাথের মতো, এ যেন তাঁর লেখা পড়ছি মনে হচ্ছে। তাঁর কবিতা থেকেই চুরি করা হয়েছে নাকি? অথচ আগে কোথাও পড়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কবিতাই আমি পড়েছি। এটি পড়া থাকলে নিশ্চয়ই মনে পড়ে যেতো।

আচ্ছা, আরো দেখা যাক। তাহলেই সন্দেহ মিটে যাবে। খাতার অন্য একটি জায়গা খুলে পড়লাম—

"দুঃখ হতে ক্ষতি হতে যে অমৃত করেছি সঞ্চয় নিত্য পলে পলে,
মৃত্তিকার ধরণীতে কণ্ঠ ভরি তাহারি বিজয় গাহি কুতূহলে।
চিরদুঃখী পৃথিবীর কবি আমি নামগোত্রহীন অখ্যাত অ-নামী,
মানুষের অশ্রুমাঝে আমার এ হৃদি-মর্মবাণী কহিবে সে বাণী।
তাই মোর কাব্যকথা ছন্দে ছন্দে হয়েছে মুখর হাহাকার মাঝে,
কুসুম-সঙ্গীতে যথা ধরণীর আকুল অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বাজে।"

সুন্দর রচনা, সুন্দর ভাবটি। কিন্তু এ রচনা নিশ্চয় অন্য কারো। এর ভাব

আলাদা, ভাষা আলাদা, ধরন আলাদা। যে লিখেছে, এ তার নিজস্ব। আর এ কোনো পাকা হাতের লেখা, যার প্রাণে কাব্যের সহজ উৎস আছে, ভাষা ও ছন্দের উপর যথেষ্ট যার দখল আছে। খাতা উল্টেপাল্টে আরো দু-একটি পড়লাম। ভারি ভালো লাগল কবিতাগুলি পড়ে। কিন্তু এমন জায়গায় কে এমন কবি থাকতে পারে! আমি খাতাখানি হাতে নিয়ে বাইরে গেলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমার সেই সাহিত্যিক বন্ধু। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কবিতাগুলি কার লেখা?"

তিনি বললেন—"ওরই লেখা।"

"ওরই মানে?"

"মানে তোমার ঐ রোগিণীর, ঐ মেয়েটিরই লেখা।"

ঐ সদ্যপ্রসূতা মেয়েটি লেখে এমন কবিতা! শুনে আমি চমৎকৃত হলাম। ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাই আবার জিজ্ঞাসা করলাম—"টেবিলের উপর শেলির কবিতার বইটই দেখলাম, সেগুলো কে পড়ে?"

"ওরই বই, ও-ই পড়ে। কেন, ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে বুঝি শেলির কবিতা পড়া যায় না?"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, "তা নয়, সে কথা বলছি না, আমি এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম"—বলতে বলতে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। প্রেস্‌ক্রপশন লেখা তখন মাথায় চড়ে গেছে। যে এমন কবিতা লিখতে পারে তাকে আরো একবার ভালো করে দেখতে চাই। যদিও ওর কাছে বসে দেহ পরীক্ষা করেছিলাম, কিন্তু চেহারার দিকে বা মুখের দিকে ভালো করে চাই নি।

সে শ্যামবর্ণা। যাকে বলে কালো চামড়ার মেয়ে। তা হোক, লাল আমের চেয়ে কালো আম যে প্রায়ই বেশী মিষ্টি হয়, এ অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্টই হয়েছে। কিন্তু ওর চেহারাটাও খুব রোগা, নিতান্ত শুকিয়ে যাবার মতো। বোধ হয় ভালো খাদ্য ও যত্নের অভাবে যৌবনকালের স্বাভাবিক সৌষ্ঠবটুকুও ফুটে ওঠবার অবকাশ পায় নি। কিংবা হয়তো ওর গড়নটাই এমনি। মনের দিকটাই খোরাক পেয়ে লতার মতো লতিয়ে অনেকখানি উপরে উঠে গেছে, আর দেহের দিকটা সেই কাব্যলোকসঞ্চারী অসাধারণ মনের নাগাল না ধরতে পেরে থতমত খেয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষরা অতি অদ্ভুত প্রকৃতির, অদ্ভুত আমাদের প্রত্যাশা আর মনের ধারণা। কারো কবিতা পড়লেই তৎক্ষণাৎ ধারণা করে

নিই যে, তার চেহারাটাও ওরই মতো সুন্দর হবে, কাব্যের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যাবে। কোনো গল্প উপন্যাস পড়ে মনে করি, লেখকের চেহারাটিও নিশ্চয় সেই গল্পের নায়কের মতো সপ্রতিভ হবে। কারো ভালো চেহারা দেখে মনে করি তার কণ্ঠস্বরটিও তেমনি সুন্দর হবে, খারাপ চেহারা দেখে মনে করি তার কণ্ঠস্বর কর্কশ হবে। এইভাবে আমরা কাজ দেখে চেহারার বিচার করি, চেহারা দেখে কাজের বিচার করি, আর কাজের সঙ্গে চেহারার মিল সর্বদাই প্রত্যাশা করি। তা নেই দেখলেই আমরা যেন ভারি ক্ষুণ্ণ হই। যে সুন্দর কবিতা লিখবে, তার চেহারাটাও তেমনি হবে, এই আমাদের দৃঢ় ধারণা।

মেয়েটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু উল্লেখযোগ্য নেই। তখন মনে করলাম, একটু কথা বলে দেখা যাক।

জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার কি নাম?"

অতি মৃদু স্বরে এবার সে বললে—"কমল।"

"শুধুই কমল, না কমলরাণী?"

সে কোনো জবাব দিলে না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"খাতার এই সব কবিতা তোমার নিজের লেখা?"

সে এ কথার কোনো জবাব দিলে না, চুপ করে তেম্‌নি চেয়ে রইল।

"এমন সব সুন্দর সুন্দর কবিতা তুমি লেখ কেমন করে?"

এ কথারও সে কোনো জবাব দিলে না, আগের মতো শুধু চেয়ে রইল।

"খাতাটা আমি একবার নিয়ে যেতে পারি? বাড়ি গিয়ে পড়বো।"

সে কেবল ঘাড় নেড়ে তাতে সম্মতি দিলে। তারপর তেমনি চেয়েই রইল।

তখন আমি ওর ঐ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চাওয়ার মধ্যে একটা নতুন কিছু জিনিসের যেন সন্ধান পেলাম। 'কিন্তু সে যে কি জিনিস তা আমি বোঝাতে পারব না। তেমন কোনো উপযুক্ত রকমের উপমা আমার মাথায় আসছে না। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে তার চোখ দুটি পার্থিব, কিন্তু ওর ভিতরকার সজল দৃষ্টিটুকু অপার্থিব। সে দৃষ্টি যেন পৃথিবীর স্থূল জিনিসগুলোর মধ্যেই কোনো অপার্থিবের সন্ধান পাচ্ছে। যা সে দেখছে তা মুখ দিয়ে বলার নয়।

কিন্তু কথা কিছু ওকে বলাতেই হবে। আমি ওর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। তাই এবার স্থূল রকমের নানাবিধ প্রশ্ন করতে থাকলাম, যার জবাব না দিলেই নয়। ওদের দেশ কোথায়, বাবার নাম কি, কতদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে ইত্যাদি। অসংকোচে সব কথারই সে জবাব দিলে।

ওর কাছেই শুনলাম, ঘাটশিলায় ওদের বাড়ি আছে। ওর বাবা সেখানেই চিরদিন থাকতেন। ম্যাট্রিক পাশ করার পরে আই. এ. পড়তে পড়তে বিয়ে হবার পরে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে। স্বামীও ঘাটশিলাতেই সামান্য কি একটা চাকরি করতেন। স্বদেশী-হাঙ্গামায় মেতে তিনি এখন জেলে, তাই এই দুরবস্থা।

এর পর থেকে প্রায়ই আমি কমলকে দেখতে যেতাম। শীঘ্রই সে সুস্থ হয়ে উঠল। তার সঙ্গে বেশ আলাপও জমে উঠল। এমনিতেই সে খুব কম কথা বলতো। কিন্তু যেটুকু বলতো তাতেই বুঝতে পারতাম যে, আমাকে সে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করছে, আত্মীয়ের মতো মনে করছে। ওষুধপত্র এবং জোরালো টনিক প্রভৃতি সবই আমি দিচ্ছিলাম, ওদের কেনবার সামর্থ্য ছিল না। তা ছাড়া অন্যান্য নানারকম সাহায্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ক্রমে ক্রমে এমন এক আত্মীয়তা জন্মে গেল যে, সেই সব সাহায্য আমার কাছে নিতে এবং চাইতেও সে দ্বিধা করতো না। আমি ওর আপনজনের মতো হয়ে গেলাম।

মাঝে মাঝে ও নতুন নতুন কবিতা লিখতো, এবং লিখলেই তা আমাকে পড়তে পাঠিয়ে দিতো।

একদিন ওকে বললাম—"ডাক্তারের মনস্তত্ত্ব নিয়ে একটা কবিতা লিখতে পারো? তাহলে বুঝি তুমি বাহাদুর।"

সে একটু হেসে বললে—"বিয়ের জন্যে ফরমাসী পদ্য লেখার মতো? তা আমি পারি না। জোর করে চেষ্টা করে লিখতে বসলে কোনো কিছুই লিখতে পারি না। আপনা থেকে যখন যেটা মনে চাপ দিতে থাকে তাই লিখে ফেলি। ওতে আমার নিজের কোনো হাত নেই।"

কিছুকাল পরে ওর স্বামী জেল থেকে ছাড়া পেলেন, ওরা তখন হাওড়া থেকে বাসা উঠিয়ে ঘাটশিলায় চলে গেল।

কিছুদিন বাদেই কমল সেখান থেকে আমায় নিমন্ত্রণ করে পাঠালে। লিখলে যে—এখানকার জলহাওয়া এখন খুব ভালো, কিছুদিনের জন্যে এখানে এসে বিশ্রাম নিয়ে যান। থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।

আমারও হাতে তখন বিশেষ কিছু কাজ ছিল না। তাই কয়েকদিনের জন্যে সেখানেই চলে গেলাম। জায়গাটি খুবই মনোরম। সুবর্ণরেখা নদী থেকে একটি খাল বেরিয়ে এসেছে, তার পাশেই ওদের বাড়ি। মাটির বাড়ি, মাটির ঘর, খড়ের চাল। নিম্নবিত্ত গৃহস্থ, টেনেটুনে সংসার চলে।

কিন্তু ওরা আমাকে পরম যত্নের সঙ্গে সেখানে রাখলে। কমল ও তার স্বামী সর্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো, যেন সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বসে আমার সঙ্গে গল্প করতো, কিছুতে শুতে যেতো না।

আমি ওখানে একটি বন্দুক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম ওখানকার বনে অনেক পাখি মিলবে, শিকার করার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু কমলের ইচ্ছা নয় যে আমি প্রাণীহত্যা করি। বেশী কিছু বলতে পারতো না, মৃদু স্বরে দু-একবার নিজের আপত্তি জানাতো। কোনো পাখি মেরে বাড়িতে আনলেই তার চোখ মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারতাম, সে মনে খুব কষ্ট পাচ্ছে। একদিন একটা পাখিকে তাগ্ করে গুলি ছুঁড়তে গিয়ে আমার আঙুলটা হঠাৎ ট্রিগারের নীচে পড়ে চিপ্টে গেল। সমস্ত দিন খুব যন্ত্রণা হতে থাকল। কমল তখন সাহস পেয়ে মুখ ফুটে বললে—"দেখছেন তো, শিকার করতে গিয়ে আপনার বিঘ্ন আসছে। আপনার কাজই হলো প্রাণ রক্ষা করা, তাই প্রাণ নষ্ট করা আপনার সইবে না। বন্দুক নিয়ে শিকার করা আপনি ছেড়ে দিন।" তার পরে আর আমি বন্দুক নিয়ে বেরোতাম না।

ওখানে থাকতে আরো কয়েকজন সঙ্গী জুটে গেল। আমাদের বাংলাদেশের যাদুকর লেখক বিভূতিবাবু, ব্যারিষ্টার নীরদ দাসগুপ্ত, এবং তাঁর স্ত্রী। সকলে মিলে আমরা নদীর ধারে বেড়াতে যেতাম, পাহাড়ে উঠতাম, জ্যোৎস্না থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে বসে গান শুনতাম এবং গান গাইতাম, গভীর শালবনের মধ্যে ঢুকে বনভোজন করতাম। বিভূতিবাবু একদিন বললেন, গাছে উঠে বসে কমলের নিজের কবিতা শুনতে হবে। গাছের উপর চড়ে ওঠা হলো। কমল একটি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করলে, তার কয়েক লাইন এখনও মনে আছে—

"বসন্তে কি এলে তুমি আনন্দ হে আনন্দ,
ঝরা পাতার বনে তোমার বাজে চরণ ছন্দ।
জরায় মলিন ধরার দেশে
এলে মরণ-হরণ বেশে,
তোমার পরশ নিল মেখে শালের ফুলের সুগন্ধ,
আনন্দ হে আনন্দ।"

বিভূতিবাবু বললেন, কমল অন্য সব কবিদের মতো কাব্য ফলাবার জন্যে কবিতা লেখে না, সে লেখে নিজের প্রাণের তাগিদে।

একদিন আমরা হেঁটে বেড়াতে গেলাম গালুডি। ব্যারিষ্টার দাসগুপ্ত সেখানে ছিলেন, তিনি সেখানে পাহাড়ের উপর এক বাড়ি তৈরি করেছেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকেন। নদীর পাশে, পাহাড়ের গায়ে, শালবনে ঘেরা, চমৎকার নির্জন জায়গাটি। সে জায়গাটি দেখে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল, আমি সেখানে খানিকটা জমি কিনে ফেললাম। মনে মনে সংকল্প করে রাখলাম, ছোটো একটি বাড়ি তৈরি করে নেওয়া যাবে। ফাঁক পেলেই দু-চার দিন সেখানে থেকে আসবো। কমল ওখানে থাকবেই, তার কাছ থেকে নতুন নতুন কবিতা শোনা যাবে।

গালুডি থেকে ফিরবার সময় হেঁটে আসা গেল না, গরুর গাড়ি ভাড়া করে এলাম। পাহাড়ের চড়াই রাস্তায় অতটা পথ এসে গরুগুলিও খুব হাঁপিয়ে পড়েছিল। কমল তাড়াতাড়ি কচি ঘাস এনে তাদের খাওয়ালে।

কয়েকদিন পরেই কলকাতায় ফিরে এলাম।

কিছুকাল বাদে কমল আমার কাছে পর পর দুটি কবিতা লিখে পাঠালে। তার মধ্যে একটি হলো ক্ষুধার্তকে খাওয়ানোর কথা। ঘাড়ে জোয়াল আঁটা ক্ষুধার্ত গরু কাতর নয়নে চেয়ে আছে, সামনে রয়েছে সবুজ তৃণ, কিন্তু একটু এগিয়ে গিয়ে তা খাবার উপায় নেই। একটি অজানা মেয়ে তাই দেখতে পেয়ে তৃণগুলি ছিঁড়ে এনে তাকে খাওয়ালে, গরুর চোখ দুটিতে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। কবিতা পড়ে আমার মনে পড়ে গেল, গালুডি থেকে আমাদের সেই ফেরবার দিনের কথা। গাড়ির গরু দুটি কাতর হয়ে হাঁপাচ্ছে দেখে সেদিন পাশ থেকে কমল তাড়াতাড়ি কতকগুলি ঘাস ছিঁড়ে এনে দিয়েছিল। সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কমল সেটি ভোলে নি।

দ্বিতীয় কবিতাটি প্রেমের কবিতার মতো। বিদেশী পথিক কোন সুদূর সমুদ্রপার থেকে এলো, কয়েক প্রহর মাত্র থেকেই চলে গেল, প্রাণে দিয়ে গেল এক নতুন রকমের সৌরভ, মাথায় গুঁজে দিয়ে গেল এক নতুন রকমের ফুল। তার কোনো কিছুই চিহ্ন রইল না, রয়ে গেল কেবল শুকিয়ে যাওয়া ফুলটি। আমার সেটি পড়েই স্মরণ হয়ে গেল, একদিন শালবনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক নতুন রকমের ফুল দেখেছিলাম, সেটি তুলে এনে ওর মাথায় গুঁজে দিয়েছিলাম। কবির মন তাই নিয়েই সুন্দর এক কাব্য রচনা করেছে।

আরো মাস কতক পরের কথা।

একদিন খুব ভোরে কমলের স্বামী আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। বরাবর ঘাটশিলা থেকে আসছেন, মুখের ভাব খুব উদ্বিগ্ন। খবর নিয়ে

জানলাম, কমলের প্রবল জ্বর, ওখানকার ডাক্তাররা বলছে মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে। তার প্রায় বেহুঁশ অবস্থা, কোনো ওষুধপত্র খাওয়ানো যাচ্ছে না। আমাকে এখনই সেখানে যেতে হবে, নইলে তাকে বাঁচানো যাবে না।

তখনই আমি তৈরি হয়ে নিলাম। নিজের মাইক্রস্কোপটি আর ব্যাগটি নিলাম সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, বাস্তবিকই গুরুতর ব্যাপার। কমল আমাকে দেখে তখনই চিনলে, কিন্তু কথা বলতে পারলে না। তখনই আমি তার রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে গেলাম।

রক্ত পরীক্ষায় জানা গেল মেনিঞ্জাইটিস নয়, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া। তৎক্ষণাৎ ডবল মাত্রায় একটি কুইনিন ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম।

পরের দিন সকালেই জ্বর ছেড়ে গেল, কমল সুস্থ হয়ে উঠল।

তাকে সুস্থ দেখে আমি বললাম, আজই ফিরে যেতে চাই। ট্রেন তো সেই রাত্রে। তোমার কবিতার খাতাগুলি আনাও, কি কি নতুন লিখেছ দেখি।

এ কথার জবাবে যা শুনলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কবিতার খাতা একখানিও নেই। সুবর্ণরেখায় এক রাত্রে হঠাৎ বান এসেছিল, বানের জল বাড়ির মধ্যে ঢুকে অনেক কিছু জিনিসপত্র সমেত খাতাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সেগুলি ছিল এক ট্রাঙ্কের উপর।

অতঃপর আরো প্রায় বছর খানেক পরের কথা।

কমলের স্বামী ঘাটশিলার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এক চাকরি পেয়ে কমলকে নিয়ে এখানেই চলে এলো। ওরা কখনো থাকতো এক বাসা বাড়িতে, আবার কখনো চলে যেতো হাওড়াতে। আমি খবর পেয়ে কয়েকবার ওদের বাসায় গিয়ে দেখাও করে এলাম।

কমল কখনো বা নিজেই আমার কাছে আসতো, আর নতুন কিছু কবিতা লিখলে কখনো বা তা আমার কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিতো।

একবার খামের মধ্যে এক কবিতা পাঠালে, তখন আমি নানা কাজে খুব ব্যস্ত। সেটি না পড়েই ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলাম, সময়ান্তরে পড়বো বলে।

এর কয়েকদিন পরেই কমলের স্বামী এসে বললে—"কমলের আবার সেই মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে। চলুন একবার, আপনি গেলেই ও সেরে ওঠে।"

এবার কিন্তু দেখেই বুঝলাম, এ প্রকৃত মেনিঞ্জাইটিস। ঠিক মেনিঞ্জাইটিস নয়, তার চেয়েও খারাপ, এন্‌কেফালাইটিস। মেনিঞ্জাইটিসের জীবাণুর চেয়েও

সূক্ষ্মতর এক মারাত্মক ভাইরাসের সংক্রমণ, এপিডেমিক ভাবে দেখা দেয়। প্রথমে মনে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা, তারপর মস্তিষ্ক আক্রমণ করে। সম্পূর্ণ অচেতন করে না, জড়ের মতো করে দেয়। কমল অনেক ডাকাডাকির পর আমার দিকে চাইলে। চিনলে কিনা বোঝা গেল না, এক বিকৃত রকমের হাসি হেসে বললে—"সেইখানেই যাচ্ছি!"

আমি ছাড়া অন্য একজন ডাক্তারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, এখনই লাম্বার পাংচার করা উচিত। আমার মনে পড়ে গেল সেই পুলিস হাসপাতালের মেনিঞ্জাইটিস রোগীকে অনর্থক খোঁচাখুঁচির করার কথা। আমি বললাম, তাতে কোনো লাভ হবে না, তার চেয়ে শিরার মধ্যে ইউরোট্রোপিন ইনজেকশন দিয়ে দেখুন। ফল হতে পারে।

পরের দিনেই খবর পেলাম কমল মারা গেছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ড্রয়ারের মধ্যে তার কবিতা রয়েছে, এখনও পর্যন্ত আমার তা পড়াই হয় নি। সেটি বের করে তখন পড়লাম—

"মরণের মুখে দাঁড়ায়ে আমরা নবজীবনের স্বপ্ন দেখি,
অস্তরাগের ম্লান রাঙা রঙে অভ্যুদয়ের সূচনা লেখি।
ঘর ভেঙে গেছে, ভেসে গেছে সব বন্যা প্লাবনে কখনো কভু,
নতুন জীবন রচনার সাধ তখনো মেটেনি কিছুতে কভু।
নাই নাই ভয়, নাই পরাজয়, হে চিরজীবন নিত্যজয়ী—
মরণের মুখে দাঁড়ায়ে রচি' বন্দনা তব ছন্দোময়ী।"

পড়েই মনে হলো, কমল কি তবে বুঝেছিল সে মরণের মুখে দাঁড়িয়েছে? হতেও পারে, সে বুদ্ধিতে না বুঝুক অন্তরে অবগত হয়ে থাকবে। এ জাতের ফুল ফুটেই যখন ঝরে, তখন সে কি জানে যে এবার তার যাবার পালা? কোনো কোনো উৎকৃষ্ট জাতের ফুল ফুটতে না ফুটতেই যে ঝরে যায়, তারও কিছু অর্থ আছে বৈকি।

॥ বাইশ ॥

একবার একজন আমাকে একটি হীরের আংটি দিয়েছিল। সেটি এখনও কাছে রয়েছে, যখনই দেখি তখনই সে বেচারার কথা মনে পড়ে যায়।

তখন চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে প্র্যাক্‌টিস করা ছাড়াও আমি অন্য কিছু একটা কাজ খুঁজছি, যাতে আরো দু-পয়সা উপার্জন হয়। কারণ এই

প্র্যাক্‌টিসের তো কোনো স্থিরতা নেই, কোনো মাসে বেশ কিছু পেয়ে গেলাম, আবার কোনো মাস হয়তো প্রায় ফাঁকাই গেল। আর প্র্যাক্‌টিস তো সকালে সন্ধ্যায়, বাকি সময়টা বৃথা ঘরে বসে কাটাবো! কিছু লেখাপড়ার কাজ পেলে তাও করতে রাজী আছি।

অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে এ কথা আমি বলেছিলাম। কিছুদিন পরে সহৃদয় এক বড়ো ডাক্তারবন্ধু আমাকে বললেন, ডাক্তারি ওষুধের জন্যে ইংরেজীতে বাংলাতে ছোটোখাটো বিজ্ঞাপনী প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখে দিতে পারবে? তাঁরা এর জন্য মাসে একশো টাকা করে দিতে রাজী আছে। আমি বললাম, খুব পারবো, আমিও ওতে রাজী। উপরি কাজে যা কিছু মেলে।

ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেলেন খিদিরপুর অঞ্চলে ওষুধের এক কারখানায়। বাইরে যথারীতি সাইনবোর্ড প্রভৃতি দেওয়া থাকলেও তাকে ঠিক কারখানা বলা উচিত হচ্ছে না। সে একটা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ির মতো। দেখেই বোঝা গেল সেটি বহুকাল যাবৎ অযত্নে অবহেলায় খালি অবস্থায় পড়ে ছিল, সম্প্রতি তাই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। চারিদিকে অনেক গাছপালা, মাঝে মাঝে জঙ্গল হয়ে আছে। বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়ি, তার দেয়ালের গায়ে গায়ে শ্যাওলা জমে কালো হয়ে আছে। কিন্তু ভিতরটা সম্প্রতি মেরামত করা হয়েছে। তার মধ্যে আছে বাহিরবাড়ি আর ভিতর-বাড়ি, মাঝখানে উঠোন। কোনো ধনী লোকের বাগানবাড়ি ছিল, মেঝেতে আগাগোড়া মার্বেল দেওয়া। বাহিরবাড়িতে কয়েকটা লম্বা লম্বা ঘর। সেখানে লম্বা লম্বা কাঠের টেবিল পাতা রয়েছে। টেবিলগুলি নানারকম বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। সেই সব টেবিলে কয়েকজন ছোকরা কর্মী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। কারখানার বদলে ওকে ল্যাবরেটরি বলতে হয়, ওরা হলো ওখানকার ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টাণ্ট।

এ প্রতিষ্ঠানের মালিক কোনো কোম্পানি নয়, একজন মানুষ মাত্রই এর মালিক। সে একজন জার্মান রাসায়নিক, তার নাম হলো ডক্টর হেন্। সে তার নিজের ল্যাবরেটরি কামরায় ছিল, বন্ধু আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। লোকটি বেশ অমায়িক। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলে, ভালো বলতে পারে না। নিজের বক্তব্য বোঝাতে তাকে কিছু কষ্ট পেতে হয়।

সে আমাকে বোঝাতে লাগল যে টি. বি. রোগের এক নতুন ওষুধ সে আবিষ্কার করেছে। তা হলো সমুদ্রগর্ভের শৈবাল প্রভৃতি থেকে পাওয়া

আইওডিন মিশ্রিত একরকম অর্গ্যানিক ক্যালসিয়ম। সাধারণ ক্যালসিয়মের চেয়ে এটি টি. বি. রোগের পক্ষে অনেক বেশী উপকারী। জার্মানিতে এই নিয়ে বহু পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট ধরনের শৈবাল সেখানে মেলা খুব কঠিন। বঙ্গোপসাগরে তা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তাই সে তার দেশ থেকে মূলধন এনে এখানে কারখানা খুলে বসেছে। এখানে সে ঐ শৈবাল থেকে ক্যালসিয়ম সংগ্রহ করে ইন্‌জেকশনের উপযোগী করে অ্যাম্পুলের মধ্যে ভরে দিচ্ছে। এখানকার অনেক ডাক্তার ইতিমধ্যেই এর উপকারিতা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। এ ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল, কিন্তু ওষুধটির যথেষ্ট বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার হওয়া দরকার। ডাক্তারেরা সব কথা জানতে না পারলে এ ওষুধ কিনবে কেন? সুতরাং এর গুণের কথা তাদের বিশদভাবে জানাতে হবে। আমার হবে সেই কাজ। সাহেব তেমন ইংরেজী ভাষা জানে না, সে আমাকে যতটুকু পারে সাহায্য করবে, তারপর আমাকে তাই থেকে এই ওষুধের গুণাগুণ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে ইংরেজীতে ও স্থানীয় ভাষাতে গুছিয়ে লিখে দিতে হবে। সেই লেখাগুলি নানারকম পুস্তিকার দ্বারা আর নানারকম সাময়িক পত্রাদিতে বিজ্ঞাপনের দ্বারা সকলের কাছে প্রচার করতে থাকা হবে। শুধু তাই নয়, এর জন্যে কয়েকজন ক্যান্‌ভাসার নিযুক্ত করা হয়েছে, তারা ঐ সব লেখাগুলি ডাক্তারদের হাতে হাতে পৌঁছে দেবে।

সব কথা বুঝিয়ে দিয়ে সাহেব বললে—"এ খুব গুরুতর দায়িত্বের কাজ। এমন দক্ষতার সঙ্গে লেখা দরকার যাতে সে লেখা পড়লে সকলেই ওষুধটিকে বাস্তবিক উপকারী বলে বিশ্বাস করে, বোগাস্ জিনিস বলে মনে না করে। এ কাজ তুমি পারবে তো?"

"আশা করি পারবো।"

"প্রথমে তোমাকে মাসে একশো টাকা করে দেব, তারপর ভালো কাজ দেখালে আরো বেশী পাবে। এ শর্তে রাজী আছ তো?"

আমি মনে করলাম, দায়িত্বের কথাটার উপরে যখন এত বেশী ঝোঁক দিচ্ছে, তখন আমার তরফ থেকে টাকার পরিমাণটাও কিছু বাড়াবার চেষ্টা করে দেখি না। তাই বললাম—"কাজটি যেমন দায়িত্বপূর্ণ, তার তুলনায় পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা কিন্তু কম হচ্ছে।"

"তাহলে তুমি কত চাও তাই বলো।"

আমি বললাম—"অন্ততপক্ষে দেড়শো।"

সাহেব বললে—"বেশ তাই হবে। যার কাছে কাজ নেবো তাকে আমি অসন্তুষ্ট রাখতে চাই না। কিন্তু তাহলে তোমাকে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন করে বিকেলে আমার কাছে আসতে হবে। আমি যখন যা বলে দেবো সেই কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে নতুন নতুন প্রবন্ধ লিখে দেবে। এখানে বসে লিখতে হবে না, বাড়ি থেকে সুবিধামতো লিখে পাঠাবে। সেগুলি ছাপার ব্যবস্থাও তোমাকেই করতে হবে। এতে রাজী তো?"

আমি বললাম—"আনন্দের সঙ্গে রাজী।"

সাহেব আবার বললে—"তোমার যাতায়াতের জন্যে যা পেট্রল খরচ হবে তা অবশ্য তোমার নিজের লাগবে না। প্রত্যেক মাসে তুমি যা পেট্রল কিনবে তার মেমোগুলি এখানে দিলেই সে টাকা তুমি পেয়ে যাবে।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

সাহেবের মেজাজ খুব দিলদরিয়া, টাকা খরচে কিছুমাত্র কার্পণ্য নেই। কয়েকদিন মাত্র যাতায়াত করতে করতেই দেখলাম, সাহেব খরচ সম্বন্ধে মুক্তহস্ত, আর তার হাতে টাকা আছেও যথেষ্ট। দুই পকেটে টাকাকড়ি সর্বদাই ভর্তি থাকে। কেউ কিছু চাইলেই তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে বের করে দিয়ে দেয়, তার কোনো হিসেবও রাখে না।

কিন্তু যে জিনিস নিয়ে সে এত বড়ো এক ব্যবসা ফেঁদেছে, সেটি দেখলাম বাস্তবিক পক্ষে বিশেষ কিছুই নয়। বিস্তর শ্যাওলা নিয়ে তাকে বড়ো বড়ো কড়াইতে ফেলে জলের মধ্যে সিদ্ধ করা হয়। তারপর সেই শ্যাওলাসিদ্ধ জল নিয়ে ডিস্‌টিল্ করা হয়। সমস্ত জল পরিশ্রুত হয়ে বেরিয়ে গেলে সামান্য একটুখানি সাদা গুঁড়োর মতো পড়ে থাকে। তার মধ্যে যে কতটুকু কি থাকে তা বলতে পারি না। কিন্তু বাইরের থেকে আমদানি করা এবং স্থানীয় বাজার থেকেও কিনে আনা প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের সঙ্গে সেই সামান্য একটু গুঁড়া মিশিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। তার পর সেই ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট দিয়ে সলিউশন প্রস্তুত করে এবং স্টেরিলাইজ করে তাকে ইন্‌জেকশনের অ্যাম্পুলের মধ্যে ভরা হয়। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তা সাধারণ ক্যালসিয়ম গ্লুকোনেট ছাড়া আর কিছুই নয়। মিছেই ওকে নতুন রকমের অর্গ্যানিক ক্যালসিয়ম বলে সকলকে প্রতারণা করা হচ্ছে। সাধারণ ক্যালসিয়ম থেকে যেটুকু ফল মেলে ওতে তা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

তবে অবশ্য লোকের বিশ্বাস হলো অন্যরকম জিনিস। আমাদের দেশের ডাক্তারদের যদি বিশ্বাস জন্মে যায় যে সাধারণ ক্যালসিয়মের চেয়ে এতে আরো

বেশী উপকার মিলবে, তাহলে আর কোনো কথা নেই, এর প্রচুর কাটতি নিশ্চয়ই হবে। বিশেষত তখনকার দিনে, যখন টি. বি. রোগের চিকিৎসায় ক্যালসিয়ম হলো ডাক্তারদের এক প্রধান অবলম্বন।

যাই হোক, আমার কাজ কি এত কথা চিন্তা করে। আমার যেটুকু কর্তব্য তাই আমি করতে লাগলাম। কিন্তু হেন্ সাহেবের কাছ থেকে তার জন্যে বিশেষ কিছুই সাহায্য পেলাম না। সে হলো একজন রাসায়নিক মাত্র, ডাক্তারি বিদ্যার দিক দিয়ে কিছুই জানে না। এবং তাও যা কিছু সে আবোল-তাবোল বলে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, তার কোনো সুযুক্তিপূর্ণ অর্থই হয় না। সে সব অসঙ্গত কথা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসাবে লেখাও যায় না। তাহলে এখানকার সুচতুর ডাক্তারের দল অমনি চেপে ধরবে, সব কথাই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করবে।

কাজেই আমি নিজের বিদ্যায় যতটুকু পারি, ক্যালসিয়মের গুণগান লিখতে শুরু করলাম। ক্যালসিয়ম টি. বি. রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। এবং তা এই হিসাবে যে, ক্যালসিয়ম রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ভিতরকার সমস্ত ক্ষত-গুলিকে ভরাট করে দিতে থাকে। রোগের জীবাণুকে না মারতে পারলেও সে রোগটিকে আর অগ্রসর হতে দেয় না। তা ছাড়া ক্যালসিয়ম রক্তকে সমৃদ্ধ করে, হাড়গুলিকে শক্ত করে, দেহের পুষ্টি করে, সমস্ত নার্ভগুলিকে সতেজ ও সবল করে, এমন কি টনিকের মতো কাজের দ্বারা হার্টকে পর্যন্ত সবল করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এই ক্যালসিয়মের মতো উপকারী জিনিস ডাক্তারি-শাস্ত্রে আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এর প্রয়োগে দেহের কখনই কোনো ক্ষতি করে না। এমন কি অধিক মাত্রায় প্রয়োগেও এতে কোনো অনিষ্ট নেই, কারণ রক্তের যতটুকু প্রয়োজন হবে ততটুকুই সে নেবে, বাকিটা শরীর থেকে আপনি বেরিয়ে যাবে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সকল কথাই আমি লিখে দিতাম। ডক্টর হেন্ সেগুলো পড়েও দেখত না। আর পড়লেও সে বুঝতে পারতো কিনা সন্দেহ। সে কেবল দেখতো যে তার ওষুধের কাটতি হচ্ছে কিনা। কিন্তু এত রকমের বিজ্ঞাপন প্রচার হতে থাকলে তার ফলে কাটতি কিছু হবেই। বিজ্ঞাপনে কি না হয়। সুতরাং তাতেই সাহেব খুশি থাকতো।

সপ্তাহে তিন বার কেন, প্রায়ই আমি সেখানে যেতাম। পেট্রলের খরচটি পর্যন্ত যখন লাগছে না, তখন বিকেলে একবার করে বেড়িয়ে আসতে আমার আপত্তি কি আছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে কেবল বসে থাকা আর আড্ডা

দেওয়াই হতো, কাজ কিছু হতো না। আমার সঙ্গে কথা বলতে সাহেবের সময়ই হতো না, সে নিজের কি সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকতো। তার ঘরে গেলেই বলতো—"বসো ডাক্তার, আমি একটু ব্যস্ত আছি।" তার পর আর কোনো কথা নেই। আমি চুপচাপ বসে বসে দেখতাম, সে কিরকম সব দুর্বোধ্য যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। একদিন দেখলাম, ছোটো একটা রেডিও মতো, তাতে টেলিগ্রাফের শব্দের মতো টক্‌টক্ করে শব্দ হচ্ছে, আর সাহেব একটা কাগজে দ্রুতগতিতে কি সব লিখে যাচ্ছে। আর একদিন দেখলাম, সাহেব জার্মান ভাষাতে লম্বা লম্বা চিঠি টাইপ করছে, তার এক একটা শব্দ কাগজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা। কখনো দেখতাম, জার্মান ভাষার মোটা মোটা বই খুলে অভিনিবেশের সঙ্গে তার মধ্যে ঝুঁকে রয়েছে।

বিকেলে প্রত্যহই একটি হাস্যময়ী লাস্যময়ী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবতী এসে সাহেবের ঘরের মধ্যে হাজির হতো। দেখেই মনে হতো সাহেবের সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। অথচ সে সাহেবকে একটু ভয়ও করে। সেণ্টের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে কখনো বা গুনগুন করে গান করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে যেমনি সে দেখতো যে সাহেব গম্ভীর হয়ে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, অমনি সে থমকে দাঁড়িয়ে যেতো, তারপর খুব নিরীহ গলায় বলতো—"ওঠো, এবার চা খেতে যাবে না?"

সাহেব তার কাজ থেকে মুখ না তুলেই বলতো—"পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।" মেয়েটি তখন ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরবাড়ির দিকে চলে যেতো।

প্রথম কয়েকদিন এইরকম চলল। তার পর হৃদ্যতা বেড়ে যেতে তখন মেমসাহেব এসে চা খেতে ডাকলেই ডক্টর হেন্ তাকে বলতে শুরু করলে—"তুমি ডাক্তারকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াও, গল্পসল্প করোগে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।"

তাই প্রত্যহই আমি চায়ে নিমন্ত্রিত হতে লাগলাম। ভিতরবাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মেমসাহেব আমাকে বসাতো। সেখানেই সাহেবের খানাপিনার জায়গা। মেমসাহেব আমাকে কোনোদিন বা চা আর কোনোদিন বা কফি তৈরি করে খাওয়াতো, সঙ্গে থাকতো দামী দামী কেক, বিস্কুট ও নানারকম ফল। খাওয়া শেষ হলে আমার দিকে এগিয়ে দিতো দামী ইজিপ্‌শিয়ান সিগারেটের কৌটো।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার কেটে গেলেও

সাহেবের দেখা মিলতো না। অতক্ষণ চুপ করে বসে থাকা যায় না। কাজেই আমরা নানারকম কথাবার্তা শুরু করে দিতাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের চেনা পরিচয় হয়ে গেল। বেশ আলাপ জমে উঠলো। তখন সব কথা জানতে পারলাম।

মেয়েটি আচারে ব্যবহারে দস্তুরমত অ্যাংলো, কিন্তু তার গায়ের রংটি ইণ্ডিয়ান। সে একজন টেলিফোন গার্ল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে, তার পর থেকে তার ছুটি। সে থাকে বাপ মায়ের সঙ্গে। রোজ বিকেলে এখানে আসে, রাত্রে বাড়ি চলে যায়। সাহেবের সে ফিঁয়াসে। এন্‌গেজমেণ্ট পাকা হয়ে গেছে, শীঘ্রই ওদের বিয়ে হবে। সাহেব ওকে অত্যন্ত বেশিরকম ভালোবাসে, বিশেষ করে ওর এই ইণ্ডিয়ান ধরনের গায়ের রংটি। সাদা ফ্যাকাশে রং সাহেব দুচক্ষে দেখতে পারে না।

সাহেব নাকি বলেছে যে বিয়ের পরে ওকে জার্মানিতে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, অনেক দামী দামী গহনাও কিনে দিয়েছে। এক একদিন এক একটা সে পরে আসতো, আর আমাকে সেগুলো দেখাতো। হাতের জড়োয়া ব্যাঙ্গল, কানে হীরের দুল, গলায় দামী মুক্তোর হার। সাহেব পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে, তাই সে সর্বদাই ফিট্‌ফাট হয়ে থাকে। মোটের উপর আসন্ন বিয়ের প্রত্যাশা নিয়ে মেমসাহেব খুব আনন্দে আছে।

ডক্টর হেনের বাগ্‌দত্তা তরুণী, তাই আমার সঙ্গে তার একটা রসিকতার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেল। সেও আমাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো, আমিও তার পাল্টা জবাব দিতাম। যেমন, একদিন সে বললে—"ডাক্তার, আজ বেজায় গরম পড়েছে। রোজ তো কেবল চা-ই খাচ্ছ, আজ একটু হুইস্কি সোডা এনে দিই, কি বলো?"

"মাপ করো মেমসাহেব, আমি ও রসে বঞ্চিত।"

"বেশি নয়, সামান্য একটু? একটও কখনো খাও নি, এ তো হতে পারে না। জানো তো, মেয়েরা অফার করলে এক চুমুক অন্তত খেতে হয়, নইলে তাদের অপমান করা হয়।"

"মাপ করো মেমসাহেব, আমার ধাতে ও জিনিস সয় না। বরং তুমি খাও, আমি দেখি।"

"সে কি, এ জিনিস একটুও না খেয়ে তুমি ডাক্তারি করো কেমন করে? যা নিজে কখনো খেয়ে দেখ নি, তা অপরকে দাও কেমন করে?"

"তাই তো ব্যবসার নিয়ম, নিজে খাবে না কিন্তু অপরকে খাওয়াবে। আমাদের দেশে কথাই আছে যে ময়রা কখনো সন্দেশ খায় না।"

"তার মানে কি হলো? কথার তাৎপর্য কি?"

"তাৎপর্য এই যে ময়রা নিজেই যদি খেতে শুরু করে, তাহলে তার ব্যবসাতে লাভ হবে কেমন করে? তাই সেখানে নিয়ম এই যে ময়রা নিজে সন্দেশ মোটে ছোঁবে না, আর সবাইকে বলবে কিনে খাও।"

"ওহো, বুঝেছি বুঝেছি,—তুমি বুঝি তোমার রোগীদের হুইস্কি খেতে দাও? খুব ভালো ডাক্তার তো তাহলে!"

"ঠিক হুইস্কি খেতে দিই না, তবে দরকার হলে ব্রাণ্ডি খেতে দিই, ষ্টিমুল্যাণ্ট হিসেবে। কিন্তু আজকাল ওর চেয়েও ভালো ষ্টিমুল্যাণ্ট বেরিয়ে গেছে, তাই এখন ওর বদলে সেইগুলোই দিই।"

"কিন্তু অনেক ডাক্তারই হুইস্কি খেয়ে থাকে, আমি জানি।"

"তুমি যাদের জানো তারা হয়তো খায়, কিন্তু আমি তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ডাক্তারকে জানি, তারা খায় না।"

"অর্থাৎ তুমি খাবে না? আমার অনুরোধটা রাখবে না?"

"দাও, তোমার অফার আমি হাত পেতে নিচ্ছি, তাহলেই তো খাওয়া হলো।"

"তুমি ভারি চালাক, আমার চেয়েও চালাক।"

একদিন ওখানে গেছি প্যাণ্টকোটের বদলে কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবি পরে, তার কারণ সেদিন একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ ছিল। ওদের ওখান থেকে ঘুরে সেইখানে যাবো। মেমসাহেব আমাকে দেখেই হাততালি দিয়ে বলে উঠল—"বাঃ, তোমাকে আজ সুন্দর ছোকরাটির মতো দেখাচ্ছে, এই পোষাকে দশ বছর বয়স কমে গেছে। প্যাণ্টকোট পরলে তোমাকে মনে হয় কাঠখোট্টা ডাক্তার একজন, আর এতে মনে হচ্ছে পুরোদস্তর জেণ্টলম্যান।"

আমি বললাম—"কিন্তু তোমরা তো সাহেবী পোষাকই পছন্দ করো।"

"সব সময় তা নয়। কাউকে কাউকে ইণ্ডিয়ান পোষাকে বেশী ভালো দেখায়। জানো, আমিও এক একদিন এখানে শাড়ি পরে আসি, সাহেবের খুব ভালো লাগে তাই দেখতে। সাহেবকে বলেছি, যখন জার্মানিতে যাবো তখন সব সময় শাড়ি পরে থাকবো।"

"তাহলে এখন থেকেই ও পোষাক ছেড়ে তাই পরো না কেন?"

"দূর বোকা, তোমার কিছু বুদ্ধি নেই। ইণ্ডিয়াতে ইণ্ডিয়ান পোষাকের চেয়ে এই পোষাকের কদর বেশী, আবার ইউরোপে তার ঠিক উল্টো। তাই আমি সেখানে গিয়ে তাই পরবো, এখানে এই পরবো। শাড়ি পরলেই এখানে সবাই আমাকে বলবে ইণ্ডিয়ান, আর অমনি আমার চাকরিতে মাইনে কমে যাবে। সাহেবী পোষাকের মাইনে আলাদা, দেশী শাড়ির মাইনে আলাদা। সে কথাটি ভুললে চলবে কেন?"

এই ভাবে আমাদের মধ্যে হাল্কা কথাবার্তা ও রহস্যালাপ চলতো। পরিপূর্ণ যৌবনের সমস্ত নবীনতা নিয়ে ওর সেই ঝক্‌মকে চেহারা; ঠোঁটে রঙ, গালে রঙ, আঙুলের আধ-ইঞ্চি লম্বা লম্বা নখে পর্যন্ত রঙ লাগানো, ভুরুতে কাজল টানা, বব্ করা কোঁকড়ানো কেশগুচ্ছের ঝম্পন ও কম্পন সহকারে থেকে থেকে মাথা ঘোরানো, আর ওর কুন্দ শুভ্র দাঁতগুলির শোভা দেখিয়ে থেমে থেমে সুস্পষ্ট ইংরেজী উচ্চারণের মিঠে বুলি, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসে ওর সঙ্গে রহস্যালাপ করতে আমার মন্দ লাগতো না। কিন্তু এ সবই তো বাইরের জিনিস। শুধু এর জন্যেই কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করা যায় না, যদি ভিতরে কিছু না থাকে। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ওর ভিতরে নিশ্চয় কিছু আছে, যদিও তা আমার কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। নইলে সাহেব ওকে এতখানি পছন্দ করেছে কেন, বিয়েই বা করতে চেয়েছে কেন? শুধু চেক্‌নাই দেখেই নয়, তার চেয়েও কিছু মিষ্টিতর জিনিস ওর হৃদয়ের মধ্যে আছে, এই আমি ধরে নিয়েছিলাম। নইলে তার সঙ্গে এতটা মিশতাম না।

তিন মাস পর্যন্ত এই ভাবে বেশ চলে যাচ্ছিল। তার পরে হঠাৎ সব কিছু ভেস্তে গেল। ইউরোপে দ্বিতীয় জার্মন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই ডক্টর হেনের কাছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট থেকে চিঠি এলো যে, তুমি শত্রুপক্ষীয়, অতএব ব্যাঙ্কে তোমার যা কিছু টাকা আছে সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা হলো। তোমার কারখানাও বাজেয়াপ্ত করা হলো, সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে তুমি অপেক্ষা করো, শীঘ্রই তোমায় অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হবে।

এ তো হবেই। যুদ্ধ যখন বেধেছে তখন প্রত্যেক জার্মন প্রজার কাছেই এটি প্রত্যাশিত। কিন্তু ডক্টর হেন্ যেন পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করেল। তার জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সমস্তই একে একে বেচতে শুরু করলে, যা বিক্রি না হলো তা এমনিই দিয়ে দিলে। একটি খুব দামী রেডিও আর অনেক দামী দামী ফার্নিচার সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটি লরিতে উঠিয়ে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। ভালো একটি কুকুর ছিল, তাও সে

নিয়ে গেল। তাও না হয় বুঝলাম যে এখানকার গভর্নমেণ্টের লোক এসে ওর দামী দামী ভালো জিনিসগুলি না হাতাতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা। কিন্তু সাহেব অমন উন্মাদের মতো আচরণ করছে কেন? সে কারো সঙ্গে কথা বলছে না, চোখ দুটো সর্বদাই জবাফুলের মতো লাল। খাবার সময় কিছু খাচ্ছে না পর্যন্ত, যেন তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। এতটা বিচলিত হবার কি কারণ?

একদিন সাহেবকে আমি বললাম—"এমন অস্থির হয়ে উঠছ কেন? এতে যে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এ এমন কিছু মারাত্মক বিপদ নয়। যুদ্ধের সময় এমন হয়েই থাকে, থামলেই আগের মতো হবে।"

সাহেব পাগলের মতো দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললে—"তুমি বুঝবে না, সত্যিই আমার অতি মারাত্মক বিপদ। এ দেশে একজনও আমার বন্ধু নেই, সবাই শত্রু। কাউকেই আমার আসল বিপদের কথা বলা যায় না।"

আমি বললাম—"কেউ না থাক, অন্তত আমি তোমার বন্ধু। আমাকে তুমি অনায়াসে বলতে পারো, আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কাউকে সে কথা আমি বলবো না, আর যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করবো।"

তখন সাহেব বলল—"সে বড়ো ভয়ানক কথা, চলো আমার অফিস ঘরে।" সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে দরজায় সে খিল এঁটে দিলে।

তখন শুনলাম, সে একজন জার্মন গুপ্তচর। শুধু তাই নয়, হিটলারের স্ত্রী ইভা ব্রনের সে নাকি কোনোরকম আত্মীয়। এখানকার সব কিছু খবরাখবর জানাবার জন্যেই তাকে এখানে পাঠানো হয়েছিল। সে রাসায়নিক ছিল, তাই এখানে এমনি এক ওষুধের কারখানা তৈরি করে রাখতে তাকে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হয়েছিল, যাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের চোখে ধূলো দিয়ে এখানে সে নির্বিবাদে থাকতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন আটক করে রাখলেই ওর সর্বনাশ, নিশ্চয় একদিন সব কথা জানাজানি হয়ে যাবে। আর স্পাই বলে জানতে পারলেই তৎক্ষণাৎ ওকে গুলি করে মারা হবে। তাই সময় থাকতে ও পালিয়ে যেতে চায়, অথচ তার কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। রাস্তায় নিশ্চয় পুলিস পাহারা দিচ্ছে, রাস্তায় বেরোলেই ওকে ধরবে। ঘর থেকে তাই বেরোতে পর্যন্ত ও সাহস করছে না।

আমি ভেবেচিন্তে দেখলাম যে, ব্যাপারটা যদিও বাস্তবিক খুবই মারাত্মক, কিন্তু সাহেবের এখনকার ভয়টা অত্যন্ত অহেতুক। কেউ তো ওকে এখনও স্পাই বলে জানে না, সুতরাং পুলিস পাহারা থাকবে কেন? আমি অন্তত যতবার যাতায়াত করছি, কোনো পুলিসকে ওর বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখিনি।

আমি বললাম—"চলো তুমি আমার সঙ্গে, মার্কেটে বেড়িয়ে আসি, যদি কেউ তোমাকে সন্দেহ করে বা ধরতে আসে তার জন্যে আমি দায়ী।"

সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেড়িয়ে আনলাম। কেউ আমাদের দিকে চাইলেও না। আর চেহারা দেখে ও জার্মন কি ইংরেজ, সে কথাই বা কেউ বুঝবে কেমন করে? গ্রেপ্তারের পরোয়ানা না আসা পর্যন্ত ওর কোনোই ভাবনা নেই, অনায়াসেই ও সর্বত্র ঘোরাঘুরি করতে পারে। সে কথা ওকে বুঝিয়ে বললাম। আমার কাছে আশ্বাস পেয়ে ও একটু ঠাণ্ডা হলো।

কিন্তু এ দেশে ওর থাকা আর উচিত নয়, সে কথাও ঠিক। ওর এখান থেকে সরে পড়াই দরকার। তার কি উপায় হতে পারে? আমি দেখলাম, ও তার জন্যেই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম—"কোনো ভাবনা নেই, আমি নিজে তোমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো। তুমি দার্জিলিং হয়ে তিব্বত চলে যাও, কিংবা চট্টগ্রাম হয়ে বর্মা চলে যাও। ইংরেজের মতো চলবে, ইংরেজের মতো কথা বলবে, জার্মন বলে তোমায় কেউ চিনতে পারবে না। অন্তত এখান থেকে নিশ্চয় পার করে দিতে পারবো, সে ভরসা আমি তোমায় দিচ্ছি।"

সাহেব বললে—"আমার হাতে টাকাকড়ি সামান্যই আছে, সব ব্যাংকে।"

আমি বললাম—"যা আছে তাতেই হবে। আমিও কিছু দিচ্ছি। তুমি গরিব সেজে থার্ডক্লাসে যাও, সে আরো ভালো হবে। গরিবের মতো হলে কেউ তোমার দিকে চাইবেই না।"

সেই ব্যবস্থাই হলো। পরের দিন সাহেবকে সন্ধ্যার সময় নিজের মোটরে নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেনের এক থার্ড ক্লাস গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম। ভয়ে বেচারার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। সাহস দেবার জন্যে যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়ে ততক্ষণ তার পাশে বসে রইলাম।

সাহেব বললে—"তোমার মতো বন্ধু আমি জীবনে দেখিনি। তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে, যদি বাঁচি।" তার হাতে একটি হীরের আংটি ছিল। সেটি খুলে সে আমাকে দিয়ে বললে—"এইটি তুমি নাও, বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ। এটি আমার মায়ের দেওয়া আংটি, খুব ভালো বেল্‌জিয়ান হীরে। এটি আমার হাতে থাকা উচিত নয়, লোকে সন্দেহ করতে পারে।"

আমি বললাম—"নিতে রাজী আছি, যদি ওর কিছু দাম তুমি নাও। এমনি নিলে তা আমার ঘুষ নেওয়ার মতো হবে।"

সে বললে—"যা দিতে পারো ভিক্ষার মতোই দাও, আমার রাহা খরচে তা কাজে লাগবে।"

মাত্র পঞ্চাশটি টাকা আমার সঙ্গে ছিল, তাই তাকে দিয়ে দিলাম। আরো বেশী থাকলে তাও দিতাম।

ট্রেন ছাড়বার যখন ঘণ্টা পড়ল, তখন সে আমার হাতখানা ধরে বললে, —"আমার ফিঁয়াসের সঙ্গে একবারটি দেখা কোরো। সে হয়তো খুব কান্নাকাটি করছে। তাকে বুঝিয়ে বোলো, তার কথা আমার মনে রইল। আমি বিশ্বাসঘাতক নই। যুদ্ধ থেমে গেলে আমি তাকে নিশ্চয় বিয়ে করবো, এখান থেকে তাকে জার্মনিতে নিয়ে যাবো। তার বাসার ঠিকানাটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।"

ট্রেন ছেড়ে দেবার পরে স্টেশন থেকে বরাবর চলে গেলাম সেই মেয়েটির বাসার ঠিকানায়। খুঁজে পেতে একটু বিলম্ব হলো। একটা মস্ত ব্যারাক-বাড়ির এক ফ্ল্যাটে তারা থাকে। ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার বাইরে থেকে শুনলাম, ভিতরে খুব জোরে রেডিও বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এলো এক বেপরোয়া চেহারার অ্যাংলোইণ্ডিয়ান যুবক, তার পিছনে সেই মেয়েটি। দুজনেই খুব উৎফুল্ল, দুজনেই মদ খেয়েছে। আমাকে দেখে মেয়েটি কিন্তু চিনতেই পারলে না। দুজনে একবার চোখোচোখি করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, তারপর হাত জড়াজড়ি করে বেরিয়ে গেল।

আমি অবাক। আমায় ও চিনলেই না! মানুষ চেনা কতই কঠিন!

॥ তেইশ ॥

সকল ব্যবসাতেই যেমন লাভ লোকসান আছে, ডাক্তারি ব্যবসাতেও তা আছে। এ কথাটি আমি মানতাম না। প্রথম যখন ডাক্তারির কাজে নেমেছিলাম, তখন ডাক্তার ঘোষের মুখে প্রায়ই একটি কথা শুনতাম। তিনি আমাদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, ওহে এই কথাটি মনে রেখো—

"বাপ্‌রে মা-রে যখন, টাকা নেবে তখন,—
হলেও না, মলেও না।"

এ কথার মানে হলো, রোগী যতক্ষণ বাপ্‌রে মারে করবার মতো কাতর অবস্থায় রয়েছে ততক্ষণই তার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার উপযুক্ত

সময়। তারপর যখন সে সেরে উঠবে তখনও তার কাছে টাকা আদায় করা যাবে না, কিংবা যদি মরে যায় তাহলে তোমার প্রাপ্য টাকা আর মিলবেই না।

তাঁর মুখে তখন এ কথা শুনে আমি বিরক্ত হতাম। ভাবতাম, এমন কথা ডাক্তারের মুখে মানায় না। বিলাতের কে একজন প্রফেসর ছাত্রদের কাছে বলেছিলেন, ডাক্তারি কাজটা "is not an occupation but a vocation, rather an obsession than a profession." অর্থাৎ এর মধ্যে পেশার চেয়ে নেশার ভাগটাই বেশী, পয়সার চেয়ে পরিতোষের মাত্রাটাই বেশী। এই কথাই আমার খুব মনে লাগতো। কিন্তু পরে আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেকবারই ঠকেছি। পরে বুঝতে পেরেছি যে, ডাক্তার ঘোষ কেন অমন কথা বলতেন।

কতবার কত লোকে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জমিয়েছে, নিতান্ত বিশ্বস্ত লোকের মতো আচরণ করেছে। আমাকে কল দিয়েছে, রোগ দেখিয়েছে, ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়েছে। অন্তরঙ্গতা থাকার দরুন টাকা সমস্তই বাকী রেখেছে। পরম হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যে, সবই একসঙ্গে বিল করে রাখতে বলবেন আপনার কম্পাউণ্ডারকে, একসঙ্গেই মিটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু রোগ সেরে যাবার পর থেকে তাদের আর কোনো পাত্তাই পাইনি। বারে বারে বিল পাঠিয়েছি, সে বিল ফেরত এসেছে। তারা বলেছে, ডাক্তারবাবুকে বলে দিও, ব্যস্ত হবার দরকার নেই, আমরা নিজেরা গিয়ে দিয়ে আসবো। এমনি করে অনেক কাল কেটে গেছে, তারপর খবর নিয়ে শুনেছি তারা এক বাসা ছেড়ে অন্য বাসায় গেছে, কোনো ঠিকানাও রেখে যায়নি।

এক ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, অথচ সেই সময়েই ভদ্রলোককে কার্যোপলক্ষে মফঃস্বলে চলে যেতে হবে। তিনি আমার হাতে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার ভার দিয়ে অত্যন্ত অনুনয় করে বললেন, আপনি যা করবার করুন, আমার থাকবার উপায় নেই। আপনি যখন রয়েছেন তখন আমার কোনো ভাবনা রইল না। মফঃস্বল থেকে ফিরেই আপনার সমস্ত পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেব। যথা সময়ে আমি নিজেই গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ইন্‌জেকশন দিয়ে আসতাম, ডাক্তারখানা থেকে নিজের লোকের দ্বারা ওষুধ পাঠিয়ে দিতাম। স্ত্রী যথাকালে সুস্থ হয়ে উঠলেন, ভদ্রলোকও যথাকালে মফঃস্বল থেকে ফিরলেন। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে আর দেখাই করলেন না। রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে আমি কথাপ্রসঙ্গে পাওনা টাকার কথা স্মরণ করিয়ে

দিলাম। তিনি বললেন, আসচে মাসে মাইনে পেলেই তিনি মিটিয়ে দেবেন। দুই তিন মাস কেটে গেল। আবার একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়াতে তিনি নিজের থেকেই বললেন, টাকাটার কথা তাঁর স্মরণ আছে, আসচে মাসেই দিয়ে দেবেন। কিন্তু কোনোদিনই তা দিলেন না। অথচ যখনই দেখা হয় তখনই নিজের থেকে বলেন—"দিচ্ছি ভাই দিচ্ছি, তোমার টাকা আমি মারবো না, সর্বদা আমার মনে আছে, দাঁড়াও একটু সামলে নিই", ইত্যাদি। আমি কিছু বলার আগের থেকেই আমার মুখ বন্ধ করে দেন। কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, কোনোদিনই তিনি দেবেন না। অথচ পাড়ার লোক, বাজারে প্রায় প্রত্যহই দেখা হচ্ছে। শেষে এমন অবস্থা হলো যে চোখো-চোখি হলে আমিই অপ্রতিভ হতাম। শেষে আমি নিজেই তাঁকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম। বাজারে যে পটিতে তিনি ঢুকছেন দেখতাম সেদিক থেকে আমি অন্যদিকে সরে যেতাম। তাঁর সঙ্গে আর যেন চোখোচোখি পর্যন্ত না হয়। যেন আমিই অপরাধী, আমিই দেনদার। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলে তিনিই আমাকে ডেকে কথা বলবেন—

"কি হে ডাক্তার, কিছু কথা বললে না যে!"

আমি বলি—"কি আর বলব বলুন। পাছে আপনি—"

"না না, সে তোমায় বলতে হবে না, সব সময়েই আমার মনে আছে। কিন্তু ও ছাড়া কি আর কোনো কথা নেই?"

আমি একটু হেসে সরে পড়ি। নিজেই লজ্জা পাই।

এমন অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু আরো একটি ঘটনার কথা এখানে বলছি, তা ওর চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম ধরনের। সেও আমার এক নূতন অভিজ্ঞতা।

মাঝে কিছুকালের জন্যে আরো এক জায়গাতে চাকরি করেছিলাম। সে চাকরি কেমন করে জুটলো আর কেমন করে গেল, সেই কথাই বলবো।

মজুমদার সাহেব মস্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি বিলাতফেরত, অনেক রকমের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সেখান থেকে শিখে এসেছেন। তাঁর পুরো নামটি আমি বলতে পারবো না। বাপ মায়ে যদিও একটা নাম রেখেছিলেন, কিন্তু সম্ভবত তা আধুনিক কালের রুচিসম্মত ছিল না, তাই তিনি সে নাম কখনো প্রকাশ করেননি। আমরা তাঁকে এস্. মজুমদার ওরফে ছোটো মজুমদার সাহেব বলেই জানতাম।

ওঁর দাদার সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। তিনি আমার ডাক্তারিতে খুব বিশ্বাস করতেন, তিনিই মজুমদার সাহেবকে আমার কাছে পরিচিত করে

দেন। ওঁরা সকলেই কর্মকুশল ও প্রতিভাশালী, এক একজন এক এক বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন। সকলেরই অবস্থা ভালো। তখন ছোটো মজুমদার সাহেব আমাদের দিকের শহরতলীতে নতুন কারখানা খুলবেন বলে সেখানেই এক বাগানবাড়ি ভাড়া করে বাস করতে শুরু করলেন। তাঁর অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা, প্রায়ই ডাক্তার দরকার হয় বলে আমার সঙ্গে তাঁর দাদা আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দিন কয়েকের মধ্যেই সেখানে আমার যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। ছেলে-পুলেদের একটা না একটা কিছু নিত্য লেগেই আছে—কারো সর্দি কাশি, কারো পেটের অসুখ, কারো জ্বর, কারো চর্মরোগ। উপরন্তু আছেন তাদের মা।

মিসেস্ মজুমদার রীতিমত বিদুষী। শুনলাম তিনি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছেন। কিন্তু যতই বিদুষী হোন, এদিকে তিনি নিতান্ত ঢিলেঢালা প্রকৃতির ভালোমানুষ ধরনের মেয়ে। ছেলেমেয়েদের একটু জোরে ধমক দিয়ে শাসন পর্যন্ত করতে পারেন না, আর কোনো কিছু করতে নিষেধ করলেও সে কথা তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। বাপকে যদি বা একটু ভয় করে, কিন্তু মাকে একেবারেই না। আর মা তাদের সামলাতেও পারেন না, বাপ বাড়িতে না থাকলে তারা যা খুশি তাই করে।

ইনি আবার একটু অতিরিক্ত রকমের দয়াবতী। যদি রাস্তার ভিখিরি এসে বলে সে অভুক্ত আছে, সারাদিন কিছু খেতে পায়নি, অমনি তাঁর চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। তাকে তখনই কিছু খেতে না দিয়ে তিনি স্থির হতে পারেন না। যখনকার কথা বলছি, তখন গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। গ্রাম অঞ্চল থেকে অনেক দরিদ্র লোক, বিশেষত অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ের দল লোকের বাড়ির দরজায় গিয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দেয়—'দুটি ভাত দেবে মা, খিদে পেয়েছে মা।" এমন কেউ ক্ষুধার্ত কখনই তাঁর বাড়ি থেকে ফেরত যায়নি। তাদের জন্যে প্রত্যহ আলাদা করে বেশী পরিমাণে ভাত রান্না করা হতো। শুধু তাই নয়, কোনোদিন তাতেও ভাত ফুরিয়ে না গেলে তিনি নিজে রাস্তায় বেরিয়ে ভিখিরি খুঁজে এনে তাদের খাওয়াতেন। শুধু তাই নয়, রাস্তার কুকুরগুলির জন্যেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। মানুষরা এখন নিজেরাই খেতে পাচ্ছে না, কে বা এদের দুটি খেতে দেবে! কিছুই যদি কোথাও খেতে না পায়, তাহলে ওরা বাঁচে কেমন করে! এই ভেবে শেষ পর্যন্ত যা কিছু পড়ে থাকতো সেগুলি উনি আলাদা করে রাখতেন,

রাস্তার কুকুরদের প্রত্যহ তাই খেতে দিতেন। কাজেই তারাও সারা দিনরাত ওঁর বাড়ির ফটকের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতো। তারাই বাড়ি পাহারা দিতো, অপরিচিত কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় গেলে তারা একসঙ্গে বিরাট হট্টগোল করে উঠতো।

মিসেস মজুমদারের একটি দোষ ছিল, অতিরিক্ত পানজর্দা খাওয়া। মুখের মধ্যে সর্বদাই পানজর্দা পোরা আছে, মুহূর্তের জন্যেও কামাই নেই। ঘুমের সময়েও খানিকটা চিবোনো পান গালের এক পাশে রাখা থাকে। ঠোঁট দুটি লালে লালে ক্রমশ কালো হয়ে উঠেছে। ঠোঁটের ঐ পানের ছোপ, কপালে সিঁদুরের টিপ, আর চোখে সোনার চশমা, এই নিয়ে তাঁকে যেন একটু অপরূপ মতন দেখাতো। কিন্তু সাজগোজ প্রসাধনের দিকে তাঁর নজর ছিল না। দামী দামী শাড়িগুলিও কাঁধে আঁচল ফেলে সাধারণভাবে পরতেন। লেখাপড়া শেখার গুমর তাঁর কিছুমাত্র নেই। কিন্তু চিত্তে তিনি দুর্বল ছিলেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই বায়ুরোগে অর্থাৎ স্নায়ুপীড়ায় আক্রান্ত হতেন। কোনোদিন বা ঘুম থেকে উঠেই মাথাটা কেমন টলে গেল। কোনোদিন বা হজমের গোল-মাল শুরু হয়ে গেল, কিছুই খেতে পারা যাচ্ছে না। হয়তো লিভারটা বিগড়েছে। কোনোদিন বা ব্লাড্‌প্রেসার বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। আর কোনোদিন বা হার্ট খুব দুর্বল হয়ে গেছে, চলতে ফিরতে বুক ধড়ফড় করছে। অগত্যা প্রায়ই আমাকে যেতে হতো। আমি বলতাম—"পানজর্দা খাওয়া যদি ছেড়ে দিতে পারেন, তাহলে এ সব কষ্ট আপনার সেরে যেতে পারে। নইলে হার্টটি আরো বিগড়ে যাবে।"

তিনি বলতেন—"এই আপনাদের এক বাঁধা বুলি। এই পানের মধ্যে যে কত রকমের ভিটামিন আছে তা আপনারা কিছুই জানেন না। আপনাদের বিলিতী গুরুরা সে কথা বলে দেননি কিনা, কিন্তু এই পানের জোরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি, নইলে কবে বিছানায় শুয়ে পড়তাম। আমার পিসিমার আশী বছর বয়স, এই পানের জোরেই তিনি এখনও বেশ শক্ত আছেন। কই, তাঁর তো এখনও পর্যন্ত হার্ট খারাপ হয়নি।"

আমি বলতাম—"পান খেতে আমি আপত্তি করছি না, কিন্তু ঐ জর্দা খাওয়াটাই খারাপ। ওর মধ্যে বিষাক্ত নিকোটিন থাকে। জর্দা বাদ দিয়ে পান আপনি যত খুশি খেতে পারেন।"

তিনি বলতেন—"তবে তো খুব কথাই বললেন। জর্দাতেই পানের যা কিছু মৌতাত। জর্দা বাদ দিয়ে কি পান খাওয়া যায়? তামাক বাদ দিয়ে শুধু

কাগজ পাকিয়ে আপনি সিগারেট খেতে পারেন? ও সব কথা ছেড়ে দিন। হার্টের কিছু দোষ হয়ে থাকে; তার ওষুধ দিন, আবার ঠিক হয়ে যাবে।”

সত্যিই তাই। ওষুধে তাঁর খুবই উপকার হতো। যা কিছুই হোক, তার জন্যে কখনো বা কিছু ইন্‌জেকশন আর কখনো বা ওষুধপত্র দিতাম, তাতেই তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠতেন। তার মূল কারণ আমার চিকিৎসাতে তাঁর খুবই বিশ্বাস ছিল।

অবশ্য আমাকে তাঁরা প্রত্যেক বারেই নগদ ফী দিয়ে দিতেন। কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুজনেই তাঁরা বেহিসেবী রকমের অমিতব্যয়ী। ব্যয়ের সম্বন্ধে হিসেব কিছুই রাখতেন না। মাঝে মাঝে যাওয়াতে আমারই নজরে পড়ে যেতো যে, চাকরবাকরেরা একই জিনিস কিনে এনে দুই তিনবার তার দাম চেয়ে নিচ্ছে, সে দাম যে আগেই দেওয়া হয়ে গেছে তা ওঁদের স্মরণ নেই। কোনো জিনিস ঘরে থাকলেও তা ফুরিয়ে গেছে, আবার আনতে হবে বলে তারা দাম আদায় করছে। আমার ফী দেবার বেলাতেও দেখতাম তাই হতো। প্রায় প্রত্যেক বারেই আমার হাতে ওঁরা একটি দশ টাকার নোট দিতেন, চেঞ্জ ফেরত দিতে গেলেই বলতেন, ওটা এখন রাখুন আপনার কাছে, পরের বারে উসুল হয়ে যাবে। পরের বারে কিন্তু সে কথা ভুলে গিয়ে আবার একটি দশ টাকার নোট দিতেন। আমি যখন বলতাম যে, আগের বারের দরুন তাঁদেরই পাওনা রয়েছে, তখন স্মরণ হতো।

বলা বাহুল্য তাঁদের সঙ্গে আমার খুব একটা আত্মীয়তা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে কোনো কিছু ভালোরকম খাবার বা মিষ্টান্ন তৈরি হলে মিসেস্ মজুমদার তা আমার জন্যে গাড়িতে দিয়ে দিতেন, বলতেন—এটা আমি নিজে তৈরি করেছি, বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেখবেন। এমন তিনি প্রায়ই করতেন। কোনো একটা অছিলায় মানুষকে খাওয়াতে তিনি খুবই ভালোবাসতেন।

ছেলেপুলেদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো দুটি মেয়ে। তারা স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা খুবই প্রখর, কিন্তু আচরণে ছেলেমানুষের মতো। তারাও পেয়েছে মায়ের মতো প্রকৃতি। বিনা সংকোচে শীঘ্রই বাইরের লোককে আপন মনে করে নেয়, দূরত্বের ভাব কিছুই থাকে না। এরা দুজনে প্রায়ই আমার গাড়িতে উঠে বসে থাকতো, আর মুখ টিপে টিপে হাসতো। আমি গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেও তারা গাড়ি থেকে নামতো না।

আমি জিজ্ঞাসা করতাম—"কোথায় যেতে চাও বলো।"

তারা বলতো—"আপনি যেখানে যাবেন।"

"আমাকে তো এখন অনেক জায়গাতেই ঘুরতে হবে।"

"আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবো। আপনি আপনার কাজ করবেন, আমরা গাড়িতেই বসে থাকবো। অনেক জায়গায় বেশ বেড়ানো হবে। দেখবো আপনি কোথায় কোথায় যান।"

"তারপর বাড়ি ফিরবে কেমন করে?"

"কেন, বাসে। কলেজ থেকে রোজ যেমন ফিরি।"

অগত্যা তাদের সঙ্গে নিয়েই আমি ঘুরতাম। তারপর ডাক্তারখানায় ফিরে তাদের বসিয়ে চা বিস্কুট খাইয়ে, সঙ্গে একজন লোক দিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসতে বলতাম।

কিছুকালের মধ্যেই মজুমদার সাহেব ঐ শহরতলী অঞ্চলে এক বিরাট গ্লাস ফ্যাক্টরির পত্তন করলেন। চার পাঁচ বিঘা জমির উপর বড়ো বড়ো কয়েকটি টিনের শেড্। সেখানে মস্ত মস্ত কয়েকটা ফার্নেস বসানো হলো। ইউরোপ থেকে অনেক যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছিল, সেগুলি যথাস্থানে স্থাপন করা হলো। অনেক কারিগর নিয়োগ করা হলো, তাদের থাকবার জন্যে অনেক টিনের ঘর করে দেওয়া হলো। তার পরে সেখানে মহাসমারোহে রীতিমত কাজ চলা শুরু হয়ে গেল।

মজুমদার সাহেবের বড়ো ভাই, তিনিও এক খাম-খেয়ালী মানুষ। তাঁরও দুটি মস্ত কারখানা আছে। একটি হলো ছবির ব্লক তৈরি করার কারখানা, আর একটি লোহার পাইপ বেঁকিয়ে চেয়ার তৈরি করার কারখানা। ওতে তিনি প্রচুর লাভ করেছিলেন। দুই ভায়ের টাকা এবং আরো দুই চারজন বন্ধুর টাকা নিয়ে গ্লাস ফ্যাক্টরির ক্যাপিট্যাল দাঁড় করানো হয়েছে। সকলেই এসে উৎসাহের সঙ্গে দেখাশোনা করছেন।

এই ধরনের কোনো কারখানা চালাতে গেলেই সরকারী ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুসারে একজন ডাক্তার নিযুক্ত রাখা দরকার। নতুবা কারখানা চালাবার অনুমতি মিলবে না। কাজেই মজুমদার সাহেব আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন। কাজ বিশেষ কিছু নয়, সপ্তাহে কেবল দুই দিন করে সেখানে আমায় হাজিরা দিতে হবে। আর দৈবাৎ কোনো কিছু দুর্ঘটনা ঘটলে তখনই আমাকে খবর দেওয়া হবে। সামান্য কিছু মনে হলে আমিই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো, বেশী কিছু হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব।

এর জন্যে আপাতত মাসে দেড়শো টাকা পাবো, কাজ বাড়লে তখন বেতনও বাড়বে।

ভাবলাম যে মন্দ কি। সামান্যই কাজ, সপ্তাহে দুবার করে ঘুরে আসা মাত্র, তাতে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। শুরু করে দিলাম এই চাকরি। অ্যাটেণ্ডিং ডাক্তার বলে ওরা সাইনবোর্ডে আমার নাম টাঙিয়ে দিলে।

কারখানার খুব দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। তখনকার দিনে খুব ভালো ধরনের কাচের কারখানা এ অঞ্চলে ছিল না। যা ছিল তাতে কাচের পাইপ প্রভৃতি কতকগুলি মোটা মোটা জিনিস তৈরি হতো মাত্র। কিন্তু এখানে ভালো ভালো উঁচুদরের জিনিস তৈরী হতে লাগল। ভালো ভালো মাপসই শিশি, বোতল, চিমনি, গেলাস প্রভৃতি থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরির উপযোগী ফ্লাস্ক, বিকার, টেস্টটিউব প্রভৃতি ভালো ভালো সরঞ্জামপত্র তৈরি হতে শুরু হলো। সেগুলি চমৎকার উৎরে গেল, যে দেখলে সেই সুখ্যাতি করলে। মজুমদার সাহেব সেখানে থেকে রাত জেগে পরিশ্রম করতে থাকলেন। পাছে ফার্নেসের প্রচণ্ড উত্তাপ একটুও কমে যায়, তাই সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগলেন। উত্তাপ যত বেশী হবে, কাচ ততই উঁচুদরের হবে, কাচের স্ফাটিক্য ততই চমৎকার হবে।

ছয় মাসের মধ্যেই বাজারে এই ফ্যাক্টরির জিনিসের চাহিদা বেড়ে গেল। অর্ডার আসে এত বেশী যে, তার যোগান দিতে পারা যায় না। তখন মালিকেরা সকলে বললে, কারখানা আরো বাড়াতে হবে, যন্ত্রপাতি ও কারিগরের সংখ্যা বাড়াতে হবে, কাজেই আরো বেশী মূলধন দরকার।

তখন ওঁরা নিজেদের চেনাপরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার বিক্রি করতে মনস্থ করলেন। অনেক মাড়োয়ারী শেয়ার কিনতে ঝুঁকেছিল, কিন্তু ওঁরা বললেন, নিজেদের ভিতরকার লোক ছাড়া অন্য কাউকে শেয়ার বেচা হবে না। একে আমরা প্রাইভেট লিমিটেড করতে চাই।

তখন একদিন মজুমদার সাহেব আমাকে চুপি চুপি একপাশে ডেকে বললেন—আপনি পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার কিনে ফেলুন, খুব লাভ হবে। কুড়ি পঁচিশ পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ট তো নিশ্চয়ই পাবেন। সেটা ভবিষ্যতের জন্যে আপনার একটা বাঁধা আয় হয়ে থাকবে। আর এর পরে যদি আপনার শেয়ার বেচেও দেন, তাতেও অনেক লাভ করবেন, কারণ এই শেয়ারগুলোর দাম শীঘ্রই খুব বেড়ে যাবে। আমি আপনার ভালোর জন্যেই বলছি।

অবশ্য সমস্ত টাকাটাই এখন নগদ দিতে হবে, কারণ এখন আমাদের নগদ টাকারই খুব দরকার।

কিন্তু কোথায় পাবো পাঁচ হাজার টাকা! কুড়িয়ে বাড়িয়ে দুই হাজার মাত্র সংগ্রহ করা গেল। তাই দিয়ে দিলাম মজুমদার সাহেবের হাতে। তিনি একটু হেসে বললেন—"এর চেয়ে বেশী টাকা হাতছাড়া করতে বুঝি ভয় পাচ্ছেন? এতে আপনি কতই বা লাভ করবেন?"

আমি বললাম—"আর কিছু আমার হাতে নেই, দেবো কোথা থেকে?"

যাই হোক, অতঃপর কারখানা আরো বাড়লো। সেখানকার কাজ বাড়লো, দিবারাত্রি কাজ চলতে লাগলো, আরো অনেক কারিগর ও কর্মচারী নিযুক্ত হলো। মোটা মাইনে দিয়ে ওয়ার্কস্ ম্যানেজার রাখা হলো। তার চেয়েও বেশী মাইনে দিয়ে জেনারেল ম্যানেজার রাখা হলো। তাছাড়া প্রত্যেক বিভাগে আলাদা আলাদা ম্যানেজার, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের তথোপযুক্ত কেরানি ও বেয়ারা প্রভৃতি। মোটা মোটা বেতনের কর্মচারীতে কারখানা সরগরম হয়ে উঠল।

কিন্তু এর পর থেকেই দেখা গেল যে, মাসিক ব্যয় সংকুলান হচ্ছে না। প্রতি মাসে যত খরচ দাঁড়িয়ে গেছে তত আমদানি হচ্ছে না। পরে হবে নিশ্চয়ই, কারণ জিনিস যত বেশী প্রস্তুত হবে তত বেশী তার দামও মিলে যাবে। কিন্তু আপাতত খরচ কিছু কমানো দরকার। তখন কয়েকজন কর্মচারীকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো, আর কয়েকজনকে অর্ধেক বেতন দেওয়া হতে লাগলো। মজুমদার সাহেব আমাকে ডেকে বললেন—"আপনার মাসিক পাওনাটা যদি আপাতত না নেন, তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হয়। যখন বেশী টাকার আমদানি হতে শুরু করবে, তখন আপনার সব পাওনা একসঙ্গে মিটিয়ে দেব।"

বলা বাহুল্য, আমি এতে তখনই সম্মত হয়ে গেলাম।

এমনি বিনা বেতনে ছয় মাস পর্যন্ত মুখ বুজে চাকরি করে গেলাম। কিন্তু ব্যবসার অবস্থার কোনোই উন্নতি হতে দেখা গেল না। বরং উত্তরোত্তর আরো অবনতি হতে থাকল। কারখানার লোকজন এত বেশী বাড়ানো হয়েছে যে, খরচ কোনোমতেই কুলোচ্ছে না।

ভালো কারিকরদের প্রতি সপ্তাহেই মজুরি মিটিয়ে দেওয়া চাই। নিয়মিত ভাবে টাকাকড়ি না পাওয়াতে অনেকেই তারা কাজে আসা বন্ধ করে দিলে। বাজার থেকে ভালো জিনিসের অর্ডার এলে সময়মত সে মাল সরবরাহ হয় না, কাজেই অর্ডার আসাও ক্রমশ কমে গেল। কারখানার সমস্ত ফার্ণেসগুলো

আর জ্বলে না, দু একটি মাত্র জ্বালানো হয়। কারখানার কাজ টিম্‌টিম্‌ করে চলতে থাকে।

অবস্থা বেগতিক দেখে তখন আমি মৃদুস্বরে আমার প্রাপ্য বেতনের তাগাদা শুরু করলাম। কিন্তু চাইতে গেলেই তিনি বলেন—"এ মাসে দিতে পারছি না, আসচে মাসে পাবেন কিছু।" তার উপরে আর কিছু বলতে পারি না। পরের মাসে যখন বলি, তখনও তিনি বলেন ঐ একই রকম কথা। মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারি, তিনি মরিয়ার মতো হয়ে উঠেছেন। মিথ্যা কথা বলে আমাকে ঠকিয়ে রাখতে তাঁর সংকোচে বাধছে না।

এমনি করে আরো তিনটি মাস কাটল। কারখানায় যারা অবশিষ্ট ছিল তারা মহা হাঙ্গামা করতে লাগল। সবাই বলে, কাজ ছেড়ে দেবে।

একদিন শুনলাম, মজুমদার সাহেব তাঁর দাদার কাছে ছুটেছেন, টাকাকড়ি এনে এখানকার দেনাপত্র মেটাবার জন্যে। তার পরে শুনলাম, সেখানেও কিছু পাওয়া যায়নি। দাদার যে দুটি কারখানা ছিল সেই দুটিও ফেল করেছে। দাদারও অবস্থা খুব খারাপ।

তারপর একদিন কারখানার ফটকে তালা বন্ধ হয়ে গেল। পাওনাদার এবং শেয়ার-হোল্ডাররা নালিশ রুজু করলে।

আমাকেও তাদের দলে টানছিল, কারণ আমিও তো একজন শেয়ার-হোল্ডার। কিন্তু মজুমদার সাহেব আমাকে বললেন—"বুঝতেই তো পারছেন, নালিশ করে আপনার এক পয়সাও আদায় হবে না। ওরা কারখানার সমস্ত জিনিসপত্র ক্রোক করবে, সেগুলো বেচে যা পারবে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আবার রোজগার করে আপনার দেনা শোধ করে দেবো।" অগত্যা আমি নিবৃত্ত হলাম। আর কোর্ট-ঘর করা আমার পক্ষে সম্ভবও হতো না।

মিসেস্‌ মজুমদারের কাছে নিয়মিত ফী পাওয়াও অনেকদিন থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারো অসুখবিসুখ হলে তাঁদের বাড়িতে গেলেই তিনি একটু ম্লান হাসি হেসে বলতেন—"হাতে কিছু নেই ডাক্তারবাবু, আপনার টাকাটা আজ-বাকী রইল।"

কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার পর একদিন তাঁদের বাড়িতে এমনি গিয়েছিলাম। মিসেস্‌ মজুমদারের মুখখানি শুকিয়ে মলিন হয়ে আছে। যে পানজর্দা তিনি দিবারাত্র খেতেন, তাও আর তাঁর মুখে নেই। তাতেই বোধ হয় মুখটা আরো বেশী শুকনো দেখাচ্ছে। গায়ে গহনাপত্রও কিছু নেই।

আমি বললাম—"মন খারাপ করবেন না, এখন মনকে শক্ত রাখা আপনার দরকার।"

তিনি বললেন—"নিজেদের জন্যে একটুও মন খারাপ করছি না। এ আমার অভ্যাস আছে। উনি কখনো আমাদের রাজা করেন, আবার কখনো গাছতলায় বসান। আগেও একবার এমনি হয়েছিল। তারপর জামসেদপুরে টাটার কারখানায় বেশ ভালো চাকরি পেলেন, তখন অনেক মাইনে হয়েছিল। হঠাৎ সে চাকরি ছেড়ে এই ফ্যাক্টরি করলেন এখানে এসে। আমি তখনই জানতাম আবার এমনি হবে, ঐ দুর্ভিক্ষের ভিখিরিদের মতো অবস্থা। কাজেই ওতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আপনার অনেক কষ্টে রোজগারের টাকা, তাও যে উনি নষ্ট করলেন, এই আমার দুঃখ।"

এর পর বহুকাল ওঁদের কোনো খবর পাইনি। ওঁরা কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন। কিছুকাল পরে শুনলাম, জামসেদপুরে তিনি বড়ো ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পেয়েছেন, মাইনে দেড় হাজার টাকা। সম্প্রতি তাঁর কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণ চিঠি পেলাম, তাঁর এক মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। অবস্থা এখন ভালোই হয়েছে।

কিন্তু ঠিকানা পেয়েও আমি গেলাম না, কিংবা তাঁকে কোনো চিঠিও দিলাম না। হয়তো আমার পাওনার কথাটা তিনি এখন ভুলেই গেছেন। কাজ কি সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে। যদি এখন আগেকার কথা ভুলে থাকেন, আর শান্তিতে থাকেন, সেই তো ভালো।

॥ চব্বিশ ॥

ডাক্তারি ব্যবসাতে লোকসানের সম্বন্ধে যেমন বলেছি, তেমনি আবার উল্টো রকমের অভিজ্ঞতাও হয়েছে। এখানে বিশেষ করে মনে পড়ছে এক ভদ্রমহিলার কথা। তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বললে আমার বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার একটা উজ্জ্বল দিক একেবারে বাদ পড়ে যাবে।

ওঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন ওঁদের এক আত্মীয়ের আত্মীয়। সেও এক মজার কাহিনী। বলি। সে ভদ্রলোক থাকতেন চন্দননগরে। সেখানে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী ঘুষঘুষে জ্বর হতে থাকে। সেখানকার ডাক্তার প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে কালাজ্বর বলে চিকিৎসা করছিলেন, কিছু ফল হচ্ছিল না। আমার পরিচিত তাঁরই এক আত্মীয় আমাকে এখান থেকে চন্দননগরে নিয়ে

গেলেন। আমি পরীক্ষা করে দেখে বললাম, ঐ সব কোনো রোগ নয়, ওঁর বুকে জল জমেছে, প্লুরিসি হয়েছে। আমার মন্তব্য শুনে সেখানকার স্থানীয় ডাক্তারটি খাপ্পা হয়ে উঠলেন। আমার মুখের উপরে জোর করে বললেন, কখনই তা হতে পারে না, বাজি রাখতে রাজী আছি। তিনি বেশ অভিজ্ঞ ডাক্তার, আমার চেয়ে বয়সেও বড়ো। আমি বললাম, এক্স্‌রে পরীক্ষা করে দেখলেই জানা যাবে, আমার কথা সত্য কিনা। কিন্তু সেখানে এক্স্‌রে পরীক্ষা হতে পারে না। আর রোগীর ঐ অবস্থাতে তাকে কলকাতা পর্যন্ত আনাও যায় না। তখন আমি বললাম, কলকাতার একজন বড়ো ডাক্তারকে তাহলে এনে দেখানো হোক। অনেক টাকা খরচ করে তারা ডাক্তার সেনগুপ্তকে কলকাতা থেকে নিয়ে গেল। তিনিও পরীক্ষা করে বললেন, প্লুরিসি হয়েছে। সেখানকার সেই ডাক্তারবাবুটি তবুও সে কথা মেনে নিতে রাজী নন। তিনি রূঢ়ভাবে বললেন, কলকাতার ডাক্তারকে অন্য একজন কলকাতার ডাক্তার সমর্থন তো করবেই। ডাক্তারে ডাক্তারে ডিটো দেওয়াই হলো কলকাতার রেওয়াজ। তখন ডাক্তার সেনগুপ্ত এক কাণ্ড করলেন। তিনি আমাকে বললেন—"তোমার ব্যাগ থেকে ইন্‌জেকশন দেবার একটি লম্বা ছুঁচ স্টেরিলাইজ করে আনো দেখি।" আমি সেটি আনতেই তিনি বললেন—"ঐ ছুঁচটি তুমি নির্ভয়ে রোগীর বুকের পাঁজরের মধ্যে এমন জায়গায় ঢুকিয়ে দাও যদি ভিতরে জল থাকে, ছুঁচের মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসবে।"

উদ্বেগে আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগল, যদি জল না বেরোয়! আমি একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। তিনি বললেন—"কোনো ভয় নেই, আমার কথা তুমি শুনেই দেখ না।" ছুঁচটি বুকের মধ্যে চালিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ ছুঁচের মুখ দিয়ে সরু একটি স্রোতের ধারায় জল বেরিয়ে আসতে লাগল। ওখানকার সেই ডাক্তারটি নির্বাক বিস্ময়ে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না।

পরে সেই রোগীর চিকিৎসার ভার পড়ল আমার উপরে। আমি ডাক্তার সেনগুপ্তের নির্দেশ অনুসারে চিকিৎসা করতে লাগলাম। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসাতে অনেক সময় লাগে। তখনও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধগুলি আবিষ্কৃত হয়নি। কয়েকবার সেখানে যাতায়াতের পর আমি রোগীকে কলকাতায় আনতে পরামর্শ দিলাম। অ্যাম্বুল্যান্স গাড়িতে তাঁকে কলকাতায় আনা হলো। অনেক দিনের চিকিৎসাতে সে রোগী শেষ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছিল।

কলকাতায় যে আত্মীয়ের বাড়িতে সেই রোগীর চিকিৎসা করেছিলাম,

তিনিই আমাকে বলেন, রানী মায়ের চিকিৎসা করার ভার আপনাকে নিতে হবে। কিন্তু তাঁদের অবস্থা খারাপ, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু পাবেন না।

যাকে বলে সর্বস্বান্ত এক রাজপরিবার। এঁদের দেখেই আমার হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে হয়েছিল। আগে যতই বেশী ধনসম্পত্তি ছিল, এখন ততই বেশী নিঃস্ব। বদখেয়ালীর জন্যে নয়, শুধুই উদারচরিত্র ও দানশীলতার জন্যে।

যিনি রাজা ছিলেন, তিনি বংশানুক্রমিক রাজা, তিনি এখন নেই। বিপুল সম্পত্তি ছিল তাঁর, কলকাতায় এবং আরো অনেক স্থানে। যাকে বলে ক্রোরপতি, তাই ছিলেন তিনি। কেবল কলকাতা থেকেই তাঁর প্রত্যহ খাজনা আদায় হতো অল্পবিস্তর পাঁচ হাজার টাকা। বাঁধা সম্পত্তি, তার কখনও ক্ষয় হতে পারে না। কিন্তু দানে ছিলেন তিনি মুক্তহস্ত। সে দানের কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু বোধ করি দানেরও একরকম নেশা আছে। সে নেশাকে যতই বাড়ানো যায় ততই বেড়ে চলে। তার উপর আরো এক দুর্দমনীয় নেশায় তাঁকে পেয়ে বসল, দেশ-হিতৈষণার নেশা। এ নেশায় একবার ধরলে মানুষের কোনো জ্ঞানগোচর থাকে না। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্যে দুই হাতে অর্থদান করতে থাকলেন। দেশের সর্বত্র তাঁর নামে ধন্য ধন্য রব উঠলো। তাঁর নাম শুনলে সকলেরই মাথা সম্ভ্রমে নুয়ে যায়। এদিকে সম্পত্তির পর সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যেতে লাগল, নিলামে উঠতে লাগল। দেশের লোকের কাছে যতই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে উঠতে লাগলেন, নিজে ততই তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়তে লাগলেন। তবুও তাঁর সেই বিপুল সম্পত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার কথা নয়। অনেক গেলে তবুও অনেক থাকে। কেমন করে সমস্তই নিঃশেষে উবে গেল, সে রহস্য অজ্ঞেয়। কিন্তু যখন তিনি মারা গেলেন তখন দেখা গেল, কিছুই তাঁর নেই। সম্পত্তি সবই পরহস্তগত। তাঁর বিধবা স্ত্রী, তিনটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় রেখে তিনি চলে গেলেন। বাস করবার বাড়িটি পর্যন্ত নিজেদের নেই, কলকাতার এক সীমান্তে একখানি ছোটো বাড়ি ভাড়া করে তাঁদের থাকতে হলো। ভাগ্যক্রমে এটর্নি অফিস থেকে এঁদের জন্যে একটি মাসহারার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছিল, তাই সম্বল করেই কোনোক্রমে এঁদের ভরণপোষণ চলত, সামান্য একটি মধ্যবিত্ত সংসার যে ভাবে চলে সেই ভাবে।

এঁদের কথাই আমি বলছি। দৈবক্রমে এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, স্বয়ং রানী মায়ের চিকিৎসা করবার জন্যে।

তিনি সত্যই রাজমহিষী, মহীয়সী। সেই ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকেই যেমনি বললেন—"রানীমা, সেই ডাক্তারবাবুকে এনেছি," তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত স্বরে বললেন—"ও নামে আর ডাকছ কেন, এখন আমি রানী নই, শুধুই মা। রানীমা বলার চেয়ে শুধু মা বললে অনেক বেশী মিষ্টি শোনাবে।"

তাঁর চেহারায় এমন কিছু অসাধারণত্ব দেখিনি। ভদ্র বাঙালীর ঘরের মেয়েরা যেমন হয়ে থাকে, সেইরকমই তাঁর চেহারা। কিন্তু বোঝা যায় তাঁর মুখের-চোখের এক আশ্চর্য দীপ্তি দেখে। সে দীপ্তি অতি স্নিগ্ধ, অতি প্রশান্ত। দারিদ্র্য ও দুরবস্থার মধ্যেও সে দীপ্তি কিছুমাত্র ম্লান হয়নি। নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়েও সেই ভিতরকার প্রভা নষ্ট হয়নি। দেখলেই বোঝা যায় যে, বাস্তবে নিঃসম্বল হলেও অন্তরে তিনি রানীই আছেন।

রোগ তাঁর এনিমিয়া, রক্তশূন্যতা। মাঝে মাঝে তিনি অর্শে ভোগেন, প্রচুর রক্তপাত হয়, তাতেই এ দোষ হয়ে থাকবে। চোখের কোলে রক্ত খুব কম, হার্ট দুর্বল, হার্টে একটা অস্বাভাবিক 'ক্রই' শব্দ পাওয়া যায়। আর এই কারণ থেকেই হয়েছে ডিস্‌পেপসিয়া ও লিভারের/ দোষ। রোগটি ক্রনিক অবস্থাতে এসে দাঁড়িয়েছে, বহু দিন ধরে ধৈর্যের সঙ্গে এর চিকিৎসা করা দরকার। অল্প দিনে এ রোগ সারবার নয়।

প্রথম দুই একবার আমি আমার ন্যায্য ফী নিয়েছিলাম। ওঁরাও দিলেন, আমিও নিলাম। কিন্তু তার পরে আর নিলাম না। বুঝতে পারছিলাম যে, দিতে ওঁদের কষ্ট হচ্ছে। বাঁধা কিঞ্চিৎ মাসহারার উপর নির্ভর করে কোনোরকমে সংসার চালাতে হয়, নিয়মিত ভাবে ডাক্তারের ফী কেমন করে দিতে পারবেন? তা ছাড়া ইন্‌জেকশন প্রভৃতি ওষুধপত্রও কিনতে হবে। আমি তাই তৃতীয় বারে টাকা ফিরিয়ে দিলাম,—বললাম, "ওটা এখন রেখে দিন।"

বড়ো ছেলে টাকা দিতে এসেছিল। অন্য ছেলেমেয়েগুলি ছোটো ছোটো, কেবল তারই একটু বয়স আর বুদ্ধি হয়েছে। সম্প্রতি স্কুল ছেড়ে সে কলেজে ঢুকেছে। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। সে বললে, "কেন নেবেন না?"

আমি বললাম—"থাক না এখন, পরে নেওয়া যাবে।" ওঁদের অবস্থা দেখে ফী ছেড়ে দিচ্ছি, এ কথা কেমন করে বলি।

বড়ো ছেলে তবুও টাকা নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার

মা বললেন—"জোর করবার দরকার নেই। উনি এখন নিতে চাইছেন না—শুনতে পেলে তো ওঁর কথা, তুমি ও টাকা রেখে দাও।"

তারপর থেকে টাকা নেবার সংকোচ কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁদের বাড়িতে যাতয়াত করতে লাগলাম।

পরে কথায় কথায় আরো পরিচয় পেলাম। কেবল বুদ্ধিমতী নয়, উনি একজন বিদুষী রমণী। ইংরেজী লেখাপড়া খুব বেশী জানা না থাকলেও ওঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের দিকে খুব ঝোঁক। জ্যোতিষ শেখবার জন্যে এককালে পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত শিখেছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি অনেক কিছুই পড়েছেন। শুধু তাই নয়, বোধশক্তির দিকটাও খুব উন্নত, সাধারণের চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে। অনায়াসে তিনি মানুষ চিনতে পারেন, মানুষের মনের ভাব একটুতেই বুঝে নিতে পারেন।

পয়সাকড়ি না নিয়ে যেখানে চিকিৎসা করতে যাওয়া যায়, সেখানে ডাক্তারের ব্যবসাদারী ভাবটি বজায় থাকে না, অনেকটা যেন খোলাখুলি বন্ধুত্বের ভাব এসে পড়ে। কারণ সেখানে লেনদেনের ব্যাপারী আর রইলাম না। কাজেই হাতে জরুরী কোনো কাজ না থাকলে সেখানে কিছুকাল বসে গল্পও করতাম, ছোটো মেয়ে অপর্ণা চা তৈরি করে এনে দিলে খুশি হতাম। অপর্ণার মুখখানি বেশ সুন্দর। তাই ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে একদিন নানারকম পোজে তার কয়েকটা ফোটো তুলে নিলাম।

একদিন যখন গেছি, দেখি রানীমার ঘরের দরজা বন্ধ। বোধ করি তিনি কাপড় ছাড়ছিলেন, বা কিছু একটা করছিলেন। আমি ওর পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে থাকলাম। সেই ঘরটি ছোটো, বহু রকমের জিনিসপত্রে ঠাসা, গুদামঘরের মতো। সব রকমের জিনিসই সেখানে জড়ো করা আছে—টেবিল চেয়ার থেকে শুরু করে বাক্স, পেঁটরা, ছবি, কাপড়জামা প্রভৃতি সব কিছুই। অথচ ওরই মধ্যে জায়গা করে হয়েছে ছেলেদের ওটি পড়বার ঘর এবং রাত্রে শোবার ঘর। মেয়ে শোয় মায়ের কাছে। দোতলায় এই দুটি ছাড়া আর ঘর নেই। সামনে খানিক বারান্দা এবং তার পরে খোলা ছাদ। ছাদের অপর পাশে রান্নাঘর।

ঐ ঘরের মধ্যে বসে হঠাৎ আমার নজরে পড়লো, এক পাশে এক টেবিলের উপর রয়েছে শ্বেত পাথরে গড়া অতি সুন্দর এক ভিনাসের প্রতিমূর্তি। ভিনাস দ' মিলো। খুব ছোটো নয়, প্রায় দুই ফুট লম্বা, আর অতি নিখুঁত তার গড়ন। দেখলেই বোঝা যায়, ইটালির অজানা শিল্পীর গড়া আসল

সেই ভিনাস মূর্তির একটি হুবহু নকল। যিনি এটি গড়েছেন তিনিও খুব নিপুণ শিল্পী।

এমন সুন্দর জিনিসটি দেখবামাত্রই আমি মনে মনে লুব্ধ হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, কোনোরকমে ওটিকে যদি হস্তগত করা যায়। সেই মন নিয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করলাম—"এটি তোমরা কোথা থেকে পেয়েছিলে?"

ওরা বললে—"বাবা আনিয়েছিলেন প্যারিস থেকে।"

"এই সুন্দর জিনিসটিকে তোমরা এখানে এমনি অযত্নে ফেলে রেখেছ! এর দাম যে অনেক বেশী, এ দেশে পাওয়াই যায়না।"

ছেলেরা আমার পিছনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কথার কোনো জবাব দিলেনা। তখন আমি ফিরে চেয়ে দেখি, পাশের দরজা খুলে রানীমা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতক্ষণ ওদের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলাম বলে আমি তা জানতে পারিনি।

আমি তাঁর দিকে ঘুরে বসতেই তিনি শান্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন—"ওই স্ট্যাচুটি আপনি নেবেন?"

খুব অপ্রতিভ হয়ে আমি বললাম—"না না, সে কথা আমি বলিনি, বলছিলাম যে অমন দামী জিনিসটা এখানে অযত্নে পড়ে রয়েছে, আর কেই বা এখানে ওটি দেখতে আসছে, তার চেয়ে বরং—"

"তার চেয়ে আপনিই ওটা নিয়ে যান। আপনার ডাক্তারখানাতে সাজিয়ে রাখবেন, পাঁচ জনে দেখবে। আমাদের কাছে এখন ওর দাম কি আছে!"

আমি খুবই লজ্জিত হয়ে পড়লাম। মনে মনে ঠিক ঐরকম ধরণের কথাই আমি ভাবছিলাম, কেমন করে উনি তা জানতে পারলেন! আমতা আমতা করে আমি বললাম—"দাম আছে বৈকি, এখন বেচলে ওর অনেক দাম।"

তিনি তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললেন—"কিন্তু আমরা কখনই ওটি বেচতে পারবোনা। আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, দ্বিধা করবার কিছু নেই।"

কিন্তু এমনই আমার ছোটো মন, তাঁর কথাতে ভেবে নিলাম যে আমি ফী নিচ্ছিনা বলে তার শোধবোধ হিসাবে ওটি উনি আমাকে দিয়ে দিচ্ছেন। তাতেই আর কোনো দ্বিধা না করে ষ্ট্যাচুটি আমি নিয়ে চলে এলাম।

কিছুদিন পরে দেখি আরো একটি ঐ ধরণের শ্বেত পাথরের মূর্তি ঐ ঘরেই একটা কোণের দিকে পড়ে রয়েছে, তার মুণ্ডটা আধখানা ভাঙা। কিন্তু

কি সুন্দর তার গঠন-শিল্প! নারীদেহের যা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই যেন ফুটে উঠেছে। এটিও কোনো বিখ্যাত প্রাচীন মূর্তির নকল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভিনাসের থেকে এর গঠন আলাদা, ভঙ্গী আলাদা।

রানীমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—"এটি কিসের মূর্তি?"

তিনি বললেন—"ওটিও এক ভিনাসের মূর্তি, ওকে বলে ভিনাস দ' মেডিসি। সেকালে সৌন্দর্যের দেবতাকে ওরা ভিনাস বলতো। কত শিল্পী কত ভাবেই ভিনাস গড়তে চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে একটি পাওয়া যায় মিলো দ্বীপে। আর এটিকে নিয়ে রাখা হয়েছিল রোমের মেডিসিতে; তাই এর ঐ নাম দেওয়া হয়েছে।"

"আহা, এর মুণ্ডটা কেমন করে ভেঙে গেল?"

"এখানে গাড়ি থেকে নামাতে গিয়ে ভেঙে গেছে। এটিকেও আপনি নিয়ে যান। অনর্থক এখানে পড়ে আছে। আপনার ওখানে দুটিকে দুই পাশে সাজিয়ে রাখবেন।"

"না না, আর আমি নিতে চাইনা। একটি নিয়ে গেছি, তাই যথেষ্ট। এ অনেক দামী জিনিস। তা ছাড়া এ আপনার স্বামীর একটা স্মৃতি-চিহ্ন।"

তিনি একটু হেসে বললেন, "তাঁর জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে। ও আপনি নিয়ে যান। দুটিকে একসঙ্গেই উনি আনিয়ে-ছিলেন। ওটিও আপনার কাছে থাক।"

ওঁর উঁচু মনের আরো অনেক পরিচয় ক্রমশই আমি পেতে লাগলাম। আমি দেখতে পেলাম যে আমাদের থেকে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গী কতই স্বতন্ত্র।

ওঁর ছেলেমেয়েরা সামান্য দামের সাদাসিধা কাপড়জামা পরে থাকলেও সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতো, ময়লা জিনিস কখনই পরতো না। তবু একটু আধটু ছেঁড়া কাপড় পরতে ওদের প্রায়ই দেখেছি। রানীমাকেও তাই পরতে দেখেছি। একদিন তাঁর বড়ো ছেলে কলেজে গেল সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে, পিঠে তার এক মস্ত তালি মারা। আমার এতে কেমন বিশ্রী লাগলো, মনে হলো অতখানি তালি দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে ওকে কলেজে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি।

আমি রানীমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করলাম—"ওর ঐ তালি দেওয়া জামাটি ছাড়া আর কোনো আস্ত জামা নেই বুঝি?"

তিনি বললেন—"তা থাকবেনা কেন? আরো জামা রয়েছে। ও ইচ্ছে করেই ওটা পরে গেল।"

"আপনি বারণ করলেন না কেন? কেউ হয়তো কিছু বলতে পারে, তাতে ওর মনে কষ্ট হতে পারে।"

"তেমন মন ওর নয়। ও জানে যে নতুন জামা আর তালি দেওয়া জামাতে কোনো তফাৎ নেই, কেবল ময়লা না হলেই হলো। জামাতে কিছুই তফাৎ হয়না, তফাৎ হয় কেবল অভ্যাসে। তালি দেওয়া জামা পরাটা ও অভ্যাস করে নিয়েছে। তেমনি আমরা যে গরিব হয়েছি, সে কথাও ও মেনে নিয়েছে। কেউ গরিব বললেও ওর তাতে দুঃখ হবে না।"

এর উপরে আমি আর কোনো কথাই বলতে পারিনি।

এর কয়েকদিন পরে এঁদের কোনো নিকট আত্মীয়ের বাড়ি থেকে আমি এক বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। এঁদের দ্বারাই তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতেও রোগী দেখতে শুরু করেছিলাম। তাঁরা মস্ত ধনী লোক। খুব সমারোহের সঙ্গেই তাঁদের বাড়িতে উৎসব লেগেছে।

বাড়ির পিছন দিকের বিস্তৃত লনে মস্ত বড়ো সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। একদিকে দেশী নহবৎ বাজছে, একদিকে বিদেশী ব্যাণ্ড বাজছে। সারা রাস্তাটি মোটরে মোটরে ছেয়ে গেছে। আমি কোনোমতে গাড়ির ভিড় ও লোকের ভিড় ঠেলে সামিয়ানার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে কে কার খোঁজ নেয় তার ঠিক নেই, আমার পরিচিত কাউকেই দেখলাম না।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, আর কি করা যায় তাই ভাবছি, এমন সময় একটি অতি সুসজ্জিতা সুন্দরী মেয়ে হাসতে হাসতে ছুটে এসে একেবারেই আমার হাত ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি অবাক হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম বটে, কিন্তু কে নিয়ে যাচ্ছে আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না।

লনের আরো পিছন দিকে যেখানে সে আমাকে নিয়ে গেল, সেখানে চেয়ার দেওয়া কয়েকটি ছোটো ছোটো টেবিল ফাঁক ফাঁক করে সাজানো রয়েছে। দেখে বুঝলাম যে কোনো বিশিষ্ট অতিথি এলে তাকে আলাদা করে খাইয়ে দেবার জন্যে এখানে এমনি বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। দুই চার জন সম্ভ্রান্ত অতিথি সেখানে খেতেও বসে গেছে। বাড়ির কেউ কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়াচ্ছে।

একটি ফাঁকা টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়েটি আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিলে। তারপর কৃত্রিম মিহি গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—"একটু আইসক্রীম এনে দিই?"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তখন সে খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে—"আমাকে মোটে চিনতেই পারলেন না?"

তখন বুঝতে পারলাম, সে রানীমায়ের মেয়ে সেই অপর্ণা। এতই বেশী সেজেছে, মুখে রঙ মেখেছে, চোখে কাজল টেনেছে, ঠোঁটে লাল রঙ দিয়েছে, যে তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তাকে আর এখন মোটে চেনা যায় না।

আমি বললাম—"সেজেগুজে তুমি এত বেশী সুন্দর হয়ে গেছ যে তোমাকে আর চিনতেই পারছিনা।"

সে বললে—"কি করি বলুন, এদের বাড়িতে এলে এদের মতো করে সাজতেই হবে।"

আমি বললাম—"খাবার কথা পরে হবে। কিন্তু তোমার এই চেহারার একটি ফোটো তুলে নিতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে।"

অপর্ণার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—"নকল চেহারার ছবি নেওয়া কি ভালো? মা বলেন, যা সত্যিকার জিনিস নয়, তা কখনই ভালো নয়। মা শুনলে রাগ করবেন।"

আমি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে গেলাম। সে কথার কোনো জবাবই দিতে পারলাম না।

আরো একদিনের কথা বলি। সেদিন রানীমা পূজোয় বসেছিলেন, আমি পাশের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পূজো থেকে উঠে আসতে একটু তাঁর দেরি হলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"পূজোয় বুঝি আপনার অনেক সময় লাগে?"

তিনি একটু হেসে বললেন—"তা নয়, আজই একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি এসে বসে আছেন তা আমি জানতে পারিনি। ওতে বেশী সময় দিতে গেলে আমার চলবে কেন। ও ছাড়া আরো অনেক কাজ রয়েছে, সবই তো করতে হবে। কেবল পূজো নিয়ে থাকলে কি আমার চলবে?"

"তবে ও পূজো কেনই বা করেন? মন্তর নিয়েছিলেন বুঝি?"

"তা নয়, এমনিই একটু করি। কেন, তা কি অন্যায় বলে আপনি মনে করেন? ভগবানকে সকলেরই তো স্মরণ করা উচিত।"

"নিশ্চয় উচিত, কিন্তু কেমন ভাবে করেন তাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম। হয়তো এ প্রশ্ন করা অনুচিত—"

তিনি বললেন—"না, অনুচিত কেন হবে, আমি যেমন বুঝি তাই বলছি।

আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি যে-কাজ আমাকে দিয়েছেন তা যেন আমি ঠিক ভাবে করতে পারি। আমার স্বামীও তাই বলতেন। তিনি বলতেন যে আমরা কেবলই ভুল বুঝে মনে করি নিজের কাজ করছি, তাই এক রকমের ফল হলে খুশি হই, অন্য রকমের ফল হলে দুঃখ পাই। কিন্তু যখন বুঝবো যে কাজও তাঁর ফলও তাঁর, আমি কেবল কাজ করবার যন্ত্র, তাহলে কোনো কিছুতে দুঃখ থাকবে না। উনিও এই মনোভাব নিয়ে সব কিছু কাজ করে গেছেন, বিষয় সম্পত্তি কোনো জিনিসকেই নিজের বলে মনে করতেন না। তাই জীবনে উনি কোনোদিনই দুঃখ পাননি। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেশ উদ্ধারের ব্রত নিয়েছিলেন, দেশের কাজের জন্যে ভগবান দিতে বলেছেন বলে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তিনি দুহাতে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর তুলনায় আমি কিই বা করছি। তবু ভগবানকে একটু স্মরণ রাখতে চেষ্টা করি।"

এই কথাগুলি শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমন গুছিয়ে কথাগুলি তিনি বললেন যাতে বুঝলাম, এই তাঁর অন্তরের কথা। আর যে স্বামী তাঁকে এত নিঃস্ব করে রেখে গেছেন, তাঁর প্রতি এমন প্রগাঢ় ভক্তি দেখে আমি আরো বেশী মুগ্ধ হলাম।

ওঁর চিকিৎসার জন্যে প্রায় এক বছর যাবৎ আমায় সেখানে যাতায়াত করতে হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমার সেখানে আর যাবার দরকার হলো না।

এর পর ছয় সাত বছর পার হয়ে গেছে। যদিও আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে ওঁদের খবর পেয়েছি। শুনেছিলাম বড়ো ছেলেটি খুব বিদ্বান হয়েছে, এম্. এ. পাস করে সে ডক্টরেট্ উপাধি পেয়েছে। দিল্লীতে কোনো কলেজে তার প্রফেসরের চাকরি হয়েছে, সেখানেই সে আছে।

হঠাৎ একদিন আমার ডাক্তারখানায় সেই বড়ো ছেলে এসে হাজির হলো। নমস্কার করে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে শেষে আমার হাতে একখানি বন্ধ করা খাম দিলে। খামটি খুলে দেখি, তার মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট রয়েছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ টাকা কিসের?"

সে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললে—"আপনি মায়ের চিকিৎসা করেছিলেন, সে সময় আপনাকে কিছু দিতে পারিনি। এখন আমি উপার্জন করছি, মা বললেন এই টাকা তুমি ডাক্তারবাবুকে দিয়ে এসো।"

আমি বললাম—"এত টাকা আমার তো পাওনাই হবে না।"

সে বললে—"কত পাওনা হয়েছে তার তো কোনো হিসেব আমরা রাখিনি, আপনিও রাখেন নি। মা বললেন, এর চেয়ে বেশীই পাওনা হবে। কিন্তু এতেই আপনি খুশি হবেন। মা যেমন বললেন তাই আমি বলছি।"

আমি বললাম—"খুব খুশি হয়েছি। তুমি যে উপার্জন করে মায়ের দেনা শোধ করলে, এতেই আমি খুশি হয়েছি। মাকে আমার নমস্কার দিও।"

উঁচু মন আর বড়ো হৃদয় যাকে বলে, তার পরিচয় সেদিন পেয়ে গেলাম।

॥ পঁচিশ ॥

কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এখনও কিছু বলাই হয়নি। তাঁর ডাক্তার হওয়ার সৌভাগ্য এমনিতেই আমার হয়নি। তিনি ছেলের মতো স্নেহ করতেন বলেই তা হতে পেরেছিল। যখন ডাক্তারি পড়ছি তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়, তখনই তিনি আমাকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করতেন। সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় হলেও, কেন জানিনা, তখন থেকেই আমি তাঁর স্নেহভাজন হয়ে পড়ি। পাস করবার পরে চাকরি যখন হয়নি, চুপচাপ বসে আছি, তখন তিনি বোলপুরে নিয়ে গিয়ে কিছুকাল আমাকে সেখানে খুব যত্নের সঙ্গে রাখেন, অতিথির মতো নয়, নিজের একজন ঘরের লোকের মতো। সে সময় তিনি নিজেই আমাকে কিছু গান শিখিয়েছিলেন। পরে যখনই তিনি কলকাতায় আসতেন তখন প্রায়ই আমাকে চিঠিতে সে কথা জানিয়ে দিয়ে লিখতেন, বাগবাজারের রসগোল্লা আর 'ভাপা দই' যেন বাদ না যায়। কলকাতায় একাধিক বার আমাদের বাড়িতেও তিনি পদার্পণ করে গেছেন। এমন কি যখন আমি বারাসতে বদলি হয়ে যাই, তখন তিনি থাকতেন গঙ্গায় নৌকাবক্ষে, তিনি বলেছিলেন বারাসতে একবার যাবেন আমার ওখানে, শেষ অবধি তা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে কথা যাক, এগুলি নিতান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি যে তাঁর বুকে আমার ডাক্তারি ষ্টিথোস্কোপের চোঙা বসিয়ে পরীক্ষা করেছি, তাঁর গায়ে ইন্‌জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়েছি, এই তো এখন এক বলবার মতো কাহিনী।

মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে ভুগতেন। বিশেষত

যখন কলকাতায় এসে থাকতেন। এখানকার ধোঁয়া ধূলোর আবহাওয়া বোধ হয় তাঁর সহ্য হতোনা। নাকে কিংবা বুকে নয়, কিন্তু প্রায় গলার মধ্যেই তাঁকে এ রোগ আক্রমণ করতো। থেকে থেকে তখন তিনি গলা খাঁকরি দেবার মতো একটা শব্দ করতেন। যেন গলাটা বুজে গেছে, তাই গলা ঝেড়ে বারে বারে ভিতরটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার হচ্ছে। এই শব্দ যখনই তাঁর গলায় শোনা যেতো তখনই বুঝতাম, আবার গলার মধ্যে কিছু গণ্ডগোল বেধেছে।

এতেই তাঁর শরীরকে মাঝে মাঝে খুব কাবু করে ফেলতো। তিনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। তার কারণ ওর সঙ্গে একটু একটু জ্বরও হতো। তিনি অবশ্য তাতে কিছু গ্রাহ্য করতেন না, তাই নিয়েই সব কিছু কাজ করতেন। বাইরের লোকে কিছু বুঝতেই পারতো না। কিন্তু বাড়ির লোকেরা, আর বিশেষত তাঁর পুত্রবধূ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। ডাক্তার সরকারকে ডেকে আনা হতো। তিনি দামী দামী ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে যেতেন। বাথগেট কোম্পানি থেকে যথাকালে তা আনানোও হতো। কিন্তু সে ওষুধ প্রায়ই টেবিলে পড়ে থাকতো, তিনি পারতপক্ষে তার এক দাগও খেতেন না। বৌমা জোর জবরদস্তি করতে থাকলে দুই একবার খেতেন মাত্র। ডাক্তারি ওষুধ খাওয়া তিনি যেন পছন্দই করতেন না। নিজের কাছে থাকতো নানারকম বায়োকেমিক ওষুধের মিষ্টি মিষ্টি গুলি, সেইগুলোই প্রায় খেতেন। বায়োকেমিক ওষুধের উপর তাঁর খুব আস্থা ছিল। এমন কি অন্যের উপরেও ডাক্তারি করে তিনি সে ওষুধ প্রয়োগ করতেন।

যে কারণেই হোক, একবার কোনোগতিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরলে তাঁর সেরে উঠতে খুব বিলম্ব হতো। দিনের পর দিন ভুগেই চলেছেন, নিরানব্বই জ্বরটুকুও ছাড়চে না। এই রকম অবস্থা হতে দেখে একবার আমি বললাম—"একটা ইন্‌জেকশন নিয়ে দেখুন না, ভালো হবে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার এক রকম ইন্‌জেকশন আছে, এই ধরনের ঘিন্‌ঘিনে অসুস্থতা তাতে অনেক সময় বেশ সেরে যায়। দেখবেন একটা নিয়ে?"

তিনি বললেন—"ইন্‌জেকশন নিতে আমি রাজী আছি, সামান্য একটু ফোঁড়াফুঁড়িকে আমি ভয় করিনা। কিন্তু ঐ বিকট রকমের ওষুধগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় গেলানো, এ হলো সেকেলে বর্বর যুগের রীতি। ওতে হয়তো প্রাণরক্ষা হতো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণান্তও হতে হতো। এখনকার দিনে ও রীতি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। তাই আমি বায়োকেমিক ওষুধগুলো পছন্দ করি।

ইনজেন্‌কশনে যদি কিছু ফল হবে বলে আশ্বাস দাও তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু সে কিসের ইন্‌জেকশন ?”

আমি বললাম—“নতুন কিছু নয়, তাকে বলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্‌সিন।”

“জিনিসটা কি, আগে আমাকে বুঝিয়ে বলো।”

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের নানা জীবাণুকে মেরে ফেলে তার থেকে ভ্যাক্‌সিন তৈরি হয়, তার ইন্‌জেকশন দিলে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে উত্তেজিত করা হয়। তাতেই ফল হয়।

সব কিছু শুনে তিনি বললেন—“এ কৌশলটা মন্দ লাগছে না, বিষস্য বিষমৌষধি, হোমিওপ্যাথির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু একটা ইন্‌জেকশনেই কিছু ফল পাবো তো ?”

আমি বললাম—“তা বলতে পারি না, একটাতে না হয়, দুটো নেবেন।”

“আচ্ছা আমি রাজী আছি। দাও আমাকে ফুঁড়ে ইন্‌জেকশন, আমারই দেহের উপর দিয়ে তোমার এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে যাক। কিন্তু বৌমাকে এ কথা জানতে দিও না, কাউকেই জানতে দিও না। চুপি চুপি দিয়ে দাও, দেখি কি হয়।”

আমার গাড়িতেই ব্যাগ ছিল। তার থেকে সিরিঞ্জ এবং ভ্যাক্‌সিনের শিশিটি বের করে এনে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিলাম।

দুটি মাত্র ইন্‌জেকশনেই বেশ কাজ হলো। জ্বর ছেড়ে গেল, গলার কষ্ট কমে গেল, তিনি সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। এ চিকিৎসায় খুশি হলেন।

এর পর থেকে তাঁর এই চিকিৎসাই পছন্দ হতো। যখনই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হতো তখনই দুই একমাত্রা ভ্যাক্‌সিন ফুঁড়ে নিতেন, তাতে উপকারও পেতেন। তখন তিনি এ কথা নিজের বাড়িতে রাষ্ট্র করে দিলেন। বৌমাও জানলেন, সকলেই জানলেন। তখন বৌমার সামনেই ইন্‌জেকশন দিতাম।

কবি হাসতে হাসতে বৌমার দিকে চেয়ে বলতেন—“এ বেশ সুন্দর চিকিৎসা, কোনো হাঙ্গামা নেই। টুক্ করে এমন ফুটিয়ে দেয় যে প্রায় টের পাওয়াই যায়না। ডাক্তার, তুমি বৌমাকেও একটা দিয়ে দাও। আগের থেকে দেওয়া থাকলে আর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ধরবেনা, প্রিভেন্‌শন, কি বলো ?”

প্রতিমা দেবী তাই শুনে কেবল হাসতেন।

রবীন্দ্রনাথের মুখে ইন্‌জেকশনের এত প্রশংসা শুনে একদিন অবনীন্দ্রনাথ আমাকে ধরলেন। বাতে তিনি অনেকদিন থেকেই কষ্ট পাচ্ছেন, কোনো ওষুধে বিশেষ উপকার হয়না। তিনি বললেন—“অমনি কোনো ইন্‌জেকশন

দিয়ে তুমি বাতটা আমার সারিয়ে দাও দেখি, আমি তাহলে তোমাকে আমার নিজের আঁকা ভালো একটি ছবি উপহার দেবো।”

দাদাবাবুর বাতের চিকিৎসা করে আমার ও বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি অবনীন্দ্রনাথকে সেই ধরণের ওষুধই দিলাম। তিনিও তাতে যথেষ্ট উপকার পেলেন। তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা তিনি ভোলেননি, কিছুকাল পরে আমার বাড়িতে তাঁর নিজের হাতে আঁকা একটি ছবি পাঠিয়ে দিলেন। ‘মালিনী’র ছবি।

একটি দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে, চিরদিনই মনে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের আবার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাঁর বাড়িতে গেছি, ইন্‌জেকশন দিতে। তার আগের দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দার্জিলিংএ মারা গেছেন, সকালে তাঁর মৃতদেহ কলকাতায় এনে বিরাট শোভাযাত্রা করে কেওড়াতলার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অত বড়ো বিরাট শোভাযাত্রা ইতিপূর্বে কলকাতায় কখনো দেখা যায়নি।

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই নিয়েই তখন কথাবার্তা হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনকে খুবই ভালোবাসতেন, তিনি তাঁর নানারকম গুণের কথা বলছিলেন। এমন সময় ডাক্তার রায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে আরো কে একজন ছিলেন।

ডাক্তার রায় চিত্তরঞ্জনের মৃতদেহের একখানি ফোটো নিয়ে এসেছিলেন। সেখানি তিনি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে বললেন—“এই ছবি ছেপে বিক্রি করে আমরা দেশবন্ধুর স্মৃতিমন্দিরের জন্যে টাকা তুলতে চাই। এর তলায় যদি আপনি দু’লাইন কিছু লিখে দেন, তাহলে ছবিটার আরো দাম বাড়বে।”

রবীন্দ্রনাথ বললেন—“তোমরা তাহলে বোসো এখানে। আমাকে পাশের ঘরে একবার যেতে হবে। তোমরা ততক্ষণ এখানে বসে গল্প করো।”

ছবিটি হাতে নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন। তখন তাঁর শরীর খুবই অসুস্থ, গায়ে জ্বর আছে। ইন্‌জেকশন দেবার সিরিঞ্জ প্রভৃতি সামনে রেখে আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। ডাক্তার রায়কে দেখে আমি তাড়াতাড়ি সেগুলি পকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম। মনে মনে জানলাম, আজ আর ইন্‌জেকশন দেওয়া হবেনা।

মাত্র দুই মিনিট পরেই রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন। নিঃশব্দে ছবিখানি তিনি ডাক্তার রায়ের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। আমরা

সকলেই তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, ছবির নীচে তিনি তাঁর চমৎকার হস্তাক্ষরে দুটি লাইন লিখে দিয়েছেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

অত্যধিক বিস্ময়ে আমরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকলাম। এমন দুটি চিরস্মরণীয় লাইন দুমিনিটেই উনি কেমন করে লিখে আনলেন!

ডাক্তার রায় ছবি নিয়ে চলে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ অল্প কিছুক্ষণ কথা না ব'লে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তবে পরেই একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"কিহে ডাক্তার, তোমার যন্ত্রপাতি কোথায় লুকিয়ে ফেললে? বের করো, বের করো, তোমার কাজটা বাদ যায় কেন। আমার কাজ কলমের খোঁচা দেওয়া, তোমার কাজ ছুঁচের খোঁচা দেওয়া। দিয়ে দাও, আমি প্রস্তুত।"

শুধু ইন্‌জেকশন দেওয়া নয়, অতঃপর আরো কিছু ডাক্তারি আমাকে সেখানে করতে হতো। তরুণ অবস্থার জ্বরটা সেরে গেলেও ইনফ্লুয়েঞ্জার জেরটুকু কিছুকাল পর্যন্ত থেকে যেতো, সেই তাঁর গলার অস্বস্তি আর গলা পরিষ্কার করবার অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া সহজে ছাড়তে চাইত না। তাই সময়ে অসময়ে তাঁকে ঐরূপ গলা খাঁকরি শব্দ করতে হতো। সে অবস্থায় কোনো অভিনয় প্রভৃতি থাকলে ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অমন শব্দ করতে থাকা তাঁর পক্ষে অশান্তির কারণ হয়ে উঠতো। তাই একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এর কোনো উপায় আছে কিনা। আমি বললাম—"একেবারে সারানোর উপায় না থাকলেও ওকে থামানোর উপায় আছে। গলার মধ্যে যদি আগের থেকে কয়েকবার ক্লোরেটোন স্প্রে করে দেওয়া যায়, তাহলে কিছুক্ষণের জন্যে গলার ভিতরটা স্নিগ্ধ হয়ে থাকে, গলার খুস্‌খুস্নি সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত হয়ে যায়।"

সেই ব্যবস্থাই করা হলো। "চণ্ডালিকা," "তাসের দেশ," "নটীর পূজা", প্রভৃতি যখনই কোনো অভিনয় করা হতো, আমি তার-আগের থেকেই গ্রীণরুমে উপস্থিত থাকতাম, স্প্রে দেবার যন্ত্রটি নিয়ে। তিনি ষ্টেজে নামবার আগেই তাঁর গলার মধ্যে বারকতক স্প্রে দিয়ে দিতাম। তাতে বেশ কাজও হতো, সাময়িক ভাবে গলাটি পরিষ্কার থাকতো। তখন থেকে এই নিয়মই বহাল হয়ে গেল, কোনো কিছু অনুষ্ঠানের আগে ডাক্তার রূপে স্প্রে নিয়ে

আমার সেখানে হাজির থাকা চাই। শুধু তাঁর নিজের জন্যেই নয়। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জন্যেও তিনি আমাকে থাকতে বলতেন। এতে আমারও অবশ্য যথেষ্ট লাভ হয়ে যেতো, বিনা অর্থব্যয়ে বার বার তাঁর সেই অভিনয় দেখা। কত লোক টিকিট পাচ্ছেনা, কিন্তু আমার অবারিত দ্বার।

ষ্টেজে গিয়ে দাঁড়াবার আগে মনে মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা জিনিসটা অনেকেরই মধ্যে এসে থাকে। যদি গলার স্বরটা ঠিক মতো তুলতে না পারি, যদি ভালো করে নাচতে না পারি, ইত্যাদি। বিশেষ করে এটা হয় মেয়েদের মধ্যে। ছোটো ছোটো কিশোরী মেয়েরা, কেউ বা ওঁদের আত্মীয়া, কেউ বা আশ্রমের ছাত্রী, তারা রবীন্দ্রনাথের গলায় স্প্রে দেওয়া দেখে আমার কাছে ছুটে আসতো। কেউ বলতো, আমার গলাতেও একটু দিয়ে দিন না। কেউ বলতো, আমার বুকটা ধড়ফড় করছে, একটু দেখুন না। কেউ বলতো, হঠাৎ মাথাটা ঘুরছে, কি করি বলুন তো। কাজেই তার আশু প্রতিকারের ব্যবস্থাও আমাকে করে রাখতে হতো। দু একটা ষ্টিমুল্যাণ্ট ওষুধ, কিছু কড়া রকমের স্মেলিং সল্ট, ডাক্তারি সুস্বাদু লজেঞ্জ এই সব একটি ব্যাগের মধ্যে ভরে আমার সঙ্গে রাখতাম। যার পক্ষে যেমন দরকার প্রয়োগ করতাম। এতে অভিনয়ের দলের সকলেই আমাকে চিনে গিয়েছিল। তারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতো যে, ডাক্তার যখন সামনেই রয়েছে তখন আর ভাবনা কি। কোনো দিন আমার যেতে বিলম্ব হলে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো। আমি গিয়ে উপস্থিত হলেই বলতো—"এত দেরি করলেন! আসুন আসুন, শিগগির আসুন, অমুক মেয়েটির বুক ধড়ফড় করছে, কথা বলতে পারছে না।" কবিও কৃত্রিম ব্যগ্রতা দেখিয়ে বলে উঠতেন—"যাও যাও, শিগগির দেখগে, তোমাকে না দেখতে পেয়ে বেচারা অন্য কাউকে হয়তো হৃদয়দান করে ফেললে, তোমার ভাগে বুঝি শূন্য পড়ে গেল।"

"বর্ষামঙ্গল" প্রভৃতি গানের উৎসবের আগেকার কয়েকটা দিনের জমাট রিহার্সালেও আমি প্রত্যহ যেতাম। রবীন্দ্রনাথের গলার জন্যে স্প্রে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, সেখানেও যদি তাঁর দরকার হয়। কিন্তু নিতান্ত দরকার না হলে তিনি এ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি বলতেন—"ওহে, ঐ গুপী যন্ত্রটা এখানে এনেছ কেন? লুকিয়ে ফেল, ওটা দেখলেই অনেকের এখনই গলা খুসখুস্ করবে। এখন আর তুমি ডাক্তার নও, বসে যাও গায়কদের দলে। গাও আমাদের সঙ্গে।" আমারও তো নতুন নতুন গানগুলো শিখে নেবারই

মতলব, সেই লোভেই প্রত্যহ যাই। আমি তৎক্ষণাৎ দলে বসে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতাম—

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে,
সেই আগুনের কালো রূপ যে
আমার চোখের 'পরে নাচে রে—"

তারপর জোড়াসাঁকোর পিছনের বাগানে যখন বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হলো তখন পুরুষ গায়কদের মধ্যে আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে হলো।

এমনি কত বছর ধরে কত দিন গিয়েছি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কত আষাঢ় শ্রাবণের ঘোরালো সন্ধ্যায় বর্ষামঙ্গল গাইতে। আমি যে একজন ডাক্তার, সে কথা তখনকার মতো ভুলে গেছি। 'বিচিত্রা'র বাড়িতে দোতলার সেই লম্বা হলঘরে প্রকাণ্ড গানের আসর জমে উঠেছে। মাঝখানে দিনু বাবু তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে বসে মূল গায়েন হয়ে আমাদের এক এক কলি গানের সুর ধরিয়ে দিচ্ছেন, পাশে অবনীন্দ্রনাথ বসে এক মনে তাঁর এসরাজটি বাজাচ্ছেন। আর সমবেত মেয়ে পুরুষে আমরা কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছি—

"ঝরঝর বরিষণে বহুযুগের ওপার হতে
আষাঢ় এলো আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝর ঝর বরিষণে—"

ইতিমধ্যে বাইরে কখন প্রবল বর্ষা নেমে গেছে, ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাইরের বারান্দা জলের ছাটে ভেসে যাচ্ছে। উন্মত্ত জোলো হাওয়া সময় বুঝে বড়ো বড়ো সার্শিগুলোকে কাঁপিয়ে হু-হু করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। আমরা গানের আস্থায়ী থেকে সঞ্চারিতে যাবার নতুন নতুন সুরের আনন্দে আর সেই বৃষ্টি ভেজা দমকা বাতাস লাগার আনন্দে ভিতরে বাইরে শিউরে শিউরে উঠছি। সে দুর্লভ আনন্দের শিহরণ কখনো কি ভোলবার! এখনও ছবিটা যেন চোখের উপর ভাসছে।

আরো মনে পড়ছে, কত অত্যাচারই তাঁর উপরে করেছি! কত রকমের আবদারই তাঁকে সইতে হয়েছে। আমার প্রতি সত্যিকার স্নেহ থাকার দরুন কোনো কিছুতেই তিনি আমাকে বিমুখ করেন নি। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে কতবার তাঁকে আমাদের বাড়িতে জোর করে ধরে এনেছি। বাড়ির কারো সন্তানাদি জন্মালে তাঁকে ধরেছি নতুন নতুন নামকরণ করে দেবার জন্যে, তাও তিনি করে দিয়েছেন। কত জনের অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে গিয়ে সামনে ধরেছি, দুচার লাইন কবিতা লিখে দিতে হবে। অম্লানবদনে তাও তিনি

লিখে দিয়েছেন। একবার বললাম, "উন্মোচন" বলে এক মাসিকপত্র আমরা বের করছি, তার প্রথম পাতার জন্যে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার চিঠির জবাবে খামের মধ্যে লিখে পাঠালেন—

"হে উষা, নিঃশব্দে এসো, আকাশের তিমির গুণ্ঠন
করো উন্মোচন।
হে প্রাণ, অন্তর থেকে মুকুলের বাহ্য আবরণ
করো উন্মোচন।
হে চিত্ত, জাগ্রত হও, জড়ত্বের বাধা নিশ্চেতন
করো উন্মোচন।
ভেদবুদ্ধি তামসের মোহ যবনিকা, হে আত্মন্
করো উন্মোচন॥"
—১৪ই মাঘ, ১৩৪১, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাড়ার ক্লাব থেকে তাঁর জন্মদিনে এক প্রশস্তি লিখে পাঠানো হলো, আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে এটা আমাদেরই ক্লাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার একটি চমৎকার জবাব লিখে পাঠালেন।

আমি এক ডাক্তারি বই লিখলাম, ট্রপিক্যাল রোগগুলি সম্বন্ধে; তাঁকে ধরে বসলাম, এ বইএর একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে। তিনি তাতে আট পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধের মতো এক সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিলেন। তার থেকে এখানে কিছু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—"ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যকার কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের। আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে মন দেয় প্রাণের দায়ে আবার সেই কারণে প্রাণের দায় দুরূহ হয়ে ওঠে।...একে তো অভিজ্ঞ ডাক্তার বহুমূল্য, তার উপরে তাঁরা প্রায়ই অভিজ্ঞ শুশ্রূষার দাবী করেন। ব্যয় সম্বন্ধে একে বলা যায় ডবল ব্যারেল বন্দুক। রোগীরা এই রাস্তা দিয়ে কখনো ধনে কখনো ধনে-প্রাণে মরে। উপস্থিত বইখানি ঘরের কোনো কোনো লোক যদি পড়ে রাখেন তবে তাঁদের শুশ্রূষায় হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হয়ে তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।...আর যাই হোক, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে এ বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তই এখানে দিলাম, এমনি আরো কত অত্যাচারই যে তাঁর উপর করেছি তার সংখ্যা নেই। শুধু কলকাতায় নয়, বোলপুরে গিয়েও তাঁর উপর কত জুলুম করেছি। নানা ভাবে নানা পোজে তাঁর ছবি তুলেছি, আর্টিষ্ট নিয়ে গিয়ে যেমন খুশি ছবি তুলিয়েছি। এই ধরণের অত্যাচার সবই তিনি নির্বিবাদে সহ্য করে গেছেন। কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি।

অথচ আমার তরফ থেকে অনেক বারই সমুচিত শ্রদ্ধা প্রকাশের অভাব ঘটেছে। আমি বেপরোয়া হয়ে তাঁর সঙ্গে কতবার তর্কও করেছি, ঝগড়াও করেছি।

কয়েক বছর পরে যখন তাঁর প্রস্‌টেট গ্ল্যাণ্ডের রোগের সূত্রপাত হয়, তখন সে-কথা তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি ঐ গ্ল্যাণ্ডের বিকৃতি নিবারক দামী দামী ওষুধ বিলাত থেকে আনিয়ে দিলাম। সেগুলিতে কিছুই ফল হলোনা। তখন তিনি বললেন, তোমাদের খাবার ওষুধগুলো কিছুই না, ওর চেয়ে আমার বায়োকেমিক ওষুধ ভালো।

তাঁর শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বিশ্রাম নেবার জন্যে তিনি মংপুতে গিয়ে কিছুকাল রইলেন। ঐ সময়ে আমি খাদ্য ও হজম ক্রিয়ার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেগুলি মংপুতে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তার সম্বন্ধে মংপু থেকে কোনো খবর পেলাম না। তিনি পড়ে দেখেছেন কিনা তাও জানলাম না। মনে করলাম অসুস্থ হয়ে পড়াতে তিনি সেগুলি হয়তো দেখতেই পাননি।

তিনি মংপুতে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হয়েছিল। শুনলাম যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা তাঁর চিকিৎসা করছেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখবার পর্যন্ত কোনো উপায় নেই। বাইরের কোনো লোক ওঁর কাছে যাওয়া তাঁরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা জেগে রইল। খবরের কাগজে পড়লাম, তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। তারপর অকস্মাৎ তিনি একদিন নিজেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওঁর ছেলে রথী বাবু আমাকে লোক মারফৎ খবর পাঠালেন যে উনি আমাকে একবার ডেকেছেন।

সেই দিনই গিয়ে দেখা করলাম। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন, মেয়েরা তাঁর সেবা করছে। শরীর খুব রোগা দেখাচ্ছে। অতি ক্ষীণ স্বরে তিনি কথা বলছেন। সেই অবস্থাতেই আমাকে বললেন—"তোমার লেখাগুলি আমি পড়েছি। খুব ভালো হয়েছে। এগুলি আমি বিশ্বভারতী থেকে বই

করে ছেপে বের করবার অনুমতি লিখে দিয়েছি। সেই খবর জানিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে ডাকলাম। আমি চাই যে তুমি এই রকম জিনিস আরো লেখো। এতে লোকের উপকার হবে।"

আর বেশী কথা তিনি বললেন না। সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

এর পরে তিনি বোলপুরে গিয়ে কিছুকাল ছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় আনা হয় অপারেশন করতে। অপারেশনের পরে তাঁর কোমার অবস্থা হয়, আর সেই অবস্থাতেই তিনি দেহরক্ষা করেন। এ কথা সকলেই জানে।

শেষ দিনে তাঁকে একবার দেখবার জন্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাই। তখন চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। আমি অনেক কষ্টে দোতলায় তাঁর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করি। তখন তিনি অন্তিম শয্যায়। সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছেন, নিঃশ্বাসটুকু নিচ্ছেন মাত্র। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। মেয়েরা মৃদুগুঞ্জনে উপনিষদ্ আবৃত্তি করছে।

আমি পায়ের আবরণবস্ত্র তুলে ধীরে ধীরে তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে এলাম।

॥ ছাব্বিশ ॥

সুকৃতির ছোটো মেয়েটি সেদিন মারা গেল। ডিফ্থিরিয়া হয়েছিল।

সুকৃতির গল্পটা এখানে বলব। সে গল্প কিছুকাল আগের থেকে শুরু, তা এমন কিছুই উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু ঐ ছোটো মেয়েটি মারা যাবার পর থেকে আমার কাছে তা অসামান্য হয়ে উঠেছে। তার কথা সহজে ভুলতে পারছি না।

সুকৃতির ইতিহাস বলতে গেলে, আগে তার মায়ের কথা বলতে হয়। আপন মা নয়, সুকৃতি হলো কমলিনীর পালিতা কন্যা।

কমলিনী একজন অভিনেত্রী। অভিনয়ে তার খ্যাতি ছিল, থিয়েটারে ভালোই উপার্জন করতো। তা ছাড়া সে ছিল হালদারবাবুর রক্ষিতা। যদিও তাকে রক্ষিতাই বলতে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর মতোই। প্রায় দশ বছর আগে বিপত্নীক হবার পর থেকে হালদারবাবু ওকে পাকাপাকি হিসাবে রেখেছিলেন, স্ত্রীর মতোই তার সঙ্গে আচরণ করতেন। সেও তাঁকে স্বামীর মতোই দেখতো, মাথায় সিঁদুর পর্যন্ত দিতো। এমন কি তার অন্তরের

ঐকান্তিক বাসনা ছিল, তার যেন ছেলেপুলে হয়, সে যেন একটি সন্তানের জননী হয়। কিন্তু এ বাসনা তার পূরণ হয় নি।

হালদারবাবুর তিন কূলে কেউ নেই। অথচ তাঁর যথেষ্ট আয়। এ পাড়ার বড়ো রাস্তার ধারে তাঁর পৈতৃক বাড়িখানিকে তিনি চারতলা ব্যারাক বাড়িতে পরিণত করেছিলেন। সুকৌশলে প্ল্যান করে তাতে ছোটো বড়ো আলাদা আলাদা নয় দশখানি ফ্ল্যাট বানিয়েছিলেন। একটি মাত্র নীচেকার ফ্ল্যাট নিজের জন্যে রেখে সবগুলিকেই তিনি ভাড়া দিয়েছিলেন। ঐ থেকেই তাঁর প্রচুর আয় হতো। কাজেই তিনি চাকরি-বাকরি অন্য কিছুই করতেন না। প্রত্যহ একবার করে শেয়ার মার্কেটে ঘুরতে যেতেন বটে, শেয়ারের কেনাবেচায় কোনোদিন হয়তো কিছু মিলে যেতো, না মিললেও কোনো ক্ষতি ছিল না। দিলদরিয়া মানুষ, মুক্তহস্তে তিনি অর্থব্যয় করতেন।

একলা মানুষের বাড়িতে একটি চাকর থাকতো মাত্র। রান্নার কোনো হাঙ্গামা ছিল না। প্রত্যহ দুপুরে কমলিনীর বাড়ি থেকে তাঁর খাবার আসতো, ঐ চাকরই তা নিয়ে আসতো। কমলিনী থাকতো দূরে আলাদা এক ফ্ল্যাট বাড়িতে। হালদারবাবু দিনের বেলা সেদিকে যেতেন না, যেতেন কেবল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়। রাত্রে সেখানেই থাকতেন, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করতেন। একটু আধটু মদ্যপানও করতেন। সেই কারণে মাঝে মাঝে তাঁর লিভার বিগ্‌ড়ে যেতো। তখন আমার ডাক পড়তো, শরীর অসুস্থ হলে আমাকে ছাড়া কাউকে তিনি ডাকতেন না, যদিও আমি সবে নতুন ডাক্তার।

হালদারবাবুর ডাকে কমলিনীর বাড়িতেও আমাকে মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে। তার আবার হাঁপানির রোগ ছিল। সে রোগটি বেড়ে উঠলেই হালদারবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, আমাকে এ পাড়া থেকে সে পাড়ায় টেনে নিয়ে যেতেন। তার জন্যে তখন তিনি ডবল ফী দিতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তারখানায় বসে আছি, মনে আছে সেটা দেয়ালীর দিন। চারিদিকে সাজানো প্রদীপের আলোকমালা জ্বলছে। এক ট্যাক্সি এসে হাজির হলো ডাক্তারখানার সামনে। তার ভিতর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন হালদারবাবু। আমার সামনে এসেই বললেন—"তাড়াতাড়ি একবার চলুন ডাক্তারবাবু, মহা বিভ্রাটে পড়ে গেছি। উঠে পড়ুন, দেরি করবেন না।"

আমি বললাম—"ব্যাপারটা কি তাই আগে বলুন।"

"সে কথা এখানে বলবার নয়, সেখানে গিয়েই শুনবেন।"

"একটু দাঁড়ান, হাতের কাজটা সেরে নিই। এই ইন্‌জেকশনটা দিচ্ছি—"

"শিগ্‌গির সেরে নিন। দেখছেন না, খুব জরুরী বলেই ট্যাক্সি নিয়ে এমন ভাবে এসেছি।"

ব্যাগ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে উঠলাম গিয়ে কমলিনীর ফ্ল্যাটে। সেখানে গিয়ে দেখি কমলিনী এক সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে, আর পাখা নিয়ে ক্রমাগতই তাকে বাতাস করছে। শিশুটির চোখ জোড়া। সে তাকাচ্ছেও না, ভালো করে শ্বাসও নিচ্ছে না।

এ কি কাণ্ড! জিজ্ঞাসা করতেই কমলিনী কি সব কথা বলতে যাচ্ছিল, হালদারবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—"তুমি চুপ করো, আমি বলছি, তুমি জানো কতটুকু যে বলবে!"

তখন হালদারবাবুর মুখে শুনলাম সব ইতিহাস। একটু আগেই সন্ধ্যার সময় যথারীতি আসছিলেন কমলিনীর বাড়ির দিকে। হঠাৎ গলির ভিতরকার অন্ধকার জায়গাটায় শিশুব গলার কান্নার শব্দ শুনলেন। সেখানে একটা ডাষ্টবিন ছিল, তার কাছে গিয়ে দেখেন, ওর ভিতর থেকেই কান্নাটা আসছে। কাছে ছিল দেশলাই, ডাষ্টবিনের মধ্যে জ্বেলে ধরতেই দেখেন যে কাপড চোপড়ে জড়ানো এই শিশুটি তার মধ্যে পড়ে আছে। ওকে তখনই সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে তিনি কমলিনীর কাছে এনে তার কোলে শুইয়ে দিলেন। পাছে সে ফেলে দেয়, তাই বললেন—"তুমি ছেলে ছেলে করো, এই নাও তোমার ছেলে।" কমলিনী অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড়গুলি সরিয়ে ফেললে। তখন দেখা গেল, ছেলে নয়, মেয়ে। তার নাড়িটা পর্যন্ত কাটা হয় নি, ফুলসুদ্ধ জড়ানো রয়েছে। এখানে আসা পর্যন্ত শিশুটি কাঁদছেও না, চোখ মেলে চাইছেও না, এমনিভাবেই পড়ে আছে। এ কি বাঁচবে?

আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, শিশুর নাড়ি ঠিক চলছে, শ্বাস-প্রশ্বাসও রয়েছে। আর কিছু নয়, জড়ানো কাপড়গুলি খুলে নিয়ে কোলের মধ্যে রাখায় সে কোলের গরম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ব্যাগ থেকে কাঁচি বের করে অ্যালকোহলে একটু পুড়িয়ে নিয়ে তার নাড়ি কেটে দিলাম। স্টেরিলাইজ করা সিল্ক দিয়ে নাড়ি বেঁধে দিলাম।

কমলিনী বললে—"ও যে চোখ চাইছে না, দুধ খেতে দিলে খাচ্ছে না।"

আমি বললাম—"দাঁড়াও দেখছি।" শিশুকে মাটিতে শুইয়ে রেখে এক বালতি গরম জল, আর এক বালতি ঠাণ্ডা জল, আর সাবান আনতে বললাম।

কুসুম কুসুম গরম জলে শিশুর দেহটি ডুবিয়ে ধরে সাবান দিয়ে পরিষ্কার

করে নিয়ে, তার পরে তার গলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সে হাঁপিয়ে চোখ চেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি তখন বললাম—"অল্প একটু চিনির জল গরম করে আনো।" সে চিনির জল এনে দিল। আমার ব্যাগ থেকে একটি কাচের ড্রপার বের করে তাই দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা চিনির জল শিশুর মুখে দিতে থাকলাম। সে দিব্য চুক্‌চুক্ করে তা খেতে লাগল।

একটুমাত্র খেয়ে শিশুটি আবার শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তখন ওদের বললাম—"আপনারা এখনই পুলিসে গিয়ে খবর দিন যে এই শিশুকে ডাষ্টবিনের মধ্যে পাওয়া গেছে। নইলে আপনাদের অন্যায় হবে।"

কমলিনী আমার কথায় হাঁউমাঁউ করে উঠল। সে বললে—"ও কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। ভগবান একে আমার কোলে এনে দিয়েছেন, এ এখন আমার নিজের মেয়ে। পুলিসে কেন খবর দিতে যাবো?"

অগত্যা তার জন্যে বেবি ফুড আর ফিডিং বোতলের ব্যবস্থা করে দিলাম।

দুদিন না যেতেই আবার আমার ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি শিশুটির প্রবল জ্বর, দুই বুকে নিউমোনিয়ার প্যাচ্। আমি বললাম—"দেখচেন তো, নিউমোনিয়া ধরে গেল। একে এখানে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হবে।"

হালদারবাবু বললেন—"তা হোক, আপনি চেষ্টা তো করুন। তার পর আমাদের বরাতজোর, আর আপনার হাতযশ।"

যথারীতি চিকিৎসা শুরু হলো। ইন্‌জেকশন আর অক্সিজেন দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে সে বাঁচল। ঠিক যেন যমে মানুষে টানাটানি।

কমলিনী বললে—"আপনি ওকে অনেক চেষ্টা করে বাঁচিয়ে দিলেন, তাই বাঁচলো। এখন ওর কি নাম রাখা যায় বলুন, সে ভারও আপনার।"

আমি একটু ভেবেচিন্তে বললাম—"তবে ওর নাম রাখো সুকৃতি।"

"বাঃ, এ বেশ ছোট্টো খাট্টো নতুন ধরণের নামটি। কিন্তু মানে কি হলো?"

"সুকৃতি মানে সৌভাগ্য। ওরও সৌভাগ্য, আর তোমাদেরও সৌভাগ্য।"

সেদিন থেকে ওর নাম হলো সুকৃতি।

আমাকে কিন্তু এই সুকৃতি বিস্তর ভোগালে। মাস কতক পরেই ওর আমাশা শুরু হলো। মারাত্মক ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। তখনকার দিনে এক বছর বয়স হবার আগে এই রোগ ধরলে শতকরা পঁচিশ ত্রিশটি শিশু এতে মারা যেতো। তার থেকেও অনেক কষ্টে ওকে বাঁচিয়ে তুললাম। দিব্য সেরে

হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল, গায়ে মাংস লাগল। তারপরে দেখা দিল মাথায় ঘা আর গায়ে ফোড়া। ছোটো বড়ো ফোড়াতে সর্বাঙ্গ ছেয়ে গেল। কতক বা আপনি ফাটলো, কতক বা অপারেশন করতে হলো। ভ্যাক্সিন প্রভৃতি দিতে দিতে তাও কিছুকাল পরে সারলো। তখন বুঝলাম, এ মরবে না, কিন্তু অনেক ভোগাবে।

মেয়েটি ক্রমে ডাগর হয়ে উঠল। দেখতে বেশ ফুট্‌ফুটে, মুখ চোখের গড়নটিও টিকোলো, কিন্তু ভারি চঞ্চল। যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ায়, যা-তা কুড়িয়ে খায়। ছয় সাত বছর যখন বয়স হয়েছে, তখন ওর হয়ে গেল টাইফয়েড। সে অতি মারাত্মক রকমের টাইফয়েড। সঙ্গে টক্সিমিয়া।

মনে করেছিলাম, এবার আর বাঁচবে না। তবুও শেষ পর্যন্ত বেঁচেই গেল। কিন্তু বাঁচলে কি হবে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত বড়ো বড়ো ঘায়ে ভরে গেল। এমন অবস্থা যে তুলোর উপর শুইয়ে রাখতে হতো, শুয়ে শুয়েই তাকে খাওয়াতে হতো। উঠে বসতে পর্যন্ত পারতো না। তিনমাস কাল এই ভাবে ভুগে তবে সে একটু সুস্থ হলো। ওকে নিয়ে বিব্রত হয়ে একদিন আমি ওর মাকে অর্থাৎ কমলিনীকে বলেছিলাম—"ওর নাম রাখা আমাদের ভুল হয়েছে, সুকৃতির বদলে দুষ্কৃতি রাখাই উচিত ছিল।"

কিন্তু সেরে উঠবার পরে আবার সে খুব তাড়াতাড়ি তেমনি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। তখন দেখে কে বলবে যে তার অমন গুরুতর রোগ হয়েছিল। গালের মুখের মাংস পর্যন্ত এমন ভরাট হয়ে উঠল যে ঘায়ের গর্ত করা দাগ-গুলোও তাতে চাপা পড়ে গেল। কিছু কিছু দাগ যদিও রইল বটে, কিন্তু নিরীক্ষণ করে না দেখলে তা বোঝাই যায় না। এমন বাড়ন্ত মেয়ে, যে কোনো কিছুতেই ওর সে বাড় থামাতে পারে না। দেখতে দেখতে মস্ত হয়ে উঠল।

এর পর বছর তিন চার হবে, আমি আর ওকে দেখি নি। নিশ্চয়ই কোনো অসুখবিসুখ আর হয় নি। তাছাড়া হালদারবাবুও তখন মারা গেছেন। কাজেই ওদের খবরও বিশেষ কিছু পাই না। তবে এই পর্যন্ত শুনেছিলাম যে সুকৃতি এখন মানুষ হয়ে ভালোরকম নাচতে গাইতে শিখেছে।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন আবার আমার কমলিনীর ওখানে ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি কী মুশকিলের ব্যাপার! সুকৃতি পূর্ণগর্ভা, আসন্ন-প্রসবা। অথচ তার চোদ্দ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রসবের ব্যথা উঠেছে দুদিন থেকে, কিন্তু কিছুতেই প্রসব হতে পারছে না। ধাত্রী বলেছে ডাক্তার ডাকো, আমার দ্বারা হবে না। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার দ্বারাও

হবে না। তার পেল্‌ভিসের অর্থাৎ শ্রোণীচক্রের হাড়ের ফাঁকের চেয়ে সন্তানের মাথাটা অনেক বেশী বড়ো, সে মাথা ঐ ফাঁক দিয়ে গলবে না। পেট কাটতে হবে।

তখন নিজেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। সেখানে সীজারিয়ান সেক্‌শন করে অর্থাৎ পেট কেটে ছেলে বের করতে হলো। মায়ের অল্প বয়স হলে কি হয়, ছেলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, যথেষ্টই তার ওজন। সে দিব্য বেঁচে রইল। মাও ক্রমে সেরে উঠে হাসপাতাল থেকে চলে এলো।

কর্মালিনীকে বলে এলাম, ছেলে একটি হয়েছে, এই যথেষ্ট। আর যেন ওর ছেলেপুলে না হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত, নইলে আবার এমনি পেট কেটে প্রসব করাতে হবে। কিন্তু একটা বছর যেতে না যেতেই আবার তার দ্বিতীয়বার সন্তান প্রসবের সময় হলো। সেবারেও আমি গেলাম। কিন্তু সেবারে সন্তানের মাথা ছোটো ছিল, আপনিই প্রসব হয়ে গেল, কোনোরকম গণ্ডগোল হলো না।

তার পর আরো দুবছর পরে আবার একটি সন্তান। আগের দুটি ছিল ছেলে, এটি হলো মেয়ে। সুকৃতির তাতে খুবই আনন্দ।

আমি তাই দেখে ওকে বললাম—"এতগুলো ছেলেপুলে হওয়া কি ভালো হচ্ছে?"

সে হেসে উঠে বললে—"তার আমি কি জানি! ভালো না হলে ভগবান দিচ্ছে কেন?"

সুকৃতি দিব্য স্বচ্ছন্দ নির্ভাবনায় রইল তার তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে। ওরা প্রায়ই নানারকম অসুখে ভুগতো। কোনোটার সর্দিকাশি, কোনোটার জ্বর, কোনোটার পেটের অসুখ। তাদের সে প্রায়ই ডাক্তারখানাতে নিয়ে আসতো, আমাকে দেখাতে। একাই সে চলে আসতো একটা রিক্‌সাতে চড়ে। অকুতোভয়ে হাসিমুখে ডাক্তারখানায় এসে ঢুকতো, ছোটো মেয়েটাকে কোলে নিয়ে, আর মাঝের ছেলেটার হাত ধরে। বড়ো ছেলেটা মুখের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে আসতো ওর পিছু পিছু। এতে ওর কোনো দ্বিধা সংকোচ একটুও ছিল না। আর আজকাল ডাক্তারখানায় আসতে কারোই কিছুমাত্র সংকোচ হয় না, ভদ্র অভদ্র সকলেই এমনি আসে।

সুকৃতিকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করতাম—"কোনটার কি হলো?"

সে বলতো—"তিনটিকেই একবার দেখুন ডাক্তারবাবু—"

আমি যথারীতি দেখেশুনে ওদের জন্যে ওষুধপত্র লিখে দিতাম। যতক্ষণে

ওষুধ তৈরি হতো, ততক্ষণ সুকৃতি চুপ করে বসে থাকতো না। সে অবলীলাক্রমে আমার টেবিল হাতড়াতো, বইয়ের আলমারির কাছে গিয়ে তার মনের মতো বই খোঁজাখুঁজি করতো। ছবিওয়ালা বিলেতী ম্যাগাজিন দেখলে, বা মাসিকপত্র বা সাপ্তাহিক পত্র দেখলে, পড়বার মতো মুখরোচক কোনো বই দেখলেই সে টেনে নিতো। এমন কি বিদেশী কোম্পানীদের ডাক্তারি বিজ্ঞাপনের সুদৃশ্য বইগুলি পর্যন্ত সে আত্মসাৎ করতো। একবার মাত্র আমাকে সেগুলো দেখিয়ে নিয়ে বলতো—"এগুলো আপনার পড়া হয়ে গেছে তো? এগুলো আমি কিন্তু নিয়ে যাচ্ছি।"

আমি বলতাম—"কি করবি নিয়ে? তুই তো ইংরেজী পড়তে জানিস না।"

সে বলতো—"জানি বৈকি একটু আধটু। এতদিনেও শিখি নি বুঝি কিছু! মিশনারি ইস্কুলে পড়ি নি বুঝি!"

পড়বার তার ভারি শখ। মনের মতো বই দেখলে আর রক্ষে নেই, সেটি সে আগেই হস্তগত করে বসবে। না দিয়ে আমার উপায় ছিল না। অবশ্য পরের বারে এসে সমস্ত বইগুলি সে ফেরত দিয়েও যেতো, একখানিও হারাতো না।

শুধু বই পড়বার শখ নয়, আরো তার নানাবিধ শখ। সে কথা আমি জানতাম না। পরে জানতে পারলাম।

একদিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বেড়াতে গেছি। তখন শীতকাল, বেশ শীত পড়েছে। দুপুরের দিকে সেখানে গেছি একটি ক্যামেরা হাতে নিয়ে। মন্দির প্রভৃতির কিছু ফোটো তোলাও হবে, আর গঙ্গার ধারে নিরিবিলি ফাঁকা জায়গাতে বেড়িয়ে একটু রোদ উপভোগও হবে। বাগানের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে দেখি, পঞ্চবটি থেকে একটু তফাতে গঙ্গার ধার ঘেঁষে শতরঞ্জি বিছিয়ে বসে রয়েছে সুকৃতি। তার পাশে বসে আছে একটি সুবেশধারী মাড়োয়ারি যুবক। তিনটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে তারা খুব ব্যস্ত। কোনোটার বা জামা ছাড়িয়ে দিচ্ছে, কোনোটাকে ধমকাচ্ছে, কোনোটাকে খেতে দিচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে টিফিন কেরিয়ার, ফ্লাস্ক ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম। অনেক তোড়জোড় নিয়ে দিব্য আরাম করে ওরা সেখানে বসেছে। ঠাকুরের পুজো দেওয়াও বোধ করি হয়েছে, দুজনেরই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লেগে রয়েছে।

আমি যেন দেখতে পাই নি, এই ভাবে ওদের পাশ কাটিয়ে সরে যেতে চাইলাম। কিন্তু সুকৃতি আমাকে দেখে ফেললে। তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে ডাকতে

শুরু করলে—"ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু, এদিকে আসুন। আমাদের দিকে যে একবার ফিরেও চাইছেন না!"

যখন নিতান্ত ধরা পড়ে গেছি তখন অগত্যা যেতেই হলো ওদের কাছে।

মাড়োয়ারি যুবকটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, অতি ভদ্রভাবে তার জায়গাটিতে আমাকে বসতে অনুরোধ করলে। খাতির করে পকেট থেকে দামী সিগারেট আর দেশলাই বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলে। অগত্যা আমি নিলাম একটা সিগারেট।

সুকৃতি বললে—"আপনিও তাহলে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বেড়াতে আসেন, তা আমি জানতাম না। আমরা প্রায়ই আসি মাঝে মাঝে। খুব সকালে কলকাতা থেকে একটা নৌকো ভাড়া করে এখানে এসেছি। খাবার দাবার সব সঙ্গে এনেছি, ওদের জন্যে দুধ টুধ সবই রয়েছে সঙ্গে। সারাদিন এখানে থাকবো, সেই সন্ধ্যার সময় ফিরবো। আমাদের সঙ্গে ভালো টাটকা খাবার আছে, একটু খাবেন?"

আমি অস্বীকার করে বললাম, বাড়ি থেকে এইমাত্র পেট ভরে খেয়ে এসেছি। তখন সে বললে—"আপনি যে সুন্দর একটি ক্যামেরা এনেছেন দেখছি। আমার এই তিনটি ছেলেমেয়ের ছবি তুলে দিন না, ভালো হলে ঘরে বাঁধিয়ে রাখবো।"

আমি ওর তিন ছেলেমেয়ের ছবি তুলে নিলাম। মাড়োয়ারি যুবকটির দিকে চেয়ে ও তখন বললে, "আমাকে এমনি একটি ক্যামেরা কিনে দিও, আমিও ছবি তুলতে শিখবো।"

যুবকটি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। এ ক্যামেরার কত টাকা দাম, তাও জেনে নিলে।

এর কিছুদিন পরেই ওদের বাড়িতে আমার ডাক পড়ল। একটি ছোকরা চাকরের হাতে সুকৃতি আমার কাছে একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল। বেশ ঝরঝরে হাতের লেখা, একটিও বানান ভুল নেই। সে লিখেছিল—"মেয়েটার কয়েক দিন থেকে অল্প অল্প কাশি হচ্ছে আর জ্বর হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিচ্ছিলাম, ভাবলাম যে এতেই সেরে যাবে, আপনাকে বিরক্ত করবার দরকার হবে না। কিন্তু আজ সকাল থেকে খুব বেড়ে গেছে। গলায় কি একরকম শব্দ করছে আর ছটফট করে মাথা নাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, দুধ খেতে দিলে তা নাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে। তাকে নিয়ে যাবার উপায় নেই, শিগ্‌গির আপনি নিজে একবার আসুন।"

ডিপথিরিয়া নয় তো! ব্যাগের মধ্যে একটা সিরাম নিয়ে গেলাম সেখানে। চামচ দিয়ে হাঁ করিয়ে গলার মধ্যে উঁকি মারতেই দেখি, ঠিক তাই, সাদা সাদা প্যাচে গলার ফুটোটি সম্পূর্ণ বুজে গেছে। তাই নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, গলায় শব্দ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার রীতিমতো শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে, মুখ চোখ নীলবর্ণ হয়ে গেছে। ইমার্জেন্সির ব্যাপার, এখনই ট্রেকিওটমি করা দরকার।

আমি বললাম, "ওকে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

সুকৃতি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে বললে—"না না, ও সেখানে যেতে যেতেই মরে যাবে। তা হবে না, আপনি নিজে যা করবার এখানেই করুন।"

অগত্যা ছুটে গেলাম ডাক্তারখানায়। ছুরি ও যন্ত্রপাতি তাড়াতাড়ি ষ্টেরিলাইজ করে নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখি, মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে, প্রায় শেষ অবস্থা।

তৎক্ষণাৎ ট্রেকিওটমি করবার জন্যে গলার উপর আইওডিন লাগিয়ে যেমনি ছুরিটি বের করেছি, অমনি সুকৃতি আমার হাত চেপে ধরলো। চিৎকার করে বলতে লাগলো—"না না ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার মেয়ের গলায় ছুরি বসাতে আমি কিছুতেই দেব না, কিছুতেই দেব না। তার চেয়ে আগে আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দিন।"

হয়তো ওকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিয়ে আমি একবার শেষ চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। মেয়েটা তখনই আমার চোখের সামনে শ্বাস নেওয়া বন্ধ করে স্থির হয়ে গেল।

সুকৃতি সমস্তই বুঝতে পারলে। সে মেয়েকে ছেড়ে উন্মত্তের মতো আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটতে লাগল। কেবল সে মাথা কোটে আর বলে—"বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, বাঁচিয়ে দিন। নইলে আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দিন। ওকে ছেড়ে আমি বাঁচতে চাই না, বাঁচতে চাই না। আমার মেয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিন আপনি।"

ঝোঁকের মাথায় একবার তখন মনে হলো, গলার শ্বাসনলিটা কেটে ফুটো ক'রে দিই, যা থাকে কপালে। সব কিছু থেমে গেলেই বা, তবু একবার চেষ্টা করে দেখি না। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলাকার সেই কুঞ্জ ডাক্তারের কথা। মৃতের উপর ডাক্তারি থেকে নিবৃত্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুকৃতি আছড়া-আছড়ি করে কেঁদে ভাসাতে লাগল।

ধীরে ধীরে তখন মনে পড়ে গেল অনেক আগের সেই সে-দিনের কথা। সুকৃতির অজানিত কোন্ বাপ মা ওকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিতে একটুও মায়া করে নি। এতখানি মাতৃহৃদয় সেই সুকৃতি তাহলে আজ পেলে কোথা থেকে! অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুধু আমি দেখতে লাগলাম।

॥ সাতাশ ॥

ডাক্তারির কাজে আমি সফলও হয়েছি, আবার বিফলও হয়েছি। কিন্তু যাঁরা আমার সব চেয়ে আপন জন, তাঁদের বেলাতেই কোনো কিছু করতে আমি পারি নি।

প্রথমে বলি আমার সেই দাদাবাবুর কথা। আশী বছরের উপরেও তিনি বেঁচেছিলেন, মাঝে মাঝে বাত আর সর্দিকাশি হওয়া ছাড়া তিনি বেশ সুস্থই ছিলেন। তারপর পেটে তাঁর অল্প অল্প ব্যথা হতে থাকল, একটু জর হতে থাকল। তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করলেন, দিন কয়েকের মধ্যেই খুব রোগা হয়ে গেলেন। বেগতিক দেখে ডাক্তার সেনগুপ্তকে এনে দেখালাম। তিনি বললেন, লিভারে ক্যানসার হয়েছে।

এর আর চিকিৎসা কি আছে! ওখানে রেডিয়ম প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায় না। এর চিকিৎসা অন্ততপক্ষে আমার বিদ্যার বাইরে। কিন্তু দাদাবাবু বললেন, যা করবার তুমিই করো। অন্য কারো ওষুধ আমি খাবো না।

ট্রপিক্যালে তখন সাপের বিষ নিয়ে পরীক্ষা চলছে। তাঁরা বলছেন, ওতে ক্যানসার রোগে উপকার হয়। যিনি এই নিয়ে গবেষণা করছিলেন তাঁকে গিয়ে ধরলাম। সাপের বিষের চিকিৎসাই তিনি প্রয়োগ করে দেখুন।

তাঁকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এলাম। তিনি দাদাবাবুকে পরীক্ষা করে তারপর সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে মাত্রা ঠিক করতে লাগলেন। অতি অল্প মাত্র জিনিস, তার সঙ্গে প্রচুর সেলাইন জল মিশিয়ে মাত্রা ঠিক করতে হয়।

নানা তোড়জোড় দেখে দাদাবাবু বললেন—"কিসের ইন্‌জেকশন দিচ্ছ?"

আমি বললাম—"এ হলো সাপের বিষ, আপনার এতে খুব উপকার হবে।"

দাদাবাবু বললেন—"ঠিক আছে। কিন্তু ওঁর হাতে আমি নেবো না, যা দিতে হয় তুমিই দিয়ে দাও। তোমার হাতে সাপের বিষ আমার পক্ষে অমৃত হোক। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

সেই ভদ্রলোকের হাত থেকে তখন সিরিঞ্জ নিয়ে আমিই ফুঁড়ে দিলাম। দাদাবাবু হেসে বললেন—"কিচ্ছু লাগে নি। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

ঐ মন্ত্রটি ইদানিং কয়েক বছর যাবৎ তিনি সব সময়েই উচ্চারণ করতেন।

তার পর থেকে প্রত্যহই আমি ট্রপিক্যালে গিয়ে সমুচিত মাত্রার ইন্‌জেকশন নিয়ে আসতাম। রোগীর অবস্থার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক তদনুযায়ী মাত্রা ঠিক করে দিতেন। এতে পেটের ব্যথা বেদনা ক্রমে ক্রমে বেশ কমে গেল। কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হলো না। তাঁর চোখ থেকে গায়ের চামড়া পর্যন্ত হল্‌দে হয়ে গেল।

বেশ বোঝা গেল দিনে দিনে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। খাওয়া একেবারেই পরিত্যাগ হয়ে গেল। ফল এবং একটু দুধ ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। সর্বক্ষণ চোখ বুজে থাকতেন, ডাকলে তবে চোখ চাইতেন।

এই ভাবে থাকতে থাকতে একদিন ভোরে একেবারেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন চোখ আর চাইলেন না। মায়িজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম, উনি একেবারেই নিস্পন্দ। কোনো চেতনা নেই।

এর বছর দুই পরেই এলো মায়িজীর যাবার পালা। দাদাবাবুর তিনি প্রায় সমবয়সী ছিলেন, বয়সের পার্থক্য খুব কমই ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর হার্টের আক্রমণ হতে শুরু করলো। বুক ধড়ফড় করতো, বুকে খুব যন্ত্রণা বোধ করতেন, কিন্তু ইউফাইলিন ইন্‌জেকশন দিলে তখন তা সেরে যেতো। কিন্তু একদিন আর তা সারলো ন.। ইন্‌জেকশন দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিস্পন্দ হয়ে ঢলে পড়লেন। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি হার্টের ক্রিয়া থেমে গেছে।

এর কয়েক বছর পরে গেলেন আমার মা। তাঁরও ঐ একই ব্যাপার, হার্টের ধমনির থ্রম্বোসিস। হঠাৎ আক্রমণ হলো, কিছুই তাতে করা গেল না। আগের দিন পর্যন্ত নিয়মিত গঙ্গাস্নান করে এসেছেন, নিজে রান্না করে খেয়েছেন। রাত্রে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি খেয়ে শুয়েছেন। তিনি আমার পাশের ঘরেই শুতেন। ভোরে এসে আমাকে ডাকতে শুরু করলেন—"ওরে শিগ্‌গির উঠে আয়, আমার বুকে বড়ো কষ্ট হচ্ছে।" তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম, তাড়াতাড়ি দুটো ইন্‌জেকশনও দিলাম। কোনোই উপশম হলো না। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন। দুটো ইন্‌জেকশনে ফল না হওয়াতে আবার একটি ইন্‌জেকশন দিলাম। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। কোনো রকম ইন্‌জেকশনে কিছুই কাজ হচ্ছে না।

তখন তিনি গা ঝাড়া দিয়ে একবার উঠে বসলেন। আমাদের সকলের

মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। তার পরে বললেন—"ওরে তোরা মা-হারা হলি, এবার আমি চললাম।"

পর মুহূর্তেই তিনি ঢলে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। চলে যাবার সময় হলে কাউকেই ধরে রাখা যায় না। এ তো কতই দেখছি।

॥ আটাশ ॥

কিন্তু বাঁচবার হলে সম্পূর্ণ মরে বেঁচে ওঠা, তাও আমি অনেক দেখেছি।

সম্প্রতির দেখা একটিমাত্র আশ্চর্য ব্যাপারের কথাই বলি।

এক মরণাপন্ন রোগী দেখতে গেলাম। ময়দা কলের উড়িষ্যাবাসী কুলিদের সর্দার। বেশ দুপয়সা উপার্জন আছে, সুতরাং সে মদও খায়, গাঁজাও টানে, আবার আফিমও মৌতাত করে। আফিমের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে গেছে, এক ভরিতে দুদিনের বেশী হয় না। তার ছিল বহুকালের পুরানো কোলাইটিস। তারই যন্ত্রণা নিবারণের জন্যে সে আফিম ধরেছিল, আর ক্রমশ তার মাত্রা বাড়িয়েই চলেছিল। কিন্তু সেই কোলাইটিস এখন কঠিন রক্তামাশায় পরিণত হয়েছে, আফিমে তার কিছুই উপশম করতে পারছে না। সে মুহুর্মুহু তাজা তাজা রক্ত দাস্ত করছে। ময়দা কলের মালিকরা নিজেদের ডাক্তারকে দিয়ে তার অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন, কিছুই তাতে ফল হয় নি। আধুনিক ওষুধ যা যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার সব কিছুই দেওয়া হয়ে গেছে। কোনো ফল না হওয়াতে তাঁরা বলেছেন, একে হাসপাতালে নিয়ে যাও। কিন্তু আত্মীয়েরা তাকে হাসপাতালে পাঠাতে কোনোমতেই রাজী হলো না। তারা বৈদ্য ডাকিয়ে নানারকম জড়িবুটি দিতে থাকল। রোগটি তাতে আরো বেশী বিগ্‌ড়ে গেল। ঐ কলের উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আমার উপর আস্থাবান ছিল, এই অবস্থায় তারা এলো আমাকে ডাকতে। আমি তখন ডাক্তারখানার কাজে ব্যস্ত আছি। বলে দিলাম যে আমার যেতে ঘণ্টা দুই দেরি হবে।

যখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন দেখি রোগীকে তারা বাইরে টেনে বের করেছে। বাড়ির সারা উঠোন লোকে লোকারণ্য। কেউ বলছে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দাও, কেউ বলছে গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দাও।

আমি যেতেই তারা সরে দাঁড়ালো। রোগীর নাড়ি দেখলাম, পাওয়া গেল না। কাপড়চোপড় রক্তে আর মলমূত্রে মাখামাখি। সে অসাড়

হয়ে শুয়ে আছে। তবে জল খেতে দিলে অনেক কষ্টে হাঁ করে সেটুকু খাচ্ছে।

ওর আত্মীয়েরা বললে—"আপনি এসেছেন যখন, একটা কিছু ইন্‌জেকশন দিয়ে যান। তবু যদি কিছুক্ষণ টিঁকে থাকে। ও বাঁচবে না, তা আমরা সবাই জানি, আপনি এই শেষ সময়ে এসে কি বা করবেন।"

বাস্তবিকই শেষ সময়। কিছুই করবার নেই। তবু একটা কিছু করতে হয়, এই ভেবে আমি ব্যাগ খুলে ভালোরকম একটা হার্টের উত্তেজক ওষুধের সন্ধান করতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ে গেল, ব্যাগের মধ্যেই সামনে পড়ে রয়েছে 'কর্টিসোনের' একটি শিশি। এ ওষুধটি সবে নতুন বেরিয়েছে। এর অনেক বেশী দাম। মারাত্মক হাঁপানি রোগে, মারাত্মক বাতের রোগে, এবং আরো কয়েক রকমের মারাত্মক অবস্থাতে এ ওষুধটি ব্যবহার করলে আশু উপকার হয়। এক ভদ্রলোক কোনো ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রুপশন অনুযায়ী ত্রিশ বত্রিশ টাকা দিয়ে ওষুধটি কিনেছিলেন। কিন্তু দুটি মাত্র বড়ি রোগীকে খেতে দিয়ে বিপরীত ফল হওয়াতে ঐ ওষুধ তিনি আর মোটে ব্যবহার করেন নি, ঘরে ফেলে রেখেছিলেন। সেই বাড়িতে যখন আমি অন্য রোগী দেখতে যাই, তখন ঐ শিশিটি তিনি আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, এটা আমার কোনো কাজে লাগল না। আপনি এটা নিয়ে রাখুন, যদি কোথাও দরকার হয় দিয়ে দেবেন। রেখে দিন আপনার ব্যাগে।

সেই শিশিটি তখন থেকে আমার ব্যাগের মধ্যেই পড়ে ছিল। হঠাৎ ওর দিকে নজর পড়ায় ভাবলাম, অন্য কিছু না দিয়ে এটাই দিয়ে দেখা যাক না। ছোটো ছোটো বড়ি, তার একটি নিয়ে আমি জলের সঙ্গে ওকে খাইয়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ সেটি গিলে ফেললে। তখন আমি ওদের হাতে শিশিটি দিয়ে বললাম, এই বড়ি তিন ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে যাও। এ অবস্থায় ইন্‌জেকশন কিছু না দেওয়াই ভালো। যদি বাঁচে তো এতেই বাঁচবে।

চলে এলাম সেই কর্টিসোনের বড়িগুলি দিয়ে। অবশ্য ওতেই সে যে বেঁচে উঠবে তা আমি কল্পনাই করি নি। কিন্তু পরের দিন তার আত্মীয়েরা এসে বললে, সেই বড়ি খাবার পর থেকে রোগী ক্রমশই বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার রক্তামাশা প্রায় নেই বললেই হয়, রক্তের বদলে স্বাভাবিক মল দেখা যাচ্ছে। সে এখন ভাত খেতে চাইছে।

শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার বেঁচে ওঠাই অসম্ভব, খেতে

চাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সত্যই তাই। সে অনেকটা সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে। আরো এক শিশি ঐ ওষুধ কিনতে বলে দিলাম, কারণ ইতিমধ্যে আমার দেওয়া শিশিটা ফুরিয়ে এসেছিল। সেই রোগী মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। এমন কি তার কোলাইটিস রোগও অনেকটা সেরে গেল। পরে একদিন নিজেই সে অন্য এক রোগী নিয়ে ডাক্তারখানায় এসে হাজির হলো। তখন সে আবার সর্দারি করছে।

আমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। আমি তার কাছে যেন ভগবানের মতো। স্পষ্টই সে কথা সে বললে। আমার হাত দিয়ে স্বয়ং ভগবান তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই তার ধ্রুব বিশ্বাস।

আমাকেও তা মানতে হয়। যেখানে মনে মনে জানছি যে আমার বিদ্যা খতম হয়ে গেছে, রোগীর সম্বন্ধে কোনোই আর আশা নেই, সেখানে যদি কেউ অমনি করে চোখে আঙুল দিয়ে ওষুধ দেখিয়ে দেয়, আর তা দৈবাৎ দু একবার মাত্র নয়, অনেকবারই যদি এমন হয়ে যায়, তবুও তাকে ভগবানের কাজ বলে আমি স্বীকার করব না? আমরা বিজ্ঞানী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলে কোনো কথাই বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি অলৌকিকেরও এমনি বারে বারে প্রমাণ পেতে থাকি, তবে তাকেও বিশ্বাস করতে আমাদের বাধবে কেন? আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি, তাঁর অলৌকিককেও বিশ্বাস করি। স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই।

কিন্তু আজকালকার সাহিত্য পড়ে আমি আশ্চর্য হয়ে মাঝে মাঝে ভাবি, যারা সাহিত্যিক, সূক্ষ্মদর্শী, রসজ্ঞ, যারা জগতের ব্যাপার দেখে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কত কিছু নতুন নতুন সৃষ্টি করছে, তারা কেমন করে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির কথা বলে? তারাও স্রষ্টা, কিন্তু অনুকরণকারী। যে আদি শিল্পীকে তারা অনুকরণ করছে, তাঁর সম্বন্ধে একবারও কিছু বলে না কেন, ভাবে না কেন?

আমার অন্তত মনে হয়, সেই সাহিত্যই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে, যা অতি সহজে ভগবানকে চেনাবে।

॥ উনত্রিশ ॥

আরো কত আশ্চর্য ব্যাপার আমার এই ডাক্তারি জীবনে দেখলাম। শেষকালে দুটি ঘটনার কথা বলবো। যাঁরা এই লেখাগুলি গোড়া থেকে পড়ছেন তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন।

একদিন এক নারী-সেবাশ্রম থেকে আমার ডাক এলো। বুঝতে পারলাম না, আমায় কেমন করে তারা চিনলে, কারণ কেউই সেখানে আমার পরিচিত নেই। কখনো সেদিকে আমার যাতায়াত নেই। সম্পূর্ণ এক অন্য পাড়ায় সেই সেবাশ্রম। গিয়ে দেখি, রীতিমতো সে এক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার। ঠাকুর আছেন, মেয়েরা সকলে ঠাকুরের পূজা-অর্চনার আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত। সকলেরই পরণে থান, গলায় কণ্ঠী, নাকে তিলক। ধর্মপ্রাণ বিধবা বাঙালী মেয়েদের আশ্রম বলেই মনে হলো। তারা আমাকে এক রোগিণীর কাছে নিয়ে গেল। শুনলাম হার্টের রোগ। তারা বললে, আপনি রোগী দেখুন, আমরা এখানকার বড়দিদিমণিকে ডেকে আনি।

আমি পরীক্ষাদি শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই পিছন দিক থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম করলে। প্রণাম করে উঠে সে অপ্রতিভের মতো একটু একটু হাসতে লাগল। মুখ দেখে মনে হলো যেন চেনা চেনা, কিন্তু কোথায় দেখেছি স্মরণ হলো না। তখন নিজেই সে বললে—"আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি মালা।"

তখন চিনতে পারলাম। তৎক্ষণাৎ সব কথা আমার স্মরণ হয়ে গেল। সেই আগেকার যুগের ফিট্‌ফাট নার্স মালা, আজ এমন হলো কেমন করে !

দেখলাম যে এখন তার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে, বয়স হয়েছে।

ধার্মিকার বেশে তার চেহারা এক অপূর্ব রকমের হয়েছে, চেনাই যায় না। তার মাথার চুল ছাঁটা, কদমছাঁট নয়, বাবরি গোছের। পরণে থান, গলায় কণ্ঠী। কিন্তু এ বেশে তাকে মন্দ দেখাচ্ছে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—"এখানে তুমি জুটলে কেমন করে ?" সে বললে—"সে অনেক কথা কাকাবাবু। এখন এই আশ্রমের ভার পড়েছে আমারই উপরে। অনেক ঘাটে ঘুরে ঘুরে এবারে বোধ হয় ঠিক জায়গাতে এসে পড়েছি। আপনি যাকে একদিন মেয়ের মতো করে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে আপনার অবাধ্য হয়ে থাকলেও আপনার মুখ নীচু করে নি। আপনি হয়তো

আমাকে এখন ভুলেই গেছেন, কিন্তু আমি আপনার কথা কোনোদিনই ভুলি নি।"

প্রকাশ্যে আমাকে বলতেই হলো, ওর পরিবর্তন দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। তার পর আড়ালে ডেকে রোগী সম্বন্ধে দু চারটে কথাবার্তা বলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এ কি তোমার সত্যিকার পরিবর্তন, না এখনকার পক্ষে এও একটা অভিনয়?"

সে বললে—"সত্যি মিথ্যা আমি নিজেই কিছু বুঝি না কাকাবাবু। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এতদিন মানুষের পিছনে ঘোরাঘুরি করে হতাশ হয়ে শেষে এখন ভগবানের পিছনে লেগেছি। আমি আগে যাই করে থাকি কিছুতেই শান্তি পাই নি, এই প্রথম একটু শান্তি পেয়েছি। আর অভিনয়ের কথা যদি বলেন, সবই তো অভিনয়। আপনিও কি অভিনয় করছেন না?"

আমি ওর কোনো জবাব না দিয়ে চলে এলাম। কিন্তু কথাটা খুব মনে লাগল।

মেয়েটা এখন অনেক বড়ো বড়ো কথা শিখেছে। বোধ করি ঠেকে ঠেকেই শিখেছে।

আরো একটি ঘটনা বলি। একদিন গালুডি থেকে ফিরছি। ট্রেন সেখানকার ষ্টেশনে বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অথচ ট্রেন আসতেই দেখলাম প্রত্যেক কামরাতে বেজায় ভিড়, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। যে কামরাতেই উঠতে যাচ্ছি, ভিতরের লোকেরা হাঁ হাঁ করে উঠে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছি, এমন সময় এক ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা থেকে একজন হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি মুখ বাড়িয়ে আমাকে ডাকতে লাগল—"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, এই কামরাতে চলে আসুন।"

আমি বললাম—"ওটা ফার্ষ্ট ক্লাস।"

সে লোকটি বললে—"তাহোক, এখনই গাড়ি ছেড়ে দেবে, আপনি উঠে পড়ুন। আমি তো রয়েছি, আসুন।"

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম বটে, কিন্তু লোকটাকে আমি চিনতে পারলাম না। গাড়ি ছেড়ে দেবার পরে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম—"আপনাকে আমি চিনতে পারছি না, কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন দেখছি।"

সে লোকটি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাত জোড় করে বললে—"আপনি আমাকে আপনি বলবেন না, আমি বারাসতের সেই রাইচরণ।"

তবুও আমি চিনতে পারলাম না।

তখন সে বললে—"চিনতে পারছেন না? আমি সেই জেলের কয়েদী ছিলাম, তবিলের টাকা চুরি করার মিথ্যে অপরাধে আমার জেল হয়েছিল, তার পর টাইফয়েড হয়েছিল, আপনি অনেক চেষ্টা করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।"

এইবার তাকে চিনলাম। কিন্তু না বললে চিনবো কেমন করে? তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, আর রোগা ছিল। এখন তার বয়স হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। বেশ ভদ্র চেহারা, ভদ্র পোষাক, ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী। তাকে এখন সেই কয়েদী বলে চিনতে পারা সহজ কথা নয়।

কিন্তু সে ছিল এক দোকানের সামান্য কর্মচারী, তার এমন উন্নত অবস্থা হলো কেমন করে? সকল কথা শুনলাম তার কাছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে কলকাতায় চলে আসে। রাস্তায় রাস্তায় এটা ওটা জিনিস ফেরি করতে শুরু করে। তাই করে দু চার বছরে কিছু টাকা জমায়। তখন সেই টাকা নিয়ে কলকাতার বড়বাজার পটিতে এক মুদির দোকান খোলে। হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে থাকায় সেই দোকানের খুবই উন্নতি হয়। তার পর আরো দুটি দোকান সে খুলেছে, একটি বারাসতে আর একটি জামসেদপুরে। এখন সে আসছে জামসেদপুর থেকে। যদিও সেখানে বিশ্বস্ত লোক রেখেছে, তবু দুই জায়গাতেই তাকে যাতায়াত করতে হয়। এখানকার ট্রেনে বড়ই ভিড় হয়, রাত্রে ঘুমোনো যায় না, কাজেই এখানে ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনে যাতায়াত করতে হয়।

বুঝতে পারলাম, অবস্থা খুবই ভালো হয়েছে। আরো শুনলাম, এখনও তার মা বেঁচে আছে। বারাসতে নিজের কোঠা বাড়ি করেছে, সেখানেই মা থাকে। প্রতি শনিবার সে মায়ের কাছে যায়। সেই জেলের কয়েদী এখন রীতিমতো একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। আর অন্তত আমার চেয়ে অনেক বেশী বড়লোক, ট্রেনে ফার্ষ্ট ক্লাসে সে যাতায়াত করে। কিন্তু এ কি বিশ্বাস-যোগ্য কথা! এ কথা শুনলেই মনে হবে বানিয়ে বলছি।

জগতে বিস্মিত হবার মতো অনেক কিছুই আছে। ডাক্তারি জীবনে তা প্রায়ই নজরে পড়ে যায়। বিস্ময় বৈকি। আর কিছু না হোক, মানুষই এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। অন্য কেউ তা দেখতে না পেলেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। তার কারণ আমরা মানুষকে ভিতরদিক পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাই। আমার বারান্দার টবে একটি লজ্জাবতী লতা আছে। এমনিতে

দূর থেকে দেখলে মনে হয়, সাধারণ লতাগাছ। কিন্তু তাকে ছুঁলেই বোঝা যায় কোথায় তার চরিত্রের বিস্ময়। আমি সেই কথাই বলছিলাম।

অনেক সময় মনে করেছি, জীবনে কিই বা করলাম! না পারলাম বিদ্বান হতে, না পারলাম বলবার মতো কিছু করতে। বন্ধু-বান্ধবেরা জিজ্ঞাসা করে, এতদিন ডাক্তারি করে কত টাকা জমালাম। আমি বলি, কিছুই না। তবে বিষয়সম্পত্তি? আমি বলি, তাও কিছু না।

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা একটি জিনিস আমাকে দিয়েছেন। তাঁর অপূর্ব রচনা দেখার সৌভাগ্য। দেখতে দেখতে চলেছি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর অতিক্রম করে। কিন্তু কোথায় চলেছি তার কি কিছুই আমি জানি! আবার মনে হয়, সবই হয়তো জানা, সেগুলো অভিনয় করে যাচ্ছি মাত্র। সেই মালা সেদিন ঠিক কথাই বলেছিল। যিনি পাঠিয়েছেন তিনি নিজেই নাট্যকার আর নিজেই দর্শক। আমাকে দিয়ে শুধু অভিনয় করাচ্ছেন। অভিনয় ফুরিয়ে গেলে তিনি নিজেই ডেকে নিয়ে বলবেন—হয়েছে হয়েছে, ঢের হয়েছে, এবার তোমার ডাক্তারের খোলস খুলে ফেল। এর পর আবার অন্যরকম পালা।